Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল সাঃ সিরাহ/জীবনী

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা ইসলাম

রোলঃ 23090120799

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রাসূল সাঃ সিরাহ/জীবনী

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা ইসলাম

রোলঃ 23090120799

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রাসূল সাঃ সিরাহ/জীবনী " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা ইসলাম, আইডিঃ 23090120799 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রাসূল সাঃ সিরাহ/জীবনী " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সানজিদা ইসলাম

(স্বাক্ষর)

সানজিদা ইসলাম

আইডিঃ 23090120799

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১.সীরাহ কেনো পড়বো? 5
মাক্কী জীবন - 6
২.জাহিলি যুগের আরব সমাজ সামাজিক অবস্থা -: 6
অর্থনৈতিক অবস্থা- 7
চারিত্রিক অবস্থা- 8
পরিবার:- 9
নবিজির নবুওয়াত পূর্ব জীবন : 9
এলেন তিনি ধরার মাঝে: 9
দুধমা হালিমার ঘরে:- 10
বাল্যকালে অলৌকিক ঘটনা : 11
চাচার স্নেহডোরে:- 12
বুহাইরা পাদরির সাথে সাক্ষাৎ 12
যৌবনের আলেয়ায় 13
হিলফুল ফুযুল: 13
খাদিজার সাথে শুভবিবাহ : 14
কাবাঘর নির্মাণ 15
গ্রিসের জাহাজ ঝড়ের কবলে:- 15
মুশরিকদের প্রস্তুতি : 15
সমস্যার সমাধান :- 16
নবীজি নবুওয়াত পরবর্তী জীবন 18
হেরা গুহায় ওহি এলো 18
ইমান কবুল করলেন যারা:- 20
প্রকাশ্য দাওয়াতের কাল-- 21

দাওয়াতি কাজ থামানোর চেষ্টা ভয় দেখিয়ে :-.....22
আপোসরফার প্রস্তাব :-.....23
কুরআনের প্রভাব :-.....24
সত্যবাদিতার পরীক্ষা :-.....27
চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরন :-.....28
মুশরিকদের ঠুনকো পদক্ষেপ :.....29
নবিজির ওপর জুলুম-নির্যাতন.....30
কাবা চত্বরে হামলা :.....30
আবু জাহেলের স্পর্ধা :-.....31
আবু লাহাবের পরিবার :-.....32
মুসলিমদের উপর বর্বরতা.....33
আবু বকরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ :-.....33
বিলালে হাবশী:-.....34
খাব্বাবের কঠোর পরীক্ষা :-.....35
নতুন আলোর রেখা.....36
আবু বকরের গুলাম ক্রয় :.....36
আবিসিনিয়ায় হিজরত.....37
দারুল আরকাম :-.....38
ইসলামের ছায়াতলে হামযা :-.....38
উমরের পালাবদল :-.....39
আবু তালিব :.....40
দুঃখের বছর :-.....42
তায়িফবাসীর নৃশংসতা :.....43
জিনদের সাথে দেখা.....45

মিরাজে গমন :- 46
ঈমানের আলো ছড়িয়ে গেলো 48
গোত্রে গোত্রে দাওয়াত :- 48
বাইয়াতে আকাবা :- 49
আয়িশার সাথে বিয়ে :- 50
প্রথম বাইয়াতে আকাবা :- 51
দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা :- 52
সাহাবীদের মদিনায় হিজরত : 53
মদিনার পথপানে 54
আবু বকরের প্রস্তুতি : 54
হত্যার ফরমান জারি ও আল্লাহর সাহায্য 55
হিজরতের পথে নবিজি : 57
মাদানী জীবন 59
প্রাণের মদিনায় প্রবেশ :- 59
ইহুদিদের সাথে নতুন এক চুক্তি :- 60
মক্কা থেকে কুরাইশদের হুমকি :- 62
বদর যুদ্ধ 64
আতিকার স্বপ্ন :- 64
জরুরি এলান :- 65
সাহাবিদের কাফেলা :- 66
বদরের প্রান্তরে : 67
রবের কাছে নবিজির বুকভরা আকুতি :- 68
যুদ্ধের সূত্রপাত :- 70
মুশরিকদের পরাজয় : 71

বদর-পরবর্তী কিছু ঘটনা.....73
রুকাইয়া এর ইন্তেকাল.....73
বনু কায়নুকা :-.....74
ইসলামের শত্রু ইবনু আশরাফকে হত্যা :-.....76
উহুদের যুদ্ধ :-.....77
যুদ্ধের প্রস্তুতি :-.....79
উহুদের বাহিনী :.....80
মুনাফিকদের আসল চেহারা :-.....81
কুরাইশদের চালবাজি :-.....83
ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড় :.....85
আহত ও নিহতদের অবস্থা.....86
শোকের মধ্যেও সুখ :.....87
হামরাউল আসাদের যুদ্ধ :-.....88
উহুদ পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা :.....89
হৃদয়বিদারক বনু রাযীর ঘটনা :-.....89
বীরে মাউনার ঘটনা :-.....92
বনু নাজিরের যুদ্ধ :.....95
খন্দকের যুদ্ধ :.....96
যুদ্ধের সূচনা :.....96
শুরু হলো পরিখা খনন :-.....97
অল্প খাবারে হাজার জন :-.....98
ঈমান ও নিফাক.....100
সম্মিলিত জোটের আক্রমণ.....101
বনু কুরাইযার স্পর্ধা :.....103

নাজুক পরিস্থিতি :-.....104
যুদ্ধ হলো কৌশলের খেলা 106
আল্লাহর সাহায্য 107
বনু কুরাইযার যুদ্ধ :.....108
মিশন বনু কুরাইযা.....108
ইহুদিদের সলাপরামর্শ :.....110
যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল.....112
নবীজির নির্দেশে আবু রাফির হত্যাকাণ্ড 113
বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ : 114
মুনাফিকদের উৎপাত :-.....116
নবীজি প্রজ্ঞা,মুনাফিকের হার.....118
ইফকের ঘটনা :- 119
ইবনু উবাইয়ের পরিণতি : 123
হুদায়বিয়ার বিজয়মালা : 123
কুরাইশদের বাধা :.....124
হুদায়বিয়ার প্রান্তরে :- 124
সন্ধির প্রস্তাবনা.....125
প্রকাশ্য বিজয় 127
গেরিলা যোদ্ধা আবু বাসির :.....128
যী-কারাদ যুদ্ধ.....130
খাইবার যুদ্ধ : 132
যুদ্ধযাত্রা শুরু :- 132
সশস্ত্র লড়াই.....134
মর্মান্তিক ঘটনা.....136

কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ.....137
ফিরতি সফর :.....139
যাতুর রিকার যুদ্ধ.....140
পট্টিওয়ালাদের যুদ্ধ :.....140
অপূর্ব সালাত.....142
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল.....143
রাজা-বাদশাদের কাছে পত্র:.....144
রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্যে পত্র.....144
পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে পত্র :.....145
মিশরের শাসক মুকাওকাসের উদ্দেশ্যে চিঠি.....146
কাযা উমরাহ.....147
তিন বীরের ইসলাম কবুল :.....148
মূতার যুদ্ধ :.....150
ত্যাগের মহিমা :.....150
জাহান্নামের ভয় :.....152
তেজোদীপ্ত ভাষণ.....154
দুর্দান্ত লড়াই, অসাধারণ বিজয় :.....155
মক্কা বিজয় :.....158
মক্কায় প্রবেশ :-.....158
অনুপম ক্ষমার দৃষ্টান্ত.....159
ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :.....161
বিজয়ের পর ভাষণ ও ইসলাম কবুল.....162
হুনাইনের যুদ্ধ :.....165
হুনাইনের প্রান্তরে :.....165

অতর্কিত হামলা,যুদ্ধের বহ্নিশিখা.....166
তায়েফের যুদ্ধ ও গনিমত বন্টন :.....168
উমরাহ পালন ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন :-.....171
আদি ইবনু হাতিমের ইসলাম গ্রহণ :-.....173
তাবুকের যুদ্ধ :.....175
সাহাবিদের দান-সদাকা :.....175
মুনাফিকদের অবস্থা :-.....177
তাবুক প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী.....178
মসজিদে জিরার.....179
তাবুক-পরবর্তী কিছু ঘটনা :.....181
ইসলামি জীবনব্যবস্থার সৌন্দর্য :.....181
পশ্চিমের বর্বরতা.....182
দলে দলে ইসলাম কবুল :-.....185
ইয়েমেনে মুআজ.....187
বিদায় হজ :.....189
বিদায় হে প্রিয়তম!.....194
আয়েশার ঘরে :.....194
ওফাত প্রাপ্তির পাঁচদিন পূর্বে :.....195
চারদিন পূর্বে :.....197
একদিন আগে :-.....200
জীবনের শেষদিন :.....201

১.সীরাহ কেনো পড়বো?

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাহ কেন পড়া দরকার

মানবজীবনে আদর্শ, দিকনির্দেশনা ও সঠিক পথের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলাম সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিয়েছে। আর এই ব্যবস্থার সর্বোত্তম শিক্ষক, আদর্শ ও বাস্তব রূপ হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর জীবনকথা—যাকে আমরা সীরাহ বলি—প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জানার ও অনুসরণের অপরিহার্য বিষয়।

১. সঠিক আদর্শ জানার জন্য

কোনো জাতির উন্নতির জন্য সঠিক রোল মডেল প্রয়োজন। আল্লাহতায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

"তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সুরা আহযাব: ২১)

সীরাহ পড়লে আমরা তাঁর ইবাদত, পরিবার-পরিচর্যা, নেতৃত্ব, সামাজিক আচরণ—প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক আদর্শ খুঁজে পাই।

২. ঈমান ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য

রসূল ﷺ ও সাহাবাদের সংগ্রাম, কষ্ট, ত্যাগ ও ধৈর্যের ঘটনা আমাদের ঈমানকে জাগ্রত করে। জীবনের প্রতিকূলতায় সীরাহ আমাদের ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস জোগায়।

৩. ইসলামের ইতিহাস বোঝার জন্য

ইসলাম কিভাবে মক্কা থেকে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, কীভাবে অত্যাচার ও বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হলো—এসব জানা যায় সীরাহর মাধ্যমেই।

৪. নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের জন্য

রসূল ﷺ-এর চরিত্র ছিল মহত্ত্বপূর্ণ ও অনন্য। তাঁর জীবনে সততা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সহনশীলতা ছিল জীবন্ত উদাহরণ। সীরাহ আমাদের নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং আদর্শ মানুষ হতে সহায়তা করে।

৫. দাওয়াত ও ইসলামী কার্যক্রমের জন্য

নবী ﷺ কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর জয় করেছেন, তা জানার মাধ্যমে আমরা সঠিক দাওয়াতি পদ্ধতি শিখতে পারি।

৬. জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য

পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যা—সবকিছুর সমাধান সীরাহতে পাওয়া যায়। নবী ﷺ কিভাবে সংকট মোকাবিলা করেছেন, কীভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক।

৭. ভালোবাসা ও আনুগত্য বাড়ানোর জন্য

রসূল ﷺ-এর ত্যাগ-তিতিক্ষা জানলে আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বাড়ে। আর ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেয় তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের আগ্রহ।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাহ পড়া মানে শুধু ইতিহাস জানা নয়; বরং এটি আমাদের জীবনকে আলোকিত করে, ঈমানকে শক্তিশালী করে, চরিত্র গঠনে সহায়তা করে, এবং সমস্যার সমাধান দেখায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিয়মিতভাবে সীরাহ অধ্যয়ন করা, শিখা এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করা।

মাক্কী জীবন -

২.জাহিলি যুগের আরব সমাজ সামাজিক অবস্থা -:

জাহেলী যুগ বলতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়কে বোঝায়। এ সময় আরব সমাজের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অশান্ত, বিভ্রান্ত ও নৈতিক অবক্ষয়ে ভরা। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

১. গোত্র ও বংশ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ গোত্র ভিত্তিক ছিল।প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের গোত্রকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিত, এমনকি অন্যায় হলেও নিজের গোত্রের লোককে সমর্থন করত।

এতে পারস্পরিক শত্রুতা, যুদ্ধ ও রক্তপাত লেগেই থাকত।

২. নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ

নারীর কোন মর্যাদা বা স্বাধীনতা ছিল না।নারীদেরকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো।কন্যা সন্তান জন্ম হলে অনেক পরিবার লজ্জা ও দারিদ্র্যের ভয়ে জীবন্ত কবর দিত।

৩. বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা

বিবাহের কোনো সুস্থ নীতি ছিল না।

এক নারী অনেক পুরুষের অধীনে থাকতে পারত, আবার নারীদেরকে জোর করে দখল করা হতো।বহুবিবাহে সীমাহীনতা ছিল।তালাক দেওয়া খুব সহজ ছিল এবং নারীর কোন অধিকার ছিল না।

৪. দাসপ্রথা দাস ও দাসী রাখা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না, নির্দয়ভাবে ব্যবহার করা হতো।

৫. মদ, জুয়া ও অসামাজিক কাজ মদ্যপান, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও নারী ব্যবসা ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত।এগুলোকে তারা লজ্জাজনক মনে করত না, বরং গর্ব করে করত।

৬. যুদ্ধ ও রক্তপাত তুচ্ছ কারণে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে পারত।গোত্রীয় প্রতিহিংসা ছিল সমাজের বড় সমস্যা।

৭. ধর্মীয় দিক থেকে অধিকাংশ আরব মূর্তিপূজক ছিল।

কাবা শরীফে শত শত মূর্তি রাখা ছিল। কেউ কেউ ইহুদি, খ্রিস্টান, জরথুস্ত্র বা মজুসি ধর্মে বিশ্বাস করত, তবে প্রকৃত একত্ববাদী ছিল অল্পসংখ্যক।

জাহেলী যুগের আরব সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকট ছিল। নারী ছিল অবমানিত, দুর্বলরা ছিল বঞ্চিত, দাসরা ছিল পদদলিত। অন্যায়, হিংসা, যুদ্ধ ও মূর্তিপূজা তাদের জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা-

বাণিজ্য প্রধান পেশা: আরবরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী। মক্কা ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্র, কারণ কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাবিলা সেখানে আসত।

কারভান বাণিজ্য: তারা ইয়েমেন, শাম (সিরিয়া), ইরাক প্রভৃতি দেশে কারভান (বড় ব্যবসায়ী দল) পাঠাত।

সুদ (রিবা): অর্থনীতির বড় অংশ সুদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ধনী শ্রেণি গরিবদেরকে সুদে ঋণ দিত এবং এভাবে তাদেরকে চিরদিনের জন্য ঋণের ফাঁদে ফেলত।

গবাদি পশু ও কৃষি: কিছু অংশে উট, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া পালন ছিল আয়ের উৎস। সীমিত জায়গায় খেজুর ও শস্য উৎপাদন করা হতো।

অসমতা: ধনী-গরিবের মধ্যে প্রচণ্ড বৈষম্য ছিল। ধনীরা বিলাসিতায় ডুবে থাকত, আর গরিবরা দাসত্ব ও অনাহারে ভুগত।

চারিত্রিক অবস্থা-

অসদাচরণ: সত্যবাদিতা ও নৈতিকতা বিরল ছিল। মিথ্যা, প্রতারণা ও চতুরতা ছিল সাধারণ গুণ।

যুদ্ধপ্রিয়তা: তারা সাহসী হলেও রক্তপিপাসু ছিল, তুচ্ছ বিষয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিত।

অতিথিপরায়ণতা: একটি ভালো গুণ ছিল—অতিথিকে সম্মান ও আপ্যায়ন করত।

কবিতা ও সাহিত্য: তারা ভাষা ও কবিতায় পারদর্শী ছিল, মেলায় কবিতা প্রতিযোগিতা হতো।

মূর্তিপূজা ও কুসংস্কার: ভাগ্য গণনা, শকুন-সাপ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া, মূর্তির কাছে বলি দেওয়া ছিল সাধারণ ব্যাপার।

কিছু উত্তম গুণ: সাহস, দানশীলতা, আতিথেয়তা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা—এসব ভালো গুণও ছিল, তবে সেগুলো অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত ছিল।

নবীজির বংশধারা তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নবীজি থেকে আদনান পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে আদনান থেকে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম পর্যন্ত,এর কিছু অংশ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আর তৃতীয় ভাগে আছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম থেকে নিয়ে আদম আলাইহিস সাল্লাম পর্যন্ত। এটা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথম অংশ :মোহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আব্দিল মুত্তালিব ইবনে হাসিম ইবনে আব্দি মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনি নজর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমা ইবনি মুদরিকা ইবনি ইলিয়াস ইবনী মু্দার ইবনি নিযার ইবনি মাআদ ইবনি আদনান।

দ্বিতীয় অংশ:আদনানের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ। আদনান ইবনু উদাদ ইবনি হামাইসা ইবনি সালামান ইবনি আউস ইবনি বুয ইনবি কামওয়াল ইবনি উবাই ইবনি আওয়াম ইবনি নাশিদ ইবনি হাযা ইবনি বালদাস ইবনি ইয়াদলাফ ইবনি তাবিখ ইবনি জাহিম ইবনি নাহিশ ইবনি মাখি ইবনি আইদ ইবনি আবকার ইবনি উবাইদ ইবনি দাআ ইবনি হামদান ইবনি সানবার ইবনি ইয়াসরিবি ইবনি ইয়াহযান ইবনি ইয়ালহান ইবনে আরআবী ইবনি আইদ ইবনি দাইশান ইবনি আইসার ইবনি আফনাদ ইবনি আইহাম ইবনি মিকসার ইবনি নাহিস ইবনি যারিহ ইবনি সুম্মিইয়ি ইবনি মাযা ইবনি আওদা ইবনি ইরাম ইবনি কাইদার ইবনি ইসমাইল ইবনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম।

তৃতীয় অংশ :- ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ। ইব্রাহিম ইবনু তারিহ ইবনি নাহুর ইবনি সারুআ বা সারুগ ইবনি রাউ ইবনি ফালিখ ইবনি আবির ইবনি শালিখ ইবনি আরফাখশাদ ইবনি সাম ইবনি নুহ আলাইহিস সালাম ইবনি লামিক ইবনি মুতাওশলিখ ইবনি আখনুখ ইবনি ইয়ারিদ ইবনি মাহলাইল ইবনি কাইনান ইবনি আনুশা ইবনি শিস ইবনি আদম আলাইহিস সালাম।

পরিবার:-

নবীজির পরিবার তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হাসিম ইবনু আব্দি মানাফের নাম অনুসারে 'হাসিমি পরিবার' হিসেবে পরিচিত।

কাবা ও হজ সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে বনু আব্দি মানাফ ও বনু আব্দি দারের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হলে হাজীদের পান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব আসে হাসিমের ভাগে। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সম্পদশালী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। মক্কায় তিনি প্রথম হাজীদের সারিদ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর।হাসিম অর্থ চূর্ণকারী। সারিদ তৈরি করতে গিয়ে রুটি চূর্ণ করতে হয়। সেখান থেকেই তার নাম হয়ে যায় হাশিম।

৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন।কপালে শুভ্র চিহ্ন দেখে মা তার নাম রাখেন শাইবা। ইয়াসরিব তথা মদিনায় তিনি তার নানার পরিবারে বেড়ে ওঠেন। মক্কায় অবস্থানকারী তার দাদার পরিবার কাছে এইসব তথ্য অজানাই থেকে যায়। হাশিমের ছিল চার পুত্র আর পাঁচ কন্যা। পুত্র আসাদ,আবু সাইফি, নাদলা ও আব্দুল মুত্তালিব। আর কন্যাদের নাম শিফা, খালীদা,দইফা, রুকাইয়া ও জান্নাত। হাশিম ফিলিস্তিনের গাজায় মৃত্যুবরণ করেন।

নবিজির নবুওয়াত পূর্ব জীবন :

এলেন তিনি ধরার মাঝে:

- আরবিতে হাতি কে বলে ফীল।হস্তীবাহিনীর চমকপ্রদ ঘটনার কারণে বছরটি পরিচিত লাভ করে 'আমুল ফীল' বা 'হাতিবর্ষ' নামে। লোকদের মুখে মুখে এ কথা ছড়িয়ে যেতে থাকে। তখন ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ চলছিল। এ বছরই জন্মগ্রহণ করে বরকতময় শিশু। দিনটি ছিল ১২ রবিউল আউয়াল। ইংরেজি বর্ষ হিসেবে ২২ এপ্রিল সোমবার। সন্তান

জন্মদানের পর তার মা আমিনা স্বপ্নে দেখেন,শরীর থেকে একটি নূর বেরিয়ে আলোকিত করে ফেলেছে সিরিয়ার প্রসাদগুলোকে। এ দৃশ্য দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। নাতির খবর পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব।বাচ্চাকে বাবায় নিয়ে গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি শিশুটির নাম রাখে মুহাম্মদ,ﷺযার অর্থ প্রশংসিত। আরবের রীতি অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে নাতির আকিকা করেন তিনি। এরপর চুল মুন্ডিয়ে দিয়ে এক জমজমাট ভোজের আয়োজন করেন।

আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নবী মুহাম্মদ ﷺ।

জাহিলি যুগে ও আল্লাহ তায়ালা নবীজির বংশধারাকে মুক্ত রেখেছিলেন অশ্লীলতা থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺনিজ মুখে বলেছেন আদম আলাইহিস সাল্লাম থেকে নিয়ে আমার পিতা, পিতামহ পর্যন্ত কেউ ব্যাভিচারী ছিলেন না। সবাই ছিলেন বিবাহিত।বিগত দিনে তার ব্যাপারে যেন প্রশ্ন না ওঠে,যে জন্যই এই কুদরতি ব্যবস্থাপনা।সম্মানিত এক সত্তা।

দুধমা হালিমার ঘরে:-

তায়েফ থেকে অনেক নারী এসেছিল দুগ্ধ শিশুর খোঁজে।প্রত্যেকে বিত্তশালীদের সন্তান তালাশ করছিল। শিশু মোহাম্মদ ﷺইয়াতীম ছিলেন বলে তার প্রতি সবার আগ্রহ ছিল কম। হালিমার গাধাটি ছিল রোগাপটকা। যার কারণে সবার থেকে পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। মক্কায় এসে আর কাউকে পাননি দেখে শিশু মোহাম্মদকে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হালিমা তখনো ঠাওর করতে পারেননি, কত বড় নেয়ামত তার কোলে সোপর্দ হতে যাচ্ছে। দোজাহানের সরদার কে দুধ পান করাতে যাচ্ছেন তিনি! হতে যাচ্ছে সায়্যিদুল আম্বিয়ার দুধমাতা।

শিশুটিকে কুলে নিয়ে মাল সামানার কাছে আসতেই তার স্তন দুধে ভরপুর হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে এমনটা কখনো হয়নি। দুধের অভাবে তার ছোট সন্তান সারারাত কান্নাকাটি করত। তার স্বামী উটের কাছে গিয়ে তো আরো অবাক। ওলান দুধে টইটম্বুর হয়ে আছে। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সেটা ছিল দুধ শূন্য। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, হালিমা গো!আমরা তো একটি বরকতময় শিশুকে পেয়েছি। তার অসিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন, যা আমরা চিন্তাও করতে পারিনি।

হালিমা ছিলেন তাইয়েফের বনুসাদ গোত্রের অধিবাসী। এই গোত্রেই পাঠানো হয় শিশু মোহাম্মদﷺকে।তাইফে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। চারদিকে ছিল ক্ষুধার্ত লোকদের

আহাজারি। কিন্তু হালিমার পরিবারে দুর্ভিক্ষের কোন আচ লাগেনি।মহান আল্লাহ তার রহমত উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাদের জন্য।

সন্ধ্যা বেলায় বনুসাদের অন্যান্য ভেড়াগুলো ফিরে আসতো জীর্ণশীর্ণ অবস্থায়।কিন্তু হালিমার ভেড়া গুলো থাকত একদম হৃষ্টপুষ্ট। বাটগুলো টইটম্বুর থাকতো দুধে।লোকেরা তখন হালিমার ভেড়াগুলোর সাথে নিজেদের পশু চড়াতে লাগলো।কিন্তু ফলাফল আগের মতই হালিমার ভেড়াগুলো ফিরে আসত নাদুস নুদুস হয়ে,আর বাকিদের একটা অভুক্ত অবস্থায়। এখানেই শেষ নয়।হালিমা বলেন,শিশু মোহাম্মদ ﷺএমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো,যা অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।সাধারণ শিশুরা এক মাসে যেটুকু বাড়ে,একদিনেই তার বৃদ্ধি হতো ততটুকু। আর এক মাসে হতো এক বছরের সমান।

বাল্যকালে অলৌকিক ঘটনা :

নবিজির বয়স দু বছর পূর্ণ হলো।যুক্তি মোতাবেক এবার তাকে ফেরত দেয়ার পালা। কিন্তু মা আমিনার কাছ থেকে আরও সময় চেয়ে নিলেন হালিমা। কে ছাড়তে চাই এত বরকতময় শিশুকে!

হঠাৎ একদিন অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ফেরেশতারা নবীজির বুক চিরে কি যেন একটা বের করে দেয়। এই ঘটনায় ভীত হয়ে হালিমা শিশুটিকে নিয়ে যান মা জননীর কাছে। তাকে সব ঘটনা খুলে বলেন। মা আমিনা তখন বলেন তোমরা যা আশঙ্কা করছো,আল্লাহ তা হতে দিবেন না। আল্লাহর কসম! আমার ছেলের অনেক বিশেষত্ব রয়েছে। তাকে গর্ভে ধারণ করার সময় মনে হয়েছে,ওর চেয়ে হালকা ও সহজ কোন কিছু আমি কখনো বহন করিনি।সে গর্বে থাকাকালে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার থেকে একটি নূর বেরিয়ে বুসরার প্রসাদ গুলোকে আলোকিত করে ফেলেছে। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে আসার সময় সে সাধারণ শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়নি।দুহাত মাটিতে ভর দিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠানো অবস্থায় তার জন্ম হয়েছে।

বাল্যকাল থেকে ফুটে উঠে যে, তিনি সাধারণ কোন ব্যক্তি নন। উনার পবিত্র জবান থেকেই বলেন, একদিন আমি ছাগল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় সাদা পোশাকের দুজন লোক আমার কাছে এলো। তাদের একজন অপরজনকে বলছিল একে তার ১০ জন উম্মতের সঙ্গে ওজন করো। তখন অপরজন আমাকে দশ জনমতের সঙ্গে ওজন করলো। পাল্লা আমারটাই ভারী হলো।তারপর আমাকে ১০০ জন উম্মতের সঙ্গে ওজন করা হলো।এবারও আমার পাল্লা ভারী হলো।এরপর আমাকে মাপা হলো ১০০০ জন

উম্মতের সাথে।এবারও আমার পাল্লা ভারী হলো। প্রথম লোকটি বলল, ব্যাস!আর দরকার নেই। তাকে তার সমস্ত উম্মতের সঙ্গে ওজন করা হলেও তার পাল্লাই ভারী হবে।

সুবহানাল্লাহ! ইনি আমাদের রাসূল!ইনি আমাদের পথপ্রদর্শক। উনার সঙ্গে আমাদের কারও তুলনা চলে না। তিনি সবার চেয়ে সম্মানিত।

নবীজির শৈশব কাটে তাইফে। গ্রামীণ জীবনে নির্মল হাওয়ায় বেড়ে ওঠেন তিনি। মুক্ত পরিবেশ আর সতেজ প্রকৃতির ছোঁয়া পান অবিরত। তায়েফের বনুসাদ গোত্র প্রমিত আরবিতে কথা বলতো। এর প্রভাব ও দেখা যায় তার বচন ভঙ্গিতে। কত পরিচ্ছন্ন এক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী ﷺ।রহমতের বারিধারা আল্লাহ তায়ালা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তার হাবিবের জন্য। যেন তিনি হয়ে উঠতে পারেন সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ এক মহামানব।

চাচার স্নেহডোরে:-

খুব বেশিদিন মায়ের আদর সোহাগ জুটলো না নবীজির কপালে। ছয় বছর বয়সে মা আমিনার বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে। তখন থেকে লালন পালনের দায়িত্ব চলে আসলো তার দাদার কাছে। বালক মোহাম্মদ ﷺব্যতীত কেউ আব্দুল মুত্তালিবের বিছানায় বসার সাহস পেত না।

নবীজির বয়স তখন আট।দাদা আব্দুল মুত্তালিব চলে গেলেন পরপারে। চাচা আবু তালিবের ঘরে শৈশব কৈশোর পাড়ি দিলেন মহানবী ﷺ।সংসারে সহযোগিতার লক্ষ্যে ছাগল চড়াতেন বিশ্ব নবী ﷺ।শুধু তিনিই নন, তার মতো প্রত্যেক নবী ছাগল চরিয়েছেন। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষেরা নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।কৃষি,সেলাই, মিস্ত্রির কাজ থেকে নিয়ে মজদুরী পর্যন্ত তারা করেছেন।এতে কোন রূপ- অসম্মান বোধ করেননি। কেননা হালাল পেশায় লজ্জার কিছু নেই।

বুহাইরা পাদরির সাথে সাক্ষাৎ

:-সন্ন্যাসী বুহাইরা বের হয়ে এলেন তার মঠ থেকে। ইতিপূর্বে বহু কাফেলা আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে তিনি কারো খোঁজ নেননি। এবার তাহলে কোন যাদুঘরে দৃশ্য তাকে টেনে নিয়ে আসলো! বুহাইরা নিজে খুলে দিলেন সেই রহস্যের দুয়ার- এইতো বিশ্ব জাহানের সরদার। উনিতো আল্লাহর রসূল!

পাদ্রী বুহাইরা কুরাইশদের জানালেন, কাফেলা যখন রাস্তা ধরে চলছিল তখন সমস্ত গাছ আর পাথর তার সামনে নুয়ে পড়ছিল।আকাশের মেঘমালা তাকে ছায়া দিচ্ছিল। আর এইসব অলৌকিক ঘটনা কেবল নবীদের বেলায়ই ঘটে । আরো একটা নিদর্শন ধরা পড়েছিল তার চোখে। নবীজির কাধের মধ্যিখানে ছিল নবুওয়াতের সিলমোহর। বুহাইয়া আসমানী কিতাবের আলীম হওয়ায় সেটা ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। তিনি তখন কুরাইশদের অনুরোধ করলেন- তারা যেন মোহাম্মদ ﷺকে নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। রোমানরা যদি তাকে চিনতে পারে, তাহলে একেবারে সর্বনাশ করে ফেলবে। শেষ নবীকে হত্যা করার জন্য সব জায়গায় ওরা লোক লাগিয়ে রেখেছে। সন্ন্যাসী বারবার অনুরোধ করতে থাকলে একপর্যায়ে চাচা আবু তালিব নবীজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

যৌবনের আলেয়ায়

হিলফুল ফুযুল:

-তুচ্ছ ঘটনা কে কেন্দ্র করে বিরাট সংঘর্ষ বেধে গেল। সংঘর্ষ থেকে যুদ্ধ।একসময় তা মারাত্মক আকার ধারণ করল। কেউ কোন আইনের তোয়াক্কা করল না। যে যার মত ধ্বংসযজ্ঞ চালালো। স্বয়ং হারাম শরীফকে বানালো সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। চরম অরাজকতা চালানোর কারণে একে বলা হয় 'ফিজার' বা 'সীমালংঘনের যুদ্ধ '।মোহাম্মদ ﷺএর বয়স তখন ২০। তিনিও প্রত্যক্ষ করলেন এই যুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ। মুশফিকদের কান্ড লিলা তার অন্তরকে ঝাঁকুনি দিল প্রবলভাবে। এই যুদ্ধ দেখে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। যে সংগঠনের কাজ হবে হানাহানি ও মারামারি বন্ধ করা। মজলুমের সেবায় পাশে দাঁড়ানো।

সম্মানিত জিলকদ মাসে তারা একটি শপথমালার লিপিবদ্ধ করল। ফজল ইবনু ফুজালা,ফজল ইবনো ওয়াদাহ,ফজল ইবনু হারিস ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা। তাই এ সংঘের নাম দেয়া হয় "হিলফুল ফুজুল" ।নবী মুহাম্মদ ﷺএই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনিও যোগ দিয়েছিলেন এই সংগঠনে। তখন তার বয়স ছিল বিশের কোঠায়।

খাদিজার সাথে শুভবিবাহ :

- লোক নিয়োগ দিয়ে কারবার পরিচালনা করতেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহ। সেই সুবাদে এবার দায়িত্ব দিতে চাচ্ছিলেন নবীজিকে। ইতিমধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মক্কায়।বিশ্বস্ত জন হিসেবে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি। তাই খাদিজার পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলো, মোহাম্মদ ﷺচাইলে তার অংশীদারি কারবারে শরিক হতে পারেন।খাদিজা ওয়াদা করলেন অন্যদের চেয়ে বেশি মুনাফা তাকে দেওয়া হবে। নবীজী এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাকে সার্বক্ষণিক মনিটর করার জন্য পাঠানো হলো দাস মাইসারাকে।

ব্যবসার কারবার শেষ করে মক্কায় ফিরলেন প্রিয়নবী ﷺ।এরপর বাণিজ্যের খতিয়ান পেশ করলেন খাদিজার সামনে। হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল এবারের মত লাভ আর কোন চালানেই হয়নি। এর উপর আবার দাস মাইসারা যা শোনালো, তা তো আরও চমকপ্রদ। রোদেলা আলোয় চলার সময় নাকি মেঘ ছায়া দিয়ে নিচ্ছিল নবীজিকে। আবার যাজক নাস্তুরা মোহাম্মদ ﷺকে পরখ করে বলেছে যে তার মধ্যে নবুওয়াতের আলামত আছে। ভবিষ্যতে তিনি নবী হবেন।

দাসের রিপোর্ট শুনে কৌতুহলী হয়ে উঠলেন খাদিজা। ইতিপূর্বে বড় বড় সরদার নেতা ও গোত্র প্রদান তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কিন্তু সবাইকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার নিজে থেকেই পুতপবিত্র যুবক মোহাম্মদ এর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।আগ্রহের ব্যাপারটা খোলাসা করলেন বান্ধবী নাফিসার সামনে। নাফিসা তখন কোন প্রস্তাব নিয়ে গেল মোহাম্মদ ﷺএর কাছে। নবীজির চাচা আবু তালিবের সামনে বিষয়টি উঠানো হলে তিনিও সম্মতি জানালেন। পারিবারিকভাবে বিয়ে হলো দুজনার। বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো শাম থেকে ফেরার দুমাস পর। বিয়ের মোহরানা ছিল বিশটি উট।তখনকার হিসেবে প্রায় ৫০০ দিরহামের সমান। বিয়ের সময় খাদিজার বয়স ছিল ৪০ আর নবীজির ২৫। বংশ মর্যাদা সহায় সম্পদ বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে খাদিজা ছিলেন অতুলনীয়া। আর নবীজি তো নবীজি! তার কি কোন তুলনা হয়? খাদিজা ছিলেন নবীজির প্রথম স্ত্রী। তার জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলাকেই তিনি বিয়ে করেননি। তাদের ঘরে প্রথম যে সন্তান আসে তার নাম রাখা হয় কাসিম।এর ওই সুবাদে নবীজির উপনাম হয়ে যায় আবুল কাসিম।তারপর যাইনাব রুকাইয়া উম্মে কুলসুম ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ জন্ম হয়। আব্দুল্লাহ সহ নবীজির সকল পুত্র সন্তান

বাল্যকালী ইন্তেকাল করেন। তবে কন্যারা সবাই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। নবীজির সন্তানদের মধ্যে ইব্রাহিম ছাড়া সকলেই ছিলেন খাদিজার গর্ভজাত সন্তান।

কাবাঘর নির্মাণ

গ্রিসের জাহাজ ঝড়ের কবলে:-

সদূর গ্রিস থেকে যাত্রা শুরু করলো একটি জাহাজ।গ্রিস ছিল তৎকালীন উন্নত রাজত্বের এক চাক্ষুষ নিদর্শন। সেই সুবাদে ঐ জাহাজেও ছিল দুর্দান্ত জৌলুশের ছাপ। সেটাকে বানানো হয়েছিল বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পীদের সহায়তায়। খুব মজবুত কাঠ দিয়ে গড়া হয়েছিল পাঠাতন।নাবিকরা ও ছিল যথেষ্ট দক্ষ। পাশাপাশি ওই জাহাজের সফর করছিলেন খ্যাতিমান ইঞ্জিনিয়ার বাকুম। যাত্রীদের বিশ্বাস ছিল তারা গন্তব্যের পৌঁছে যাবে নির্ধারিত সময়ের আগেই।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেন হার মেনে নিচ্ছিল জাহাজের গতির সামনে। কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হঠাৎ পুষে উঠতে লাগলো। ক্রমাগত বাড়তে থাকলো গর্জন তর্জন। ঝড়ের কবলে পড়লো গ্রিসের চাকচিক্য ময় জাহাজটি। বাতাসের প্রবল গতির চাপে সেটি ক্রমাগত নাজেহাল হতে লাগলো। যাত্রীরা যেন কোনমতে পারে উঠতে পারলে বাঁচে। তড়িঘড়ি করে নাবিক সে জাহাজটির পাড়ে ভিড়ালো। শেষমেষ ওরা যে বন্দরে এসে নিজেদের আত্মরক্ষা করল, তার নাম জেদ্দা।জাজিয়াতুল আরবের একটি অঞ্চল। কিন্তু পাড়ে ভিড়তে ভিড়তেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল সবকিছু। শক্তপুক্ত কাঠ আর বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্প কোন কাজে আসলো না। সবগুলো কাঠ একত্র করে গ্রিসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত হল স্বল্পমূল্যে এগুলো বিক্রি করে অন্য জাহাজে করে তারা বাড়ি ফিরে যাবে।

মুশরিকদের প্রস্তুতি :

- ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে কাবা নির্মাণ করেছিলেন, সেটার কোন ছাদ ছিল না। চারদিকে কেবল উঁচু দেয়াল ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এর কোন সংস্কার হয়নি। তাই দেয়ালে ফাটল ধরেছিল। কাবা ছিল নিচু ভূমিতে। পাহাড়ি জলধারা সহজে ঢুকে যেত এর মধ্যে এখানে বর্ষাকালে জমে থাকতো একগাদা পানি। ওইদিকে আবার ছাদ না থাকার কারণে দেয়াল রূপকে ঢুকে যেত চোর,হাতিয়ে নিত কাবার মূল্যবান সম্পদ। কাবা সকলের

কাছে সম্মানিত একটি ঘর ছিল, মক্কা লোকের একে চরম ভক্তি শ্রদ্ধা করত। তাই কুরাইশ নেতারা সলাপরামর্শ শুরু করল কিভাবে কি করা যায়! অবশেষে সিদ্ধান্ত হল কাবাঘর সংস্কার করা হবে। কিন্তু টাকার অভাব দেখা দিল বাইতুল্লা নির্মাণ করার সময়। আবু ওয়াহহাব ইবনু বলে উঠলো, ওহে কুরাইশরা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিসকে পছন্দ করেন। তাই কাবার বাইতুল্লাহ নির্মাণ করবো হালাল সম্পদ দ্বারা, হারাম সম্পদ এখানে কাজে লাগাবো না। এতে কাবা ঘরকে অসম্মান করা হবে। আবু ওয়াহাবের প্রস্তাব তারা অক্ষর অক্ষরে মেনে নিয়েছিল। হালাল উপার্জন দিয়েই নির্মাণ করেছিল কাবাঘর।

মক্কা ছিল ধুধু মরুভূমি। মজবুত কাঠ এখানে কমই মিলতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় একটি রাস্তা খুলে গেল। মুশফিকরা শুনতে পেল, গ্রিসের জাহাজ জেদ্দা বন্দরে এসে ভিড়েছে। সে জাহাজের পুক্তকাঠগুলি পানির ধরে বিক্রি করা হবে। খবর পেয়ে ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা কে পাঠানো হলো জেদ্দায়।স্বল্প মূল্যে কাঠ নিয়ে আসা হল সেখান থেকে।সাথে বোনাস হিসেবে পাওয়া গেল ইঞ্জিনিয়ার বাকুমকেও।

বিখ্যাত অঞ্চলের কাঠ, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, আর হালাল টাকা শুরু হলো কাবা নির্মাণের কাজ। নির্মাণ কাজে শুরুতে পুরাতন দেয়াল ভাঙ্গার জরুরত দেখা দিল। কেউ যখন সাহস পাচ্ছিল না শেষমেষ ওয়ালিদ ইবনু মুগীরা সাহস করে এগিয়ে এলো। কোদাল হাতে নিয়ে বলল ওগো আল্লাহ, কল্যাণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমরা কাবার দেয়াল ভাঙছি না। এই কথা বলে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনির দিক থেকে সে ভাঙ্গা শুরু করল। মক্কার লোকদের মনে তখন অজানা ভয়। তারা বলতে লাগলো আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। যদি ওয়ালিদের উপর কোন আজাব নাযিল হয় তাহলে আমরা কাবা ঘরে আর হাত লাগাব না।

লোকেরা অপেক্ষা করতে লাগলো দেখা গেল ওয়ালিদ সুস্থ আছে। তারা ভেবে নিল আল্লাহ তাআলা এ কাজে সন্তুষ্ট আছেন। তখন পুরোদমে শুরু হল নির্মাণ কাজ।

সমস্যার সমাধান :-

কাজ চলতে থাকলো মুশরিকদের। কিন্তু মাঝখানে এসে ঘটলো বিপত্তি। হাযরে আসওয়াদ অত্যন্ত সম্মানিত পাথর। এই পাথরকে স্থাপন করবে সেটা নিয়ে শুরু হল তক্কা তক্কি। হাযরে আসওয়াদ স্থাপন করাকে বিরাট সম্মানের বিষয় মনে করা হতো। তাই কোন গোত্রই এ থেকে বঞ্চিত হতে চাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে ওদের মধ্যে ভয়ানক

ঝগড়াঝাঁটিতে রূপ নিল। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। শেষমেষ আবু উমাইয়া মাখযুমি প্রস্তাব দিয়ে বলল, হে কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে মারামারি বন্ধ কর চলো, আমরা কাউকে বিচারক মেনে নেই।

তারা জানতে চাইল, কে হবে সেই কাঙ্ক্ষিত বিচারক?আবু উমাইয়া বলল, মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি সবার আগে আসবে আমরা তার সিদ্ধান্তই মেনে নিব।সকলেই এই মতামতকে সমর্থন জানালো। খানিক বাদে দেখা দিল নবী মুহাম্মদ ﷺঢুকছেন ওই দরজা দিয়ে। তাকে দেখে খুশির বন্যা বয়ে গেল কুরাইশদের মাঝে। লোকজন বলতে লাগলো, এ তো আমাদের আলামিন আমরা তার যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিব।

মুশরিকরা তাকে সব ঘটনা খুলে বলল। তখন তিনি একটা চাদর আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর নিজ হাতে করে হাজরে আসওয়াদ রাখলেন চাদরের উপর। আর প্রত্যেক গোত্রের সর্দারকে ওই চাদরের কোনা ধরতে বললেন। সকলে ধরাধরি করে পাথরটিকে নিয়ে গেলেন কাবা ঘরে। এরপর মুহাম্মদ ﷺনিজ হাতে সেটি স্থাপন করে দিলেন। তার বুদ্ধি দীপ্ত পদক্ষেপ এর কারনে বন্ধ হল রক্তক্ষয়ী সংঘাত। খুশি হলো কুরাইশরাও।

কি সুন্দর গায়েবী ফয়সালা! একদিকে নবীজির পদক্ষেপে ঝগড়াঝাটি বন্ধ হল, অপরদিকে হাজরে আসওয়াদ মতো পবিত্র পাথর স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন হল স্বয়ং নবীজির হাত ধরে।কুরাইশরা দেখে নিল নেতৃত্বের গুণ মুহাম্মদ এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই আছে। অনাগত দিনে তিনি হতে পারবেন মক্কার নির্বাহী প্রধান।নবী ﷺছিলেন ষোলআনা বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তি। যার কারনে চোখ বুজে সবাই তার উপর আস্থা রাখতো। নবুয়াত পাওয়ার আগে থেকে তিনি ছিলেন স্রোতের বিপরীত দিকে চলা ব্যক্তি।অন্যায় অবিচারের সাথে তিনি আপোষ করেননি। জড়াননি কোন অশ্লীল কাজে। সমাজের পূজিত মূর্তির সামনেও তিনি মাথা নত করেননি। তিনি নিজে বলেছেন, আমি কখনো লাত উজ্জ্বার পূজা করিনি। গান বাজনা যিনা ব্যভিচার ও তথাকথিত সমাজিকতা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দূরে।

সমাজের স্রোত যেদিকে সেদিকে তোরই ভাসানোর নাম বীরত্ব না। স্রোতের বিপরীত দিকটাই বীরপুরুষরা বেছে নেয় যুগ যুগ ধরে। স্রোতের সাথে লড়াই করতে এর গতিপথটাকে যে পাল্টে দিতে পারে সেই তো আসল বীর। নবী ﷺকারিম শুরু থেকেই তেমন ছিলেন। অথচ আজ আমরা সমাজে আস্থা অর্জনের জন্য জাহিলিয়াত এর সাথে তাল মিলাচ্ছি। সামাজিক হওয়ার জন্য মেনে নিয়েছি সমাজের প্রচলন!

নবীজি নবুওয়াত পরবর্তী জীবন

হেরা গুহায় ওহি এলো

:- নবিজি ﷺনিজেও বুঝতে পারছিলেন কিছু একটা হতে যাচ্ছে। গাছ মাথা ঝুকিয়ে দিচ্ছে,পাথর সালাম জানাচ্ছে, মেঘ ছায়া দিচ্ছে.. ইদানিং আবার স্বপ্নে তিনি যা কিছু দেখছেন, তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এগুলো তো কিছু একটার পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি সেটা! একাকী থাকাটা তখন তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠছিল।বাড়ি ছেড়ে তিনি প্রায়ই চলে যেতেন হেরা গুহায়। একনাগারে বেশ কয়েকদিন কেটে যেত। মাঝেমধ্যে এসে কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আবার চলে যেতেন। কখনো আম্মাজান খাদিজা খাবার দিয়ে আসতেন।

শুনশান হেরা গুহার ভিতরে একদিন অবাক করা ঘটনা ঘটলো। এত আলোকময় পরিস্থিতি তিনি আর কখনো দেখেননি। ভয় পেয়ে গেলেন মোহাম্মদ ﷺ।আওয়াজ আসতে লাগলো -"হে মুহাম্মদ! আপনি পড়ুন! "তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, আমি তো পড়তে জানি না!

এ কথা শোনা মাত্রই আগন্তুক তাকে জুড়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। তার খুব কষ্ট হলো। একই কথা আবার রিপিট হল -"হে মুহাম্মদ! আপনি পড়ুন!"

প্রিয় নবী ﷺতখন আগের মতই বললেন, আমি তো পড়তে জানি না!

তৃতীয়বার আগন্তুক জুড়ে চাপ দিয়ে বললেন :

اقرا باسم ربك الذي خلق.حلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم.

আগন্তুকের কথাগুলো শুনে ভয় আরো বেড়ে গেল।শুরু হলো দুরু দুরু কম্পন। তিনি দৌড়ে এলেন খাদিজার কাছে। কম্পমান শহরে বলতে লাগলেন, আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও।আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও।

আম্মাজান খাদিজা তাই করলেন। তিনি ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনালেন প্রিয়তমা স্ত্রীকে। খাদিজা বললেন ভয় পাবেন না, আল্লাহ নামের শপথ! তিনি আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, মেহমানদারী করেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব বহন করেন, নিজ হাতে উপার্জন করে দুর্দশা গ্রস্তকে সাহায্য করেন। খাদিজার এক চাচাতো ভাই ছিলেন ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল নামে। জাহিলি যুগে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ইব্রানী ভাষায় পারদর্শিতা ছিল তার, ইঞ্জিলের

তরজমা ও করতে পারতেন অনায়াসে। খাদিজা তার স্বামীকে সে ভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা তখন জিজ্ঞেস করলেন, ওহে ভাতিজা! তুমি কি কি দেখো?

নবিজি ﷺযা যা দেখেছিলেন,সব ইতিবৃত্ত বর্ণনা কর। ওয়ারাকা তখন বললেন, উনি তো সে ফেরেশতা, যিনি মূসা আলাইহিস সালাম এর কাছে আসমানি বার্তা নিয়ে আসতেন। হায় আফসোস! তোমার কম যেদিন তোমাকে বের করে দিবে, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করতাম।

একথা শুনে মুহাম্মদ ﷺবললেন,তারা কি আমাকে বের করে দিবে?

ওয়ারাকা বলেন হ্যা। তোমার মত আসমানী বিধান যে নিয়ে এসেছে, তার সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে।সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি তবে নির্ঘাত তোমাকে সাহায্য করবো।

ওয়ারকার এ কথা শুনে তারা বুঝতে পারলেন, ওই আগন্তুক ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইল আমিন। তিনি এসেছিলেন আল্লাহর কালাম নিয়ে। মোহাম্মদ ﷺকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত করা হয়েছে। তিনি সে প্রতীক্ষিত নবী, যার কথা আহলে কিতাবরা এতদিন ধরে বলে আসছে। বহু বছর ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছে গোটা পৃথিবী। তিনি এসে গেছেন। আহলান সাহলান ইয়া রাসূলুল্লাহ!

নবুয়াত প্রাপ্তির ঘটনা ঘটে সোমবার রাতে শেষ প্রহরে। সময়টা ছিল রমজান মাসের কদরের রাত্রি। সে বছর কদর ছিল ২১ রমজানে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে অনুসারে তারিখটি ছিল ১০ আগস্ট। তখন নবীজির বয়স ৪০ এর কোঠায়। এর কিছুদিন পরেই খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি সত্যায়ন করেছিলেন নবীজিকে। রাসুলুল্লাহ ﷺতার ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা ওয়ারকার বদনাম করবে না। কারণ আমি দেখেছি, তার জন্য রয়েছে একটি বা দুটি জান্নাত।

নবুওয়াত ও রিসালাতের যে দায়িত্ব রাসূলুল্লাহকে ﷺপ্রদান করা হচ্ছিল, তা ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরু দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

انا سنلقي عليك قولا ثقلا

নবীজিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার দরকার ছিল। এজন্য বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ থাকে। একই সাথে তার মাঝে যেন ফেরেশতার সাথে মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়,এটি ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিশেষ ট্রেনিং পিরিয়ড।এটা শেষ হলে আবার অভি আসতে থাকে।

একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺহাঁটছিলেন রাস্তার কিনার ধরে। হঠাৎ বিকট শব্দ পেয়ে উপরের দিকে তাকান। দেখেন হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা বসে আছে। তিনি বসেছিলেন আসমান জমিনের মধ্যিখানে এক চেয়ারে। তার গায়ে ৬০০ ডানা। এক একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন প্রিয়নবীﷺ। ঘরে পৌঁছে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন নাযিল করা হলো :

يا ايها المدثر. قم فانذر. وربك فكبر. **وثيابك فطهر. والرجز فاهجر.**

পুনরায় ওহীর ধারা শুরু হলো। সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল সূরা আলাকের কিছু আয়াত দিয়ে।এটি ছিল নবুওয়াতের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। তখন তাকে কেবল পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সূরা মুদ্দাসসির এর মাধ্যমে তাবলীগের নির্দেশ এসে যায়।

ইমান কবুল করলেন যারা:-

নবিজির সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন আম্মাজান খাদিজা। দাওয়াত পাওয়া মাত্রই সারাদিন এই মহীয়সী নারী। নারীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। এরপর নবী কারীম ﷺছুটে যান আবু বকরের কাছে। তিনি একদিকে রসূলের বন্ধু, অপরদিকে মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। নম্র-ভদ্র-মিশুক হিসেবে তার সুনাম ছিল বেশ। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মুহাম্মদ ﷺএর সত্যবাদিতা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। রসূল ﷺএর মুখে পুরো ঘটনা শোনার পর তিনি এতোটুকু সন্দেহ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিলেন তাওহীদের কালিমা। স্বাধীন যুবকদের মধ্যে আবু বকর ছিলেন প্রথম ঈমান কবুলকারী। কিশোর আলী রাদিয়াল্লাহু, খাদিম জায়েদ ইবনু হারিসা ও মুসলিমদের কাতারে নাম লেখান।

সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার দিনে এই চারজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। ওদিকে আবু বকরের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম কবুল করেন ওসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ।এভাবেই চলতে থাকে ইসলামী মিশনের ধারা। তিন বছর ধরে গোপনে গোপনে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন প্রিয়নবী ﷺ।

প্রকাশ্য দাওয়াতের কাল--

হুঁশিয়ার!সাবধান! এ ধরনের ডাক শুনলে বুঝা যেত, যে বিশেষ কোন সংবাদ আছে। তাই পঙ্গপালের মতো ছুটে এলো লোকেরা। যে আসতে পারলো না, সে তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। তারা এসে দেখল "আল আমিন" দাঁড়িয়ে আছেন সাফা পাহাড়ের উপরে। লোকেরা সমবেত হলে তিনি বললেন, 'ওহে লোকসকল! আমি যদি বলি পাহাড়ের পাদদেশে একটি শত্রু বাহিনী উত পেতে বসে আছে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?

তুমি তো কখনো মিথ্যা বলো না, ধোকা দাও না। বিশ্বাস করব না ? আল আমিন উপাধি তারাই দিয়েছিল মোহাম্মদﷺকে। তার কথা ও বিশ্বাস করার জো ছিল না। সকলেই জানতো, তিনি কোনদিন প্রতারণা করবেন না, এটা তার ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। তখন নবী কারীম ﷺবললেন,তাহলে শোনো! এক ভয়ানক শাস্তি আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করতে এসেছি। হে লোকসকল! তোমরা বলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাহলে কামিয়াব হয়ে যাবে।

কাফিরা প্রথমে জানিয়ে দিয়েছিল যে, নবীজির কথা তারা বিনা বাক্যে মেনে নিবে। কিন্তু নবী ﷺযখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেল।আবু লাহাবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ্য করার মতো। দুহাত উছি এসে কটাক্ষ করে বলতে লাগলো, ধ্বংস হও তুমি! এসব বলার জন্যই কি সকাল-সকাল আমাদের জড়ো করেছিলে? নবীজিকে কটাক্ষ করে সে দ্রুত ছুড়ে মারলো। আবু লাহাবের উদত্ব বরদাস্ত করলেন না আরশের অধিপতি। তিনি নাজিল করলেন :

طبت يدا ابي لهب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب.

তিন বছর ধরে গোপনে গোপনে দাওয়াতি কাজ যারা ছিলেন আল্লাহর নবী ﷺ। আজই তিনি প্রকাশ্যে তাবলীগ শুরু করলেন। কিন্তু প্রথম দিনে চরম বাধার মুখে পড়তে হলো তাকে।কালিমার ছোট্ট একটি বাক্য যেন কাপন ধরিয়ে দিয়েছিল মুশরিকদের অন্তরে। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাওহীদের বাণীর আসল হাকিকত কি। আসলে সত্য দীনের প্রকৃতি এমনই হয়।

দাওয়াতি কাজ থামানোর চেষ্টা ভয় দেখিয়ে :-

রাসুলুল্লাহ ﷺকখনো কাউকে গালমন্দ করতেন না। তার জবান থেকে শুধু উত্তম কথাই বের হতো। তিনি শুধু মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাকতেন। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের কথা বলতেন। কিন্তু এটিকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত অর্থে ধরে নেয় কুরাইশরা। তাই কুরাইশ সর্দাররা নালিশ নিয়ে হাজির হলো আবু তালিবের বাড়িতে-আবু তালিব! বয়স,মর্যাদা, নেতৃত্ব সবকিছুতেই আপনি আমাদের মধ্যমণি। আমরা আপনার ভাতিজাকে থামাতে বলেছিলাম। কিন্তু আপনি তা করেননি। আল্লাহর কসম! আমাদের পূর্বপুরুষদের গালি দেওয়া হবে, আমরা নির্বোধ আখ্যা দেওয়া হবে, আমাদের উপাসদের দোষ চর্চা করা হবে, আর আমরা বসে বসে দেখব হয়! হয় আপনি তাকে থামাবেন নয়তো আমরা তার সাথে বোঝাপড়া করব।

আবু তালিব এর কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। তিনি নবিজিকে বললেন, শোনো ভাতিজা! তোমার কওম আমাকে এই এই বলে শাসাচ্ছে। আমাকেও তোমাকে নিস্তার দাও। আমার উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না।

রাসুলুল্লাহ ﷺধারণা করলেন চাচা তাকে সাহায্য করা ছেড়ে দিচ্ছেন। তাকে তুলে দিচ্ছেন কুরাইশেরদের হাতে। তিনি বললেন, চাচাজান! আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও এই সত্য প্রচার থেকে আমি বিরত হবো না। হয় আল্লাহ এই দীনকে বিজয়ী করে ছাড়বেন, নতুবা আমি শেষ হয়ে যাব। কিন্তু এ দায়িত্ব থেকে পিছু হটবোনা। কথা বলতে বলতে অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়েছিলেন বিশ্বনবী ﷺ।এটা দেখে আবু তালিবের মন গলে গেল। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভাতিজা তোমার যা খুশি বল আমি তোমাকে কখনোই ওদের হাতে সোপর্দ করব না। তিনি কুরাইশদেরকে বললেন আল্লাহর কসম আমার ভাতিজা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। কাজেই তোমরা চলে যাও। আমি কিছু করতে পারবো না।

কুরাইশরা যদি বাপ দাদাদের দোহাই দিয়ে মিথ্যাকে সমর্থন করতে পারে, তাহলে তিনি কেন স্বজনপ্রীতের আলোকে সত্যকে সমর্থন করতে পারবেন না? যখন মানুষ গোত্র প্রীতির কারণে বাতিল মতাদর্শ গ্রহণ করে নিচ্ছে, তখন ভাতিজার পক্ষে গিয়ে সত্য দিনকে সমর্থন দিতে সমস্যা কোথায়! আবু তালিব নবীজির পক্ষে গেলেন।

কুরাইশদের রক্ত চক্ষু নবীজিকে পিছু হটাতে পারল না।

আপোসরফার প্রস্তাব :-

সূর্য ডুবে গেছে আবু কুবাইস পাহাড়ের পাথর দেশে। পেরেশান হয়ে বসে আছে মক্কার কুরাইশরা। বাইতুল্লাহর পাশে বসে তারা নতুন ফন্দি আটছে। যে করেই হোক, বন্ধ করতে হবে ইসলামের অগ্রাভিযান। উতবা, শাইবা, নাদার, আবু সুফিয়ান, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহুল সহ সব চোমচোমড়া ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত। আর কোন রাস্তা না পেলে তারা আপোসরফার দিকে এগোবে। আপাতত এটাই সিদ্ধান্ত হলো।

কথার জালে মোহাম্মদকে ফাঁসানোর জন্য এগিয়ে দেওয়া হলো উতবাকে। কুরাইশ বুদ্ধিজীবী বলতে শুরু করল তার কথা- হে মুহাম্মদ! তোমাকে কিছু কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর কসম! তোমার জাতির মধ্যে তুমি যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছ, এর চেয়ে মারাত্মক অবস্থা আর কখনো দেখিনি। তুমি আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিয়েছো, আমাদের কর্তৃত্ব লন্ড ভন্ড করে ফেলেছ। লোকেরা এখন তলোয়ার নিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় আছে। যেকোনো সময় একপক্ষ অপরপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হে যুবক! তোমার যদি আর্থিক চাহিদা থাকে, তাহলে বল! আমরা তোমাকে আরবে সবচেয়ে বিত্তশালী পুরুষ বানিয়ে দেবো! যদি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করো, তাহলে সেটাও বলো! তোমার পছন্দসই কুরাইশ নারীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করবো। তুমি চাইলে দশজন সম্ভ্রান্ত নারীকেও বাছাই করতে পারো।হে যুবক! তুমি কি পদমর্যাদা চাও? আমরা তোমাকে আরবের নেতা বানিয়ে দিব। যদি জিনভূতে ধরে থাকে, তাহলে সেটাও বল। যত টাকা লাগুক, আমরা তোমার উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এখন বলো, তোমার যাওয়া কি?

এক নিশ্বাসে উতবা বলে গেল কথাগুলি। নবি ﷺমনোযোগ দিয়ে তা শুনলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺউতবার জবাবে বললেন, তোমরা যা বলছো,তার কোনোটাই আমি চাই না।আমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি,তার বিনিময়ে অর্থ-সম্পদ-রাজত্ব কামাই করা আমার উদ্দেশ্য না।আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের কাছে তার বাণী পৌঁছে দিতে এসেছি।তোমরা যদি আমার আনীত দাওয়াত গ্রহণ করো, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত হবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকো। তিনিই আমাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দেবেন।

নবি ﷺএই প্রস্তাব পুরোপুরি নাকচ করে দিলেন।কালিমার মূল কথাই যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, এখানে অন্য কারো ইবাদতের প্রশ্ন আসবে কি করে! এর তো কোনো সুযোগই নেই।

জাহিলিয়াতের সাথে আপোষ করে ইসলাম তার দাওয়াতি কাজ চালায় না কখনো। বরং এই দিনকে সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরে জনতার সামনে। যাতে করে লোকে বুঝতে পারে এ এক অনন্য সাধারণ জীবনব্যবস্থা।

কাফিরদের আপোসরফার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে জবাব শিখিয়ে দিলেন :-

قل يا ايها الكافرون. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عبدون ما اعبد. ولا انا عابد ما اعبدتم. ولا انتم عبدون ما اعبد.لكم دينكم ولي دين.

পর পর দুটো প্রস্তাবে ব্যর্থ হয় কুরাইশরা। এরপর তিন নম্বর চাল পেশ করে তাহলে কুরআনের কিছু অংশ বদলে দাও। যাতে সেটা আমাদের আদর্শ মাফিক হয় । বিশ্বনবী ﷺএই প্রস্তাব ও ছুড়ে ফেললেন।আল্লাহ তাআলা জবাব শিখিয়ে দিলেন তার রাসূলকে :-

"বলো, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনো পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। আমি তো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তাহলে এক ভয়াবহ দিনের শাস্তির আশঙ্কা রাখি "

ওরা একটু ছাড় চায়,একটু আপোস করার কথা বলে। কুরআন ওদের মনোভাব সম্পর্কে বলে:-

"তারা কামনা করে-যদি তুমি আপোসকামী হও,তাহলে ওরাও আপোস করবে।"

ইসলাম ছাড়া বাকি সকল মতাদর্শ হলো জাহিলিয়াত।

কুরআনের প্রভাব :-

দিনে দিনে মুশরিকদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। তারা ঘন ঘন শলা-পরামর্শ করতে লাগল।তাদের সব আলোচনা এখন মুহাম্মদ ﷺকে ঘিরে। তাকে থামাতে হবে যে-কোনো মূল্যে।কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবে,এমন যোগ্যতা সম্পন্ন লোক কে আছে! সকলে নজর ঘুরে ফিরে রাবিয়া ছেলে উতবার দিকে। কবিতা গণকসশাস্ত্র

ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালো দখল আছে তার। সেই হয়তো বুঝিয়ে শুনিয়ে একটা দফারফা করতে পারবে।

উতবা চলে গেল নবিজির কাছে।গিয়ে তার মতো বকবক করল কিছুক্ষণ। ওর কথা শেষ হলে প্রিয়নবী ﷺকুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। সূরা ফুসসিলাতের প্রথম আয়াত থেকে পড়তে পড়তে এখানে এসে থামলেন:-

"এখন যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের বলে দাও -আদ ও সামুদের উপর যে ধরনের আজাব নাযিল হয়েছিল,আমি তোমাদেরকে হঠাৎ সেই ধরনের আজাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি!"

নবিজি শেষ না-করতেই উতবা তার মুখ চেপে ধরে বলল, 'আল্লাহর দোহাই,থামো। যথেষ্ট হয়েছে!'

কুরআনের আয়াত যেন তার কলিজায় গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছিল।মনে হচ্ছিল,না-জানি এখনই আযাব চলে আসবে। মুহাম্মদ ﷺযেহেতু বলছেন,তার মানে আর রক্ষে নেই। উতবা ফিরে গেল মাথা নিচু করে।

কুরাইশরা ভাবছিল, হয়তো কোনো ভালো খবর আছে। কিন্তু তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিল উতবা ইবনু রাবীয়া। জড়সড় গলায় বলল, 'তোমরা যা কিছু বলতে বলেছিলে, তার কোনোটাই বাদ রাখিনি। সবই তাকে বলেছি।'

'সে কোনো জবাব দিয়েছে?' আগ্রহের কণ্ঠের ফিরতি প্রশ্ন। কুরাইশদের যেন আর তর সইছে না। উতবা বলল, হ্যা বলেছে! তবে তার কোনো কথাই আমার বুঝে আসেনি,কেবল এটি ছাড়া -"আদ ও সামুদ জাতির ওপর যে ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিল,আমি তোমাদেরকে হঠাৎ ওই ধরনের আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি!"

'কী বলছো এসব? সে কি তোমার সাথে তোমার ভাষায় কথা বলেনি?'

'হ্যা,বলেছে।'

'তুমি তার কথা কিছুই বোঝেনি!'

'আল্লাহর কসম! শাস্তির কথা ছাড়া আমার আর কিছুই বুঝে আসেনি।'

আবু জাহেল দেখল পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। এতগুলো লোকের লোকের সামনে উদ বা তার প্রাজ্ঞ লোক কুরআনের পক্ষে সাফাই গাইছে! না, এটা তো ভালো লক্ষণ না। এখনই যদি সামাল দেওয়া না হয়, তবে বুমেরাং হয়ে যাবে সব। আমজনতা যদি এই কথা জানতে পারে তাহলে তো দলে দলে তারা ইসলাম কবুল করে ফেলবে।

তাই প্রেক্ষাপট ঘুরানোর জন্য সে বলে উঠলো, উতবা আর উতবা নেই। সে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে! মোহাম্মদের জাদু তাকেও বশ করে ফেলেছে।

উতবা এর প্রতিবাদ করে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এমন কিছু শুনে এসেছি যা ইতিপূর্বে কোনদিন শুনিনি। ওগুলো না জাদু, আর না কল্পকাহিনী। শুনো তোমরা! মোহাম্মদকে তার অবস্থাই ছেড়ে দাও। যদি আরবরা তাকে খতম করে দেয়, তাহলে তো ভালই হলো। আর যদি সে বিজয়ী হয়, তাহলে তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান। সে তো কুরাইশ গোত্রেরই লোক।

মক্কার বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে তার নাম ডাকছিল উতবার। কুরআন তাকে ও আলোড়িত করে ফেলেছিল। তাই কুরাইশদের ভয়ের অন্ত ছিল না। কুরআনের প্রভাব যেন আমজনতার উপর ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দিল কুরাইশরা। কাফিররা জানত -নবি ﷺযা বলছেন, তা সত্য। এমনকি নবীজির চিরশত্রু আবু জাহেলও এ কথা বারবার শিকার করেছে। একদিন মুগিরা ইবনে শুবা ও আবু জাহল হেঁটে যাচ্ছিল মক্কার গলি দিয়ে। হঠাৎ নবীজির সাথে তাদের দেখা। নবি ﷺওদের দুজনকেই ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহ ও তার রাসুলের সহযোগী হতে বললেন। এই মহতী প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল আবু জাহেল। কিন্তু নবীজি চলে যাওয়ার পর সে বলল: 'আল্লাহর কসম! আমি হলফ করে বলতে পারি, মোহাম্মদ যা বলছে তা সত্য। তবে কিছু ব্যাপার আছে, যার কারণে আমি তার অনুসরণ করতে পারছি না।

আবু জাহল মনে মনে ভাবতো বংশ মর্যাদা ও আবিজাত্যের দিক থেকে আমি আর মুহাম্মদ ﷺ সমানে সমান।এখন যদি তার নবুয়াতকে স্বীকৃতি দেই, তাহলে সে তো আমার উপরে উঠে যাবে। আমার একত্রিতের অবস্থান আর বহাল থাকবে না। এ ধরনের জাহিলি অহমিকা থেকেই সে ঈমান কবুল করেনি। অথচ তার দিল সাক্ষ্য দিত কুরআন সত্য, মুহাম্মদ ﷺসত্য, ইসলাম সত্য।

তখনো মুসলিম হননি ওমর। কি মনে করে যান ঢুকে পড়েছিলেন কাভার চত্বরে। গিয়ে দেখলেন নবীজি ﷺ নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহ পিছন থেকে তাকে টার্গেট করছিলেন বারবার। কিন্তু তেলাওয়াতের সুর তার কানে আসা মাত্রই কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'কুরআনের গাঁথুনি আমাকে বিস্মিত করে দিচ্ছিল! আমি মনে মনে ভাবছিলাম-আল্লাহর কসম! এটা খুবই সুন্দর কবিতা। মোহাম্মদ ﷺএকজন বড় মাপের কবি। নবিজি তখন পাঠ করলেন:

"এটা কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করে থাকো।"
ওমরের চোখ যেন কপালে উঠে গেল। তিনি মনে মনে যে কথা ভাবলেন, সেটার জবাব দিচ্ছেন মোহাম্মদ ﷺ। তবে কি তিনি গণক! তাই মনের কথা ধরে ফেলেছেন! নবিজি তখন পাঠ করলেন,
"আর এটা কোন গণকের কথা ও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা ভাবনা করে থাকো।"
ওমর রাদিয়াল্লাহ পড়লেন মহা যন্ত্রণায়। তিনি যাই ভাবছেন, তার ঐ জবাব চলে আসছে তিলাওয়াতের মাধ্যমে। ওমর রাদিয়াল্লাহ তখন ভাবতে লাগলেন, তাহলে এটা কি? এগুলা কার বাণী? তিলাওয়াত থেকে জবাব এল:
"এটাতো বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত "
এভাবে সুরাটির শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন প্রিয় নবী ﷺ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন খাত্তাবের ব্যাটা ওমর রাদিয়াল্লাহ। কুরআনের প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে যেতে লাগল তার হৃদয়ের গহীনে।
আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, কুরআনের সমতুল্য ১০ টি সূরা যেন বানিয়ে আনা হয়। মুশফিকরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সাহস পায়নি। এরপর তাদেরকে মাত্র একটি সূরা রচনা করার প্রস্তাব দেয়া হয়। তারা সেটাও পারেনি। তারাও জানত, এটা আসমান থেকে অবতীর্ণ এক মহান কিতাব। এর মোকাবেলা করার সাদ্যি কারও নেই।

সত্যবাদিতার পরীক্ষা :-

নাদর ইবনু হারিস এবং উকবা ইবনে আবু মুয়াইতকে পাঠানো হলো মদিনায়। ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে মতবিনিময় করার জন্য। ইহুদিরা ছিল আহলে কিতাব। নবীদের বৈশিষ্ট্য গুলো উল্লেখ করা ছিল তাদের কিতাবে। ওদের সাথে কথা বললে একটা ধারণা পাওয়া যাবে মোহাম্মদ ﷺ সত্যি নবী কিনা।
ইহুদি আলেমরা তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিল। এটাও বলল যে, এগুলোর উত্তর কোন প্রতারক দিতে পারবে না।
নাদর এবং উকবা ফিরে এল মক্কায়। ইহুদিদের শেখানো তিনটি প্রশ্নর কথাও জানাল। কুরাইশরা তখন বেজায় খুশি। তারা ভাবল, এবার মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেই

ছাড়ব! কুমতলব নিয়ে তারা গেল নবীজির বাড়িতে। ঝটপট ইহুদিদের শেখানো প্রশ্নগুলো উগরে দিল :

১. প্রাচীনকালের সেই যুবকদের কাহিনী শোনাও, যারা দেশ ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিল।

২. সেই লোক কে, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম মেরু পর্যন্ত সফর করেছিলেন?

৩. রুহ কি জিনিস?

প্রশ্ন শুনে নবী করিম ﷺবললেন আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেব। এই সময় ইনশাআল্লাহ বলতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

পরের দিন তারা আবার গেল নবীজির কাছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তিনি মূলত ওহীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ওহী আসেনি। ফানি জবাবের অপেক্ষায় চুপ থাকলেন প্রিয় নবী ﷺ। কুরাইশরা তখন খুশিতে নেচে উঠলো।

নবীজির বদনাম ছড়াতে মুশরিকরা পারদর্শী। এবার তো সুযোগ হাতের মুঠোয়। একদিন দুইদিন নয় গোটা ১৫ দিন চলল এই ধরনের উৎপাত। তবুও নবীজি কিছু বললেন না। তিনি চাইলে কিছু একটা বলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারতেন। যেহেতু এটার সম্মান জড়িত ছিল কিন্তু আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন না নবিজি ﷺ।

অবশেষে সমাধান নাযিল হল। সূরা কাহাফের মাধ্যমে জবাব শিখিয়ে দিলেন আল্লাহ তায়ালা।

১. প্রাচীনকালের সেই যুবকদের কাহিনী শোনাও, যারা দেশ ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিল - আসহাবে কাহাফ

২. সেই লোক কে, যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম মেরু পর্যন্ত সফর করেছিলেন - জুলকারনাইন

৩. রুহ কি জিনিস? - আল্লাহর হুকুম।

টানা 15 দিন নবীজিকে অপমান সইতে হয়েছে, টিটকারি শুনতে হয়েছে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আবোল-তাবোল বা মিথ্যা কোন কিছু বের করা যায়নি। প্রাণনাশের হুমকি থাকা সত্ত্বেও সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন, তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলার সাধ্যি আছে কার!

চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরন :-

মক্কার লোকজন চেয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺযেন তাদেরকে একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখান। তাহলে তারা ঈমান আনবে। আল্লাহর হুকুমে তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা

প্রকাশ পায। নবীজির আঙ্গুলের ইশারায় দুই ভাগ হয়ে যায় আকাশের চাঁদ। কুরাইশরা তখন ভোল পাল্টে ফেলে। তারা নবীজিকে বলে, তোমার রব কে বলো তিনি যেন সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণ পরিণত করে দেন। তাহলে আমরা ঈমান আনবো।
নবি কারীম ﷺআল্লাহর নিকট দুয়া করেন। এর প্রেক্ষিতে জিব্রাইল আলাইসাল্লাম এসে তাকে বলেন, আপনার মহামান্বিত রব আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন- তুমি চাইল, সাফা পাহাড়টি তাদের জন্য সোনায় পরিণত করে দেয়া হবে। তবে এরপর তাদের যারা কুফরি করবে, তাদেরকে আমি এমন শাস্তি দেবো যা মহাবিশ্বের অন্য কাউকে দেবো না। আর তুমি চাইলে, তাদের জন্য তওবা ও করুণার ধার উন্মুক্ত রাখা হবে।
প্রিয়নবী ﷺতখন বললেন, তাহলে তওবা ও করুনার দ্বারই উন্মুক্ত থাকুক। এরই প্রেক্ষাপটে আল্লাহতালা নাযিল করলেন :
"আর এদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে বলেই তো আমি নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রয়েছি, সামূদকে আমি প্রকাশ্যে উটনী এনে দিলাম এবং তারা তার উপর জুলুম করল। আমি নিদর্শন তো এর জন্যই পাঠাই যাতে লোকেরা তা দেখে ভয় পায়।"

মুশরিকদের ঠুনকো পদক্ষেপ :

- হজের মৌসুমী ঘনিয়ে আসছে। ক'দিন পরই লোকজন এসে হাজির হবে মক্কায়। যদি মুসলিমরা হাজীদের পেয়ে বসে? যদি কুরাইশদের জারিজুরি সব ফাস হয়ে যায়? তবে তো নেতৃত্বের সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না। ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার সাথে এ বিষয় নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল কুরাইশদের। সে বয়সে প্রবীণ ও মক্কার সম্মানিত ব্যক্তি। কুরাইশরা তাকে একটা উপায় বের করতে বললো।
তারা প্রস্তাব বের করলো হাজিদের বলবে মুহাম্মদ ﷺগণক,না হয় উন্মাদ,না হয় কবি,না হয় জাদুকর। কিন্তু তার কোনোকিছুতেই এই ধরনের কিছুই মিল নেই। তাহলে হাজীদের বলবেটা কি!
ওয়ালিদ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আল্লাহর কসম! ওর কথাগুলো খুব স্বচ্ছ আর আকর্ষণীয়। যে অভিযোগই করো না কেন,ধোপে টিকবে না। তাকে জাদুকর বলে চালিয়ে দিবো। ওর জাদুর ছলেই আজ মক্কার পরিবারগুলোর ভাংন ধরেছে।

ওয়ালিদ নিজেও জানত,সে যা বলছে তা আগাগোড়াই মিথ্যা। জাদুকরের বিষয়টি সে নিজেও অস্বীকার করেছে।

হজের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল সর্দাররা। মক্কার ঢোকার পথগুলোতে টহল টেবিল বসাল। প্রতিটা হাজি সাহেবকে সতর্ক করতে থাকল নবিজির ব্যাপারে। নবিজির কাছে যেতে এমনকি তার কথা শুনতেও মানা করল।

যারা এতদিন নবি মুহাম্মদ ﷺসম্পর্কে কিছুই জানত না,তাদের কাছেও পৌছে গেল নুবুওয়াতের বানী। অনেক হাজির সাথে নবিজির দেখাও হলো। তাবুতে ঘুরে ঘুরে তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন, হে লোকসকল! বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", কামিয়াব হয়ে যাবে।

হজ শেষে ফিরে গেল আগত লোকেরা। সাথে করে নিয়ে গেল নুবুওয়াতের খবর। পুরো আরব জুড়ে শুরু হলো এর কানাঘুষা। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠল দীনের ব্যাপারে। মক্কার বাইরে ছড়িয়ে গেল ইসলামের বারতা।

নবিজির ওপর জুলুম-নির্যাতন

কাবা চত্বরে হামলা :

- নবিজিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে কুরাইশরা। অন্যান্য দিনের মতোই কাবার চত্বরে হাজির হলেন আল্লাহর নবি ﷺ। তাকে দেখামাত্রই কুরাইশরা বলতে লাগলো, 'অনেক সহ্য করেছি, আর না'। আমাদের পিতৃপুরুষের সাথে বেয়াদবি করেছে। আমাদের ধর্মের দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করেছে। আমরা ওকে ছেড়ে কথা বলবো না।

তাদের কথা কথার মাঝে রসূল ﷺতাওয়াফ শুরু করলেন। মুরশিকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা নানান কটুক্তি শুরু লাগল। তিনি এড়িয়ে গেলেন। পরপর দুইবার একই কাণ্ড ঘটালো। তখন রসূল ﷺ বললেন, ওহে কুরাইশের দল! তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য জবাই নিয়ে এসেছি।

এতক্ষণ কুরাইশরা বেশ খোশ মেজাজেই ছিল কিন্তু এইকথা শোনা মাত্র তাদের কলিজায় কাপন ধরে গেল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি হম্বিতম্বি করছিল, সে কেবল এটুকু বললো, আবুল কাসিম! এখান থেকে চলে যাও।

কুরাইশরা জানত, নবীজি কখনো জুজুর ভয় দেখান না। তিনি যা বলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। তিনি যেহেতু জবাইয়ের কথা বলেছেন, তার মানে ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করছে কুরাইশদের জন্য।

পরদিন তারা আবার সমবেত হলো। একে অন্যকে এটা সেটা বলতে লাগল।

ওদের কথা শেষ না-হতেই রাসূল ﷺকাবার প্রাঙ্গনে ঢুকলেন। বদমাশরা তখন একযোগে তাকে ঘিরে ধরল। বলতে লাগল, তুমি নাকি আমাদের জন্যে জবাই নিয়ে এসেছো?

রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন, হ্যা, ঠিকই শুনেছো। অমনিই চারিদিক থেকে শুরু হলো কিল-ঘুষি। বেয়াদবির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল কুরাইশরা।

কেউ একজন আবু বকরকে খবর দিতেই তিনি এসে হাজির হলেন। নবীজির ওপর এমন পাশবিক হামলা দেখে কোমল মানুষটি সইতে পারলেন না। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন এই জন্যই কি তাকে মেরে ফেলতে চাও!

আবু বকর রাদিয়াল্লাহুর কথা শুনে মুশফিকরা আরও ক্ষেপে গেল। নবীজিকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত রাগ ঝাড়ল তার ওপর। আঘাত করতে করতে মানুষ থেকে নাজেহাল করে ফেলল। অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, আবু বকরের মাথায় হাত দিলে চুল উঠে আসতো। এমন পরিস্থিতিতেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহুর ধৈর্য নিয়ে বলেছিলেন, হে সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক, তুমি কতই- না মহান।

আবু জাহেলের স্পর্ধা :-

হামলা করার পরেও নবিজি দমে যাননি। কাজ চালিয়ে গেছেন পূর্ণদমে। গণ্ডমূর্খ আবু জাহেল এটা সহ্য করতে পারেনি। সে দম্ভ করে বলল, মোহাম্মদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকায়?

কুরাইশরা বলল, হ্যা!

লাত-উযযার কসম! কাল যদি তাকে এই অবস্থায় দেখি, তাহলে মাটির সাথে পিষে ফেলব! (নাউযুবিল্লাহ!)

পরদিন ভোরে নবি ﷺআসলেন কাবার চত্বরে। লোকেরা দূর থেকে অপেক্ষা করতে লাগল আবু জাহলের কান্ড দেখার জন্য। দয়ার নবী ﷺযথারীতি নামাজ শুরু করলেন। আবু জাহেল এই সুযোগটা লুফে নিতে চাইল। নবীজির ঘাড় মুবারকে পা দেয়ার উদ্দেশ্যে সে অগ্রসর হলো। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে আচমকা পেছন ফিরে আসলো।

নিজের হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল। তার চোখে- মুখে ভেসে উঠল ভীতির ছাপ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার? ফিরে এলে কেন?' 'লেলিহান শিখা, বিভীষিকা, ডানা...!' কথা বলার সময় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মূর্খটা। চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল তার। পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺঘটনার বিবরণ শুনে বলেন, সে যদি আরেকটু অগ্রসর হতো, তাহলে ফেরেশতারা তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলত।

আবু লাহাবের পরিবার :-

পাথর হাতে নিয়ে নবীজিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল উম্মু জামিল। কারণ, কুরআনে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আয়াত নাজিল হয়েছে। এটা সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। সে জন্য কুরআন বাহক নবীকে আঘাত করতে সে ছিল বদ্ধপরিকর। পথিমধ্যে তার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু এর সাক্ষাৎ হলো। মহিলাটি তখন গলা খেকিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমার বন্ধুকে পাই, তাহলে ওর মাথা থেতলে দিব।

রাসূল ﷺওই কুটনী মহিলার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু উম্মু জামিল তাকে দেখতে পায়নি। নবীজিকে না পেয়ে সে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে রাগ ঝাড়তে শুরু করল। রাসুলুল্লাহ ﷺকে 'মুযাম্মাম' বলে গালিগালাজ করল। বকবক করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। বুড়িটা চলে যাওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?

নবি কারীম ﷺজবাব দিলেন, আমার দাদীরা আল্লাহ তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।

এটি ছিল আল্লাহর দেওয়া একটি মুজিযা। আল্লাহ তার নবিকে এই বদ মহিলার কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ এই ঘটনা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। নবীজিকে অকথ্য বাসায় গালি গালাগাল! তার নাম বিকৃত করো অভিশাপ বর্ষণ! রাসূল ﷺতাকে শান্ত করে বললেন, আবু বকর! ওরা আমার নাম কে মুজাম্মাম বলে গালাগাল করে। মুজাম্মাম নাম ধরে অভিশাপ দেয়। অথচ আমার নাম তো মুজাম্মাম নয়, আমি মুহাম্মদ(প্রশংসিত)।

আবু লাহাব নবিজিকে গালমন্দ করত। নবিজির শানে বেয়াদবিমূলক কথা বলত।

এই গোস্তাখের পরিণতি কি হয়েছিলো,জানেন?

বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আবু লাহাবের গুটি বসন্ত হয়। তখনকার দিনে এর কোনো ভালো চিকিৎসা ছিল না। ফলে তার সারা শরীরে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন তাকে ফেলে চলে যায় সংক্রমণের ভয়ে। ক্রমান্বয়ে তার রোগ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে পচন ধরে যায় তার সারা শরীরে। একাকী অসহায় অবস্থায় ধুঁকেধুকে তার মৃত্যু হয়। মহামারের ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে লোকেরা তাকে দাফন করতে আসেনি। তিনদিন পর্যন্ত তার লাশ এভাবে পড়ে থাকে। শেষমেষ দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্যে লাশ টেনেহিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের বাইরে। আবু লাহাবের দুই ছেলে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লাশটিকে মাটিচাপা দেয়।

নবীজির কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকতো না বলে তাকে নির্বংশ বলে উপহাস করত আবু লাহাব। তার বিশটি সন্তান ছিল। অথচ আজ তার নাম নিশানা বিলীন হয়ে গেছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী নির্বংশ "

আল্লাহতালা জানিয়ে দিয়েছেন, -হে মুহাম্মদ! যে তোমাকে ঘৃণা করবে, সে-ই বিলীন হয়ে যাবে কালের গর্ভে। তার নাম-নিশানা মুছে যাবে দুনিয়া থেকে।

মুসলিমদের উপর বর্বরতা

আবু বকরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ :-

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ প্রিয় নবীﷺকে প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ করার জন্য পীড়া পিরি শুরু করলেন। অবশেষে সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে বের হলেন আল্লাহর নবী ﷺ। তারা চলে গেলেন কাবার চত্বরে। আবু বকর রাঃ সম্মুখে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সাহাবীদের মধ্যে আবু বকরী ছিলেন প্রথম বক্তা, যিনি প্রকাশ্যে লোকজনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই দৃশ্য মুশরিকদের কাছে সহ্য হলো না। বেধড়ক প্রহার শুরু করলো সাহাবীদেরকে। বলছিল আবু বকরের উপর। পায়ের নিচে ফেলে একরকম পিষতে লাগলো। শক্ত জুতা দিয়ে তার চেহারা থেতলে ফেলল উতবা ইবনু রাবিয়া। সংবাদ পেয়ে বনুতাইমের লোকেরা সেখানে হাজির হলো। মুশরিকদের হাত থেকে উদ্ধার করল আবু বকরকে। তার অবস্থা এতটাই না যে ছিল যে সবাই ভেবেছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ মারা যাবেন।

দিনের শেষ ভাগে হুশ ফিরে আসে তার। জ্ঞান ফেরার পর সর্বপ্রথম যে কথাটি তার জবান দিয়ে বের হয়, সেটা হল -"রাসূলুল্লাহ ﷺকেমন আছেন?"
এ কথা শুনে তার গোত্রের লোকেরা ভীষণ চটে যায়। এত পাগলামোর কি আছে! যার জন্য আধ মরা হয়ে বাড়ি ফিরতে হলো, তার প্রতি এত মহাব্বত কিসের! রাগে ক্ষোভে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।
এরই নাম ঈমানী ভালোবাসা। নবি ﷺবলেছেন, সেই সাত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পরিবার পরিজন,ধন সম্পদ ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবো।

বিলালে হাবশী:-

আহাদ! আহাদ! — এই শব্দ দুটি ছিল একজন লোকের মুখে উচ্চারিত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধের ধ্বনি। তিনি ছিলেন বিলাল হাবশী (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর প্রভুরা তাঁকে নির্যাতন করত, কিন্তু তিনি মুখ থেকে "আহাদ, আহাদ" (এক আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করতেন না।

রোদের প্রখর তাপে তাঁকে বালির উপর ফেলে রেখে বুকের ওপর বড় পাথর চাপা দেওয়া হতো, কিন্তু তবুও তিনি বলতেন "আহাদ, আহাদ"। লোকেরা তাঁকে বলত — 'তুমি যদি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে লাত ও উয্যার পূজা করো, তাহলে মুক্তি পাবে'। কিন্তু বিলাল (রাঃ) বলতেন, 'না, আমি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পূজা করব না।'

তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত, রক্তাক্ত হতো, কিন্তু মুখে সেই একই শব্দ — "আহাদ, আহাদ" — চলতেই থাকত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুক্ত করেন।

প্রথমদিকের সাহাবিদের মধ্যে বিলাল (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। ইসলাম প্রচারের ঘোষণাও তিনি দিয়েছিলেন — অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রথম মুয়াজ্জিন। তাঁর কণ্ঠে আজান শুনে মদিনার আকাশ কেঁপে উঠত। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুক্ত করা দাস।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বিলাল ইবনু রাবাহ (রাঃ)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সাহসী ও আল্লাহভীরু একজন সাহাবি।

খাব্বাবের কঠোর পরীক্ষা :-

খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দিকের মুসলমানদের একজন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন মুসলমানদের উপর ভয়ানক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। খাব্বাব (রা.) পেশায় ছিলেন লোহার কারিগর। মক্কার অনেক ধনী মানুষ তার কাছে অস্ত্র ও অলংকার তৈরি করাত।

যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার মালিক (একজন মহিলা) ও মক্কার নেতারা খুব রাগান্বিত হয়। তারা তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে নানা ভাবে কষ্ট দিতে থাকে। কখনো তাকে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দেওয়া হতো, কখনো লোহা গরম করে তার পিঠে চেপে ধরা হতো। এত কষ্টেও খাব্বাব (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করেননি।

একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর কষ্টের কথা জানালেন এবং বললেন,

“হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না?”

তখন নবী করিম (সা.) ধৈর্যের উপদেশ দিলেন এবং বললেন,

“আগের উম্মতদেরও এমন কষ্ট দেওয়া হতো, তবুও তারা ঈমান থেকে ফিরত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ এই দীনকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে, একদিন একজন নারী একা মক্কা থেকে ইয়ামান পর্যন্ত যাবে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করে।”

খাব্বাব (রা.) ধৈর্য ধরলেন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখলেন। অবশেষে ইসলাম বিজয় লাভ করল, আর তিনি পেলেন সম্মান ও শান্তি।

খাব্বাব (রা.)-এর জীবনী আমাদের শেখায়—

কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও ঈমান অটল রাখতে হয়।

সত্যের পথে ধৈর্যই হলো সবচেয়ে বড় শক্তি।

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের কখনো হতাশ করেন না।

আবু বকরের গুলাম ক্রয় :

- ইসলামের প্রথম দিকে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র, গরিব ও সমাজের নিপীড়িত মানুষ। মক্কার ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন

চালাত। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিলাল (রা.), যিনি ছিলেন একজন হাবশি (ইথিওপিয়ান) দাস।

বিলাল (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মালিক উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার করতেন। উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর উপর ফেলে তাঁর বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে রাখতেন এবং বলতেন —

“বিলাল! তুমি মুহাম্মদকে (সা.) অস্বীকার করো, ‘লাত ও উজ্জা’কে স্বীকার করো।”

কিন্তু বিলাল (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বলতেন —

“আহাদ, আহাদ” (অর্থাৎ, এক আল্লাহ, এক আল্লাহ)।

এই নির্যাতনের খবর যখন আবু বকর (রা.) জানতে পারেন, তখন তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উমাইয়ার কাছে যান এবং বিলালকে মুক্ত করার অনুরোধ করেন। উমাইয়া প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে একটি বড় অঙ্কের দামে বিলালকে বিক্রি করতে রাজি হন।

আবু বকর (রা.) নিজের অর্থ ব্যয় করে বিলাল (রা.)-কে ক্রয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুক্ত করে দেন। তিনি বলেন —

"হে বিলাল! তুমি এখন আল্লাহর পথে মুক্ত।”

এভাবেই আবু বকর (রা.) শুধু বিলালকেই নয়, আরও অনেক নির্যাতিত মুসলমান দাস ও দাসীকেও অর্থ খরচ করে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর এই মানবিক কাজের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। কুরআনে সূরা লাইল (৯২:১৭–২১)-এ ইঙ্গিত করা হয়েছে—

“যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে, তাকেই দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে। তার দান কোনো প্রতিদানের জন্য নয়, বরং সে তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে।”

আবু বকর (রা.)-এর এই কাজ ছিল মানবমুক্তির এক দৃষ্টান্ত।

তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, মানবতার বার্তা।তাঁর উদারতা ও ত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

:- মক্কার মুশরিকরা যখন মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে, তখন নবী করিম ﷺ সাহাবাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। তিনি তাঁদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এমন একটি স্থানের সন্ধান করতে বলেন, যেখানে তাঁরা নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

তখন তিনি বলেন—

"তোমরা আবিসিনিয়ায় চলে যাও। সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন, তাঁর দেশে কেউ কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করে না।"

আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) ছিল তখনকার সময়ের একটি স্বাধীন খ্রিষ্টান দেশ, যার রাজা ছিলেন নাজাশী আশহামা। নবী করিম ﷺ জানতেন, তিনি ন্যায়বিচারক ও সত্যপ্রিয় শাসক।

হিজরতের প্রথম দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন— হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর স্ত্রী নবীর কন্যা রুকাইয়া (রা.) আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) আবু হুযাইফা (রা.) জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)। এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে নিরাপদে বসবাস শুরু করেন।

মক্কার কুরাইশরা এতে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে নাজাশীর দরবারে দূত পাঠায়— আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন রাবিয়াকে। তারা নাজাশীকে মুসলমানদের ফেরত দিতে অনুরোধ করে, কিন্তু নাজাশী বলেন—

"আমি না শুনে কাউকে ফেরত দেব না।"

এরপর সাহাবিদের ডাকা হয়। তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে জাফর ইবন আবি তালিব (রা.) মহান প্রজ্ঞা ও সাহসের সঙ্গে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন—

"আমরা অন্ধকারে ডুবে ছিলাম— মূর্তি পূজা করতাম, অন্যায় করতাম, আত্মীয়তা ছিন্ন করতাম। আল্লাহ আমাদের মধ্যে এক নবী পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের সত্যের পথে ডেকেছেন, সৎকর্ম ও দয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।"

নাজাশী এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি জাফর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের নবীর ওপর নাজিল হওয়া ওহির কিছু পড়ে শোনাও।"

জাফর (রা.) সূরা মরিয়মের অংশ পাঠ করেন, যেখানে মরিয়ম (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর বর্ণনা আছে।

নাজাশীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। তিনি বলেন—

“এই বাণী ও আমাদের ঈসা (আ.)-এর বাণী একই উৎস থেকে এসেছে।”
তিনি মুসলমানদের রক্ষা করেন এবং বলেন—
“তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।”

দারুল আরকাম :-

দারুল আরকাম ছিল মক্কার একটি ছোট ঘর, যা হাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা’র চাচাতো ভাই আরকাম ইবনে আবী আরকামের বাড়িতে অবস্থিত। যখন ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে নবী মুহাম্মদ ﷺ মক্কায় গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন, তখন তিনি এই ঘরে বসে দীক্ষা দিতেন এবং নতুন মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা দিতেন।
দারুল আরকামের বৈশিষ্ট্য:
এটি ছিল একটি গোপন অবস্থান, তাই নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ নিরাপদে ইসলামের বার্তা প্রচার করতে পারতেন।
এখানে মুসলমানরা মিলিত হতেন, কুরআনের পাঠ করতেন এবং ইসলামের মূল শিক্ষা শিখতেন।
দারুল আরকাম ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।
নবী ﷺ এবং সাহাবারা এখান থেকে মক্কার বিভিন্ন মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।
দারুল আরকাম ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছিল। এটি মুসলিমদের মধ্যে সংহতি ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই ঘরেই নবী ﷺ ইসলামের গোপন প্রচারণা শুরু করেছিলেন এবং নতুন মুসলমানদের শেখানো হতো কোরআন ও ইসলামের মূলনীতি।

ইসলামের ছায়াতলে হামযা :-

হযরত হামযা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আবু জাহেলের অপমান করার ঘটনা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ হিজরি সনে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবু জাহেল তাকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় গালি দেয় ও তাঁর ধর্মকে উপহাস করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নীরবে তা সহ্য করেন। পরে হযরত হামযা (রা.) এই ঘটনা জানতে পেরে ক্ষোভের সাথে একটি তরবারি দিয়ে আবু জাহেলের মাথায় আঘাত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণ

আবু জাহেলের অপমান: আবু জাহেল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অপদস্থ করলে এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করলে হামযা (রা.) ক্ষুব্ধ হন।

ইসলামের প্রতি সমর্থন: এই ঘটনায় হামযা (রা.) বুঝতে পারেন যে তাঁর ভাতিজার প্রতি এমন আচরণ সহ্য করা যায় না এবং তিনি ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

হামযা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা এবং একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।

নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে এই ঘটনাটি ঘটে।

হামজা কে কবুল করে নিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তার হিদায়াতের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল সাত আসমানের উপরে।আর যে ফয়সালা আসমানে হয় জমিনে কি সাধ্যি আছে তা ফিরিয়ে রাখার! হামজা রাদিয়াল্লাহু বললেন, হে আল্লাহ! আমার পদক্ষেপ যদি সঠিক হয়, তবে আমার অন্তরকে দৃঢ় করে দিন। আর যদি তা না হয় তাহলে আমাকে উপায় বাতলে দিন।

অবশেষে শয়তানের ওয়াসওয়াসা আক্রমণ করার জাল থেকে ছাড়িয়ে নির্দ্বিধায় সাক্ষ্য দিয়েছেন। এবং বলেছেন, আল্লাহর কসম! সমগ্র দুনিয়া আমার কাছে এনে দিলেও আমি এই দ্বীন ছাড়বো না।

উমরের পালাবদল :-

উমর ইবনে খাত্তাব রা. ছিলেন কুরাইশের শক্তিশালী, সাহসী এবং প্রভাবশালী যুবক। তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইসলাম গ্রহণ করার আগে, তিনি মুহাজিরদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করতেন এবং মক্কায় ইসলাম প্রচারকারীদের হুমকি দিতেন।

একদিন তিনি খবর পেয়েছিলেন যে তার ভ্রাতা ছিলেন ইসলামে আকৃষ্ট। ভ্রাতার ওপর রাগে উমর রা. রীতিমতো কঠোর ছিলেন। তিনি ঈমানদারদের খুঁজতে বের হন এবং তাদের মধ্যে একজনকে খুঁজে পেয়ে হুমকি দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু পথে যাওয়ার সময় উমর রা. মনে করলেন যে তিনি কীভাবে এত বড় মিথ্যা, অন্যায় এবং অবিচারের পথ দিয়ে চলছেন। তিনি ভাবলেন, সত্যিকারের শক্তি ও সাহসই হলো সত্যকে মেনে নেওয়া এবং ন্যায়ের পথে চলা।

উমর রা. তখন তাঁর বোনের কাছে গিয়ে কোরআনের কিছু আয়াত শুনলেন, যা তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষত আল্লাহর একত্ব ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি নৈতিক শিক্ষা ও প্রেরণা তাঁকে আস্থা ও শক্তি দেয়। শেষ পর্যন্ত, উমর রা. ইসলামে প্রবেশ করেন। তিনি কুরাইশের মধ্যে ইসলামের প্রতি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াকে নিবারণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ কেবল ব্যক্তিগত ঈমানের প্রতীক নয়, বরং মুসলমানদের সাহস ও একতার প্রতীকও ছিল। উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কায় মুসলমানদের অবস্থা অনেক শক্তিশালী হয়।
নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের দু'জন খ্যাতিমান পুরুষ ইসলাম কবুল করেন। একজন আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে হামজা, অন্যজন খাত্তাবের বেটা উমর রাদিয়াল্লাহ। উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসয়াদ বলেছেন, উমর ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি বিজয়। এর আগে আমরা কাবার চত্বরে নামাজ আদায় করতে সাহস পেতাম না। উমর রাদিয়াল্লাহ ইসলামের দাখিল হয়ে কুরাইশদের চ্যালেঞ্জে জানিয়ে কাবার চত্বরে নামাজে আদায় করেন। আমরাও তার সাথে নামাজ আদায় করি।

আবু তালিব :

- নবুয়তের সপ্তম বছরে কুরাইশরা যখন দেখল যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে, তখন তারা ইসলাম রোধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিল। তারা নবী ﷺ, তাঁর পরিবার ও বনি হাশিম গোত্রের সকলকে সমাজচ্যুত করার পরিকল্পনা করে। ফলে তারা এক অমানবিক বর্জননীতি (বয়কট) চালু করল।
এই বয়কটের মূল উদ্দেশ্য ছিল—
মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া, যাতে তারা বাধ্য হয়ে নবীর দাওয়াত পরিত্যাগ করে দেন।

কুরাইশরা একটি লিখিত চুক্তি তৈরি করল, যেখানে বলা হয়— কেউ বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবের সঙ্গে বিবাহ করবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলবে না, এমনকি তাদের কোনো সাহায্যও করবে না, যতক্ষণ না তারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের হাতে তুলে দেয়।

এই চুক্তিটি তারা লিখে কাবাঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে রাখে। চুক্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল আবু জাহলের হাতে।

এই নির্মম বর্জনের ফলে আবু তালিব (যিনি তখন নবী ﷺ-এর প্রধান অভিভাবক) তাঁর গোত্রের সবাইকে নিয়ে মক্কার বাইরে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় নিলেন।

এই উপত্যকাটিই "শিয়াবে আবু তালিব" নামে পরিচিত।

নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবারের সদস্য, এবং ইসলামের প্রতি অনুগত সকল মানুষ সেখানে তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

তিন বছর ধরে তারা ভয়ানক দারিদ্র্য ও অনাহারে ভুগেছেন।

খাবার-পানি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শিশুরা ক্ষুধায় কাঁদত, আর বড়রা শুকনো পাতা কিংবা চামড়া সেদ্ধ করে খেত।

রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ গোপনে কিছু খাদ্য পৌঁছে দিতেন, কিন্তু তা খুবই সামান্য ছিল।

নবী ﷺ ও সাহাবিদের ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভরসা এই কঠিন সময়েও নড়েনি।

আবু তালিব বয়সে বৃদ্ধ হয়েও তাঁর ভাতিজা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে রক্ষা করতে সদা সতর্ক ছিলেন।

রাতে বারবার নবী ﷺ-কে শোয়ার জায়গা বদলাতে বলতেন, যাতে কেউ তাঁকে আঘাত করতে না পারে।

তিন বছর পর আল্লাহর রহমতে এই নিষ্ঠুর অবরোধের অবসান ঘটে।

কুরাইশদের কিছু মানবিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন হিশাম ইবনে আমর, মুতইম ইবনে আদী, জামইল ইবনে আসদ, এবং জুহাইর ইবনে উমাইয়া—তারা একত্র হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন।

তারা ঘোষণা করেন—"এ চুক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক; আমরা এটি ছিঁড়ে ফেলব।"

যখন তারা কাবা থেকে ঐ দলিলটি নামায়, দেখা গেল—পোকা (উইপোকা) কাগজটির সব লেখা খেয়ে ফেলেছে, শুধু "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" (আল্লাহর নামে শুরু) কথাটি ছাড়া। এটি দেখে কুরাইশরাও বিস্মিত হয় এবং অবশেষে বয়কট তুলে নেয়।

দুঃখের বছর :-

নবুয়তের দশম বছর ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ- এর জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় সময়। ইতিহাসে এ বছরটিকে বলা হয় "দুঃখের বছর" বা "আমুল হুযন"। কারণ এই বছরেই তিনি জীবনের দুইটি সবচেয়ে প্রিয় ও সহায় ব্যক্তিকে হারান—

একজন ছিলেন চাচা আবু তালিব, আর অন্যজন স্ত্রী খাদিজা (রা.)।

এই দুইজন ছিলেন তাঁর জীবনের দুই স্তম্ভ—একজন ছিলেন বাহ্যিক রক্ষাকবচ, অন্যজন ছিলেন অন্তরের সান্ত্বনা।

আবু তালিব ছিলেন নবী করিম ﷺ এর শৈশবের অভিভাবক। শৈশব থেকেই তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে নিজের সন্তানদের মতো ভালোবাসতেন। কুরাইশরা যখন নবীকে কষ্ট দিতে শুরু করে, তখন আবু তালিব তাঁর সমস্ত প্রভাব ও মর্যাদা দিয়ে নবীকে রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু নবুয়তের দশম বছরে, তিন বছর শিয়াবে আবু তালিবের কঠোর অবরোধের পর, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুশয্যায় যখন তিনি ছিলেন, নবী করিম ﷺ তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করেন—

"হে চাচা, আপনি শুধু একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেলুন, আমি কিয়ামতের দিনে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পাশে বসা কুরাইশ নেতা আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া তাঁকে বারবার বলতে লাগল,

"তুমি কি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করবে?"

শেষ পর্যন্ত আবু তালিব পূর্বপুরুষদের ধর্মেই মৃত্যু বরণ করেন। নবী করিম ﷺ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর প্রিয় চাচা ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ না করেই দুনিয়া ত্যাগ করলেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন আয়াত—"নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালোবাসো, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই সৎপথে পরিচালিত করেন।"

(সূরা আল-কাসাস ৫৬)

এভাবে নবী ﷺ হারালেন তাঁর দুনিয়াবি রক্ষাকবচকে।

আবু তালিবের মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পরই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

তিনি ছিলেন প্রথম নারী যিনি নবীর ওপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর কষ্টে সঙ্গী ছিলেন, ধন-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন ইসলামের জন্য, এবং তাঁর হৃদয়ে শান্তি ও শক্তি জুগিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যু নবী ﷺ-কে ভীষণভাবে ভেঙে দেয়। এই সময়ে নবীর ঘর হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ, নিরব। নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলতেন। এমনকি পরে অনেক বছর পরও, খাদিজা (রা.)-এর বন্ধুবান্ধব দেখলে নবী ﷺ তাদের সম্মান করতেন ও বলতেন—"তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যখন সবাই অস্বীকার করেছিল।"

তায়িফবাসীর নৃশংসতা :

- তায়িফে নবিজির মামার বাড়ি। ওখানেই তিনি পার করেছেন শৈশবের দিনগুলি। হয়তো সেখানকার লোকেরা তার কথা মেনে নেবে। হয়তো ঈমান কবুল করবে। আশ্রয় দেবে ইসলামের বার্তাবাহককে। নবি ﷺসেখানে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সফরসঙ্গী হিসেবে ঠিক করলেন প্রাক্তন দাস যাইদ ইবনু হারিসা রাঃ কে।

তায়িফ ছিল মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৬০ মাইল দূরের একটি সুন্দর শহর। এখানে সাকিফ গোত্র বসবাস করত। তারা সম্পদ, ক্ষমতা ও অহংকারে পরিপূর্ণ ছিল। নবী করিম ﷺ আশাবাদী ছিলেন—যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইসলাম এখানে শক্তিশালী ভিত্তি লাভ করবে।

তায়িফে পৌঁছে নবী ﷺ সাকিফের তিন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—

১. আবদে ইয়ালিল

২. মাসউদ

৩. হাবীব

তিনি তাঁদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করেন, বলেন—"হে তায়িফবাসী! আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এতে তোমাদের ও

তোমাদের জাতির মঙ্গল নিহিত।"

কিন্তু তায়িফবাসী নবী ﷺ–এর আহ্বানে কর্ণপাত না করে উল্টো তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতে লাগল। নেতারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলল—

"তুমি ছাড়া আল্লাহ আর কাউকে পাননি যে তাঁকে রসুল বানাবেন?"

“যদি তুমি সত্যিই নবী হও, তবে তোমাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, আর যদি মিথ্যা বলে থাকো—তবে তোমার সাথে কথা বলারও কোনো মানে নেই!”

এইভাবে তাঁরা অত্যন্ত কঠোর ও অশ্রদ্ধার সঙ্গে নবী ﷺ-কে তাড়িয়ে দিল।

যখন নবী ﷺ হতাশ মনে শহর ত্যাগ করতে লাগলেন, তখন সাকিফ নেতারা শহরের দাস ও বালকদের একত্র করল। তারা নবী ﷺ-এর পিছু নিল। দুই পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পাথর ছুড়তে লাগল।

রক্তে নবীর পা ভিজে গেল, তাঁর জুতাও রক্তে ভরে গেল। সঙ্গী যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেও রক্তাক্ত হলেন।

অবশেষে নবী করিম ﷺ একটি বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন—এটি ছিল উতবা ও শায়বা নামের দুই মক্কাবাসীর আঙুরের বাগান। সেখানে বসে তিনি চুপচাপ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন—

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং মানুষের কাছে অবমূল্যায়নের অভিযোগ করছি। হে দয়াময়, তুমি দুর্বলের রক্ষাকারী, তুমি আমার রব। তুমি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করবে—শত্রুর কাছে, যে আমার উপর আক্রমণ করবে, নাকি দূরের কাউকে, যে আমার প্রতি উদাসীন? যদি তুমি আমার প্রতি রুষ্ট না হও, তবে আমি কোনো কিছুকেই পরোয়া করি না...”

এই দোয়ার ভাষায় ফুটে ওঠে নবী করিম ﷺ-এর গভীর ধৈর্য, বিনয় ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা।

উতবা ও শায়বা নবী ﷺ-এর কষ্ট দেখে দাস আদাস-কে কিছু আঙুর দিয়ে পাঠালেন। নবী ﷺ আঙুর খাওয়ার আগে “বিসমিল্লাহ” বললেন। আদাস বিস্মিত হয়ে বলল, “এই শব্দ তো এখানকার কেউ বলে না!”

নবী ﷺ বললেন, “তুমি কোথাকার লোক?”

সে বলল, “আমি নিনওয়ার লোক, ইউনুস (আঃ)-এর জাতির।”

নবী ﷺ বললেন, “তিনি আমার ভাই ছিলেন, আমি তাঁর মতোই আল্লাহর প্রেরিত।”

এই কথা শুনে আদাস নবী ﷺ-এর হাত ও পা চুম্বন করল এবং ঈমান আনল।

তায়িফে ব্যর্থ হয়ে নবী ﷺ মক্কার দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু মক্কায় প্রবেশও ছিল কঠিন—কারণ কুরাইশরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। অবশেষে মুতইম ইবনে আদী তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

নবী ﷺ-এর জীবনের তায়িফ অধ্যায় মানবধৈর্য ও ঈমানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

অপমান, রক্তাক্ত যন্ত্রণা, বিদ্রূপ—কিছুই তাঁকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরাতে পারেনি। তায়িফবাসীর নৃশংসতা ইতিহাসে ঘৃণার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, আর নবী করিম ﷺ–এর দোয়া ও ক্ষমাশীলতা চিরকাল করুণার প্রতীক হয়ে থাকবে।

জিনদের সাথে দেখা

:- তাইফ থেকে ফিরে আসার পর নবী করিম ﷺ অত্যন্ত কষ্ট ও একাকীত্বে ছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে একটি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সম্মানিত করলেন—জিনদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে।

এক রাতে নবী করিম ﷺ নাখলা নামক এক স্থানে (মক্কা ও তা'ইফের মাঝামাঝি) অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি ফজরের নামাজে বা তাহাজ্জুদের সময় কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

সেই সময়ের ঘটনা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন:"বল, আমার প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, কিছু জিন কুরআন শুনে বলল—

আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি,

যা সঠিক পথে পরিচালিত করে,

তাই আমরা এতে ঈমান এনেছি।"

(সূরা আল-জিন, আয়াত ১–২)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, কিছু জিন নবী করিম ﷺ–এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো।

তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল—"হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে,

যা সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং সঠিক পথে পরিচালিত করে।"(সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত ২৯–৩০)

অর্থাৎ, তারা মুহাম্মদ ﷺ–এর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে ইসলামে দাখিল হয়।

জিনদের দল নবীজীর কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। নবী করিম ﷺ তাঁদের কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শিক্ষা দেন, এবং দাওয়াত গ্রহণের পর তারা মুসলিম জিনে পরিণত হয়।

এক হাদীসে আসে যে, নবী করিম ﷺ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের জন্য কুরআন পাঠ করেন, এবং পরে সাহাবিদের বলেন—"আমি জিনদের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাদের শিক্ষা দিয়েছি।"

এই ঘটনার মাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পায়—

ইসলামের দাওয়াত শুধু মানুষের জন্য নয়, বরং জিন জাতির জন্যও প্রেরিত।

কুরআনের অলৌকিক শক্তি এমন যে, অদৃশ্য জগতের প্রাণীরাও এতে প্রভাবিত হয়।

মিরাজে গমন :-

তায়েফে নবী করিম ﷺ–এর প্রতি মানুষের নৃশংস আচরণের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। এই সান্ত্বনার অংশ হিসেবেই ঘটে গেল ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা — ইসরা ও মিরাজ। এটি ছিল দুঃখের বছর ('আমুল হুযন)–এর পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজীর মনোবল দৃঢ় করার এক মহান উপহার।

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা

এক রাতে, নবী করিম ﷺ মক্কার মসজিদুল হারামে (কাবাঘরে) ছিলেন। হঠাৎ হযরত জিবরাইল (আ.) আগমন করলেন। তিনি নবীজীকে জাগিয়ে তুললেন এবং তাঁর বুকে বিশেষ আলো দ্বারা পরিশুদ্ধি করলেন।

এরপর জিবরাইল (আ.) নবীজীকে এক আশ্চর্য যানবাহন, বুরাকের উপর আরোহন করালেন। বুরাক ছিল ঘোড়ার চেয়ে ছোট ও গাধার চেয়ে বড়, যার এক পা যতদূর চোখ যায় ততদূর পৌঁছে যেত।

নবী ﷺ বুরাকে চড়ে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস (জেরুসালেমের মসজিদুল আকসা) পর্যন্ত গেলেন — এটিই ইসরা (রাত্রিকালীন সফর)।

মসজিদে আকসায় নবীদের ইমামতি

বায়তুল মাকদিসে পৌঁছে নবী ﷺ দেখলেন বহু নবী সেখানে উপস্থিত। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুসা (আ.), ঈসা (আ.)—সব নবীগণ একত্রিত। সেখানে নবী করিম ﷺ ইমাম হিসেবে সবার নামাজ পরিচালনা করলেন।

এটি ছিল নবুওয়াতের পূর্ণতার প্রতীক — অর্থাৎ সব নবীর নেতা হলেন মুহাম্মদ ﷺ।

আসমানে আরোহন

এরপর শুরু হলো মিরাজ — আসমানে আরোহনের অলৌকিক সফর। জিবরাইল (আ.) নবীজীকে সঙ্গে নিয়ে একে একে সাত আসমান পেরিয়ে গেলেন।

প্রথম আসমান

প্রথম আসমানে দেখা পেলেন আদম (আ.)–এর। তিনি নবী ﷺ–কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "স্বাগতম, সৎ পুত্র, সৎ নবী।"

দ্বিতীয় আসমান

সেখানে দেখা হলো ইয়াহইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.)–এর সঙ্গে। তাঁরা নবীজীকে দোয়া ও শুভেচ্ছা জানালেন।

তৃতীয় আসমান

এখানে নবী ﷺ দেখলেন ইউসুফ (আ.)–কে, যার রূপ ছিল অসামান্য সুন্দর।

চতুর্থ আসমান

এখানে ছিলেন ইদরিস (আ.)। তিনি বললেন, "আপনার আগমন মঙ্গল বয়ে আনুক।"

পঞ্চম আসমান

সেখানে ছিলেন হারুন (আ.) — হযরত মুসা (আ.)–এর ভাই। তিনি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

ষষ্ঠ আসমান

এখানে নবী ﷺ সাক্ষাৎ পেলেন মুসা (আ.)–এর। মুসা (আ.) কাঁদলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কেন, তিনি বললেন—

"এই নবীর অনুসারীর সংখ্যা আমার অনুসারীর চেয়ে বেশি হবে!"

সপ্তম আসমান

শেষে দেখা হলো ইব্রাহিম (আ.)–এর সাথে, যিনি বায়তুল মা'মূর–এর (ফেরেশতাদের কাবা) পাশে হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি নবী ﷺ–কে শুভেচ্ছা জানালেন এবং উম্মতের কল্যাণের দোয়া করলেন।

এরপর নবী ﷺ পৌঁছালেন সিদরাতুল মুনতাহা–য় — যেখানে পৌঁছার পর কোনো ফেরেশতাও যেতে পারে না। সেখান থেকে নবীজী আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করেন।

এই স্থানে নবী ﷺ–এর জন্য আল্লাহ তাআলা উম্মতের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।

মূলত প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু নবী ﷺ–এর অনুরোধে (মুসা আঃ–এর পরামর্শে) বারবার ফিরে গিয়ে তা পাঁচ ওয়াক্তে সীমিত করা হয়, আর এর প্রতিদান ৫০ ওয়াক্তের সমান রাখা হয়।

এই সফরে নবী ﷺ জান্নাতের সৌন্দর্য, বরকত ও নিয়ামত দেখেছেন; আবার জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করেছেন — যাতে উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন।

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ও মক্কার প্রতিক্রিয়া

এরপর নবী ﷺ বায়তুল মাকদিসে ফিরে এসে আবার বুরাকে চড়ে মক্কায় ফিরে আসেন। এই পুরো সফর সম্পন্ন হয় এক রাতের মধ্যেই।

পরদিন যখন নবী ﷺ এই অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে উপহাস করে। কিন্তু আবু বকর (রা.) বলেন —"যদি মুহাম্মদ (সা.) বলেন, তবে অবশ্যই সত্য।"

এ কারণেই তিনি উপাধি পান — "আস-সিদ্দিক" (সত্যনিষ্ঠ)।

মিরাজ শুধু এক অলৌকিক ভ্রমণ নয়, বরং এটি নবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদা, ঈমানের শক্তি ও নামাজের ফরজ হওয়ার নিদর্শন।

এটি ছিল নবী করিম ﷺ–এর জীবনের এক মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন—

"দুঃখের পরেই আসে মর্যাদা ও প্রশান্তি।"

ঈমানের আলো ছড়িয়ে গেলো

গোত্রে গোত্রে দাওয়াত :-

নবী করিম ﷺ যখন তায়িফের কঠোর অভিজ্ঞতা শেষে মক্কায় ফিরে এলেন, তখন ইসলামের দাওয়াতের কাজ তিনি আরও ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা তাঁর দাওয়াতকে একেবারে বন্ধ করতে চাইলেও, তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকেননি।

মক্কার মানুষদের বেশিরভাগই নবী ﷺ-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই তিনি ভাবলেন, মক্কার বাইরের আরব গোত্রগুলোর কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য তিনি প্রতিবছর হাজের মৌসুমে মিনা, আরাফাত ও উকাজ মেলায় বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে তাদের নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

রাসূল ﷺ হজের মৌসুমে একা একা বা কখনো হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যেতেন। তিনি তাঁদের বলতেন:

"তোমরা কি এমন কথা শুনবে যা তোমাদেরকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে?"

তারপর তিনি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বলতেন—

"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি আল্লাহর রাসূল।"

তিনি মানুষকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, শিরক থেকে মুক্তি এবং ন্যায়বিচারের শিক্ষা দিতেন।

প্রায় সব গোত্রই প্রথমে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, কেউ পাগল মনে করেছে, আবার কেউ ঠাট্টা করেছে। কিন্তু নবী ﷺ ধৈর্য হারাননি।

উল্লেখযোগ্য কিছু গোত্র ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো:

বনু আমির ইবনু সা'সা'আ – তাঁরা নবীর দাওয়াত শুনে বলল, "যদি আমরা তোমাকে সাহায্য করি এবং তুমি সফল হও, তাহলে নেতৃত্ব কি আমাদের হবে?"

নবী ﷺ বললেন, "নেতৃত্ব আল্লাহ যার চান,তাকেই দেন।"

তারা বলল, "তাহলে আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করব না।"

বনু শাইবান ইবনু থালাবা – তাঁরা নবীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল। কিন্তু তাঁরা পারস্য সম্রাটের অধীনস্থ ছিল, তাই রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

বনু হানিফা – এ গোত্রের লোকেরা নবীর সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছিল। পরে এই গোত্র থেকেই মুসায়লামা কায্যাব (মিথ্যা নবী) বের হয়েছিল।

বনু কিলাব, বনু কালব, বনু হারিস ইত্যাদি অন্যান্য গোত্রকেও নবী ﷺ দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ গ্রহণ করেনি।

যতই মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করুক না কেন, নবী ﷺ কখনও ক্লান্ত হননি। তাঁর হৃদয়ে ছিল মানুষের প্রতি গভীর দয়া ও ভালোবাসা। তিনি চেয়েছিলেন, যেন সবাই তাওহীদের আলোয় আলোকিত হয়।

বাইয়াতে আকাবা :-

যনবুয়তের ত্রয়োদশ বছরের কাছাকাছি সময়ে মক্কার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। কুরাইশরা নবী করিম ﷺ ও মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

তাঁর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হতো, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেওয়া হতো, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করা হতো।

এই কঠিন সময়েই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে নতুন দিগন্তের দিকে পথ দেখান—ইয়াসরিব (বর্তমান মদীনা)।

ইয়াসরিবে তখন দুটি প্রধান আরব গোত্র ছিল:

আওস

খাজরাজ

এই দুই গোত্র দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর শত্রুতা ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল।

বিশেষ করে "যুদ্ধে বু'আস" তাদের মনকে ক্লান্ত করে তুলেছিল।

তারা একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা চাচ্ছিল, যিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন।

প্রতি বছর হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক মক্কায় আসতো।

নবী করিম ﷺ তখন সুযোগ নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন।

তিন বছর ধরে এভাবে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন—কখনো তাঁকে কেউ শোনেনি, কখনো অপমান করেছে।

কিন্তু এক বছর (নবুয়তের ১১তম বছর)

ইয়াসরিবের কিছু মানুষ (খাজরাজ গোত্রের ৬ জন) আকাবার কাছে নবী করিম ﷺ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনের বাণী শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

তাঁরা বলেন, "এ তো সেই নবী, যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ইহুদিরা দেয়!"

তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে দাওয়াত দিতে শুরু করে।

ঐ ছয়জনের দাওয়াতের ফলে ইয়াসরিবে দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় প্রতিটি ঘরে নবীর কথা পৌঁছে যায়।

পরের বছর হজের মৌসুমে আরও বেশি লোক নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করতে আসে।

এরপরই শুরু হয় প্রথম বাই'আতে আকাবা।

আয়িশার সাথে বিয়ে :-

এই বছরেই আয়িশার রাঃ-এর সাথে নবিজির বিয়ে হয়। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাস্র প্রিয়নবী ﷺতাকে ঘরে উঠিয়ে নেন।

প্রথম বাইয়াতে আকাবা :-

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তায়িফ অভিযানের পরও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রতি বছর হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ইসলাম প্রচার করতেন। মক্কার মানুষ তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেও, তিনি আশা ছাড়েননি।

এই সময় ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) শহরে দুইটি প্রধান গোত্র ছিল — আওস ও খাজরাজ। এদের মধ্যে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল। সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল বু'আস যুদ্ধ, যেখানে উভয় পক্ষ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মনে তখন শান্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল।

এক হজ মৌসুমে (খ্রিস্টাব্দ ৬২০ সালে, নবুয়তের ১১তম বছরে), খাজরাজ গোত্রের ছয়জন ব্যক্তি মক্কায় আসেন। তাঁরা কাবা তাওয়াফের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নবী ﷺ তাঁদের কাছে ইসলাম প্রচার করেন, কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং তাওহীদের দিকে আহ্বান জানান। নবীজির ব্যক্তিত্ব, বাণী ও কুরআনের অলৌকিকতা তাঁদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

এই ছয়জন ছিলেন—

আস'আদ ইবনু যুরারা (খাজরাজ)

আওফ ইবনু হারিস

রাফে ইবনু মালিক

কুতবা ইবনু আমের

উকবা ইবনু আমের

জাবের ইবনু আবদুল্লাহ

তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি করেন যে—তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবেন না,

চুরি, ব্যভিচার, সন্তানের হত্যা, মিথ্যা প্রচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে থাকবেন,

এবং নবী ﷺ-এর দাওয়াত রক্ষা করবেন নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী।

এই চুক্তিই ইতিহাসে পরিচিত "প্রথম বাই'আতে আকাবা" নামে।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা :-

প্রথম বাই'আতে আকাবার পর ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা) মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। তারা ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে থাকে। এর ফলে ইসলামের আলো ধীরে ধীরে মদিনার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী হজের মৌসুমে (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে) মদিনা থেকে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা মুসলমান হজের জন্য মক্কায় আসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং ইসলামের জন্য নতুন এক চুক্তি করা।

রাত্রির আঁধারে, মিনা উপত্যকার কাছে আকাবা নামক স্থানে তারা গোপনে নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করেন। নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস (তখনও মুসলমান হননি, তবে ভাতিজার নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন)। আব্বাস প্রথমেই উপস্থিত আনসারদের উদ্দেশে বলেন—

"মুহাম্মদ আমাদের বংশের এক সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা তাঁকে রক্ষা করে রেখেছি। যদি তোমরা তাঁকে নিয়ে যাও, তবে তোমাদের প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে ভালো করে ভেবে নাও।"

এরপর নবী করিম ﷺ তাঁদের সামনে ইসলামের দাওয়াত ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় বাই'আতে আকাবার এই অঙ্গীকার ছিল ইসলামী ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল ঈমানের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চুক্তিও ছিল। নবী করিম ﷺ তাঁদের কাছ থেকে যে শর্তগুলো নিয়েছিলেন তা হলো—

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য মানবে না।

চুরি করবে না।

ব্যভিচার করবে না।

সন্তানদের হত্যা করবে না।

পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করবে না।

সৎকাজে সহায়তা করবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে।

নবী করিম ﷺ-কে নিজের জীবন, সম্পদ, পরিবার দিয়ে রক্ষা করবে, যেমন নিজের আপনজনকে রক্ষা করে।

এ অঙ্গীকারের পর তাঁরা সবাই বললেন—

“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে রক্ষা করব আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মতো। আমরা এই চুক্তি ভঙ্গ করব না।”

বাই‘আতের পর নবী করিম ﷺ তাঁদের মাঝে একজন শিক্ষক ও দাওয়াতকারী প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন মুস‘আব ইবনে উমায়ের (রা.)। তিনি মদিনায় ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচার চালিয়ে যান, ফলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

সাহাবীদের মদিনায় হিজরত :

- নবী করিম (সা.)-এর দাওয়াত ক্রমে মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) এর কিছু মানুষ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার পর ইসলাম সেখানে ধীরে ধীরে দৃঢ় ভিত্তি পেতে শুরু করে। প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার বাই‘আতের পর ইয়াসরিবে একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হয় মুসলমানদের জন্য। তখন আল্লাহর হুকুমে নবী (সা.) সাহাবিদের মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেন।

নবী করিম (সা.) গোপনে সাহাবিদের বললেন,

“তোমরা ইয়াসরিবে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য সেখানে ভাই-বোন ও নিরাপদ আশ্রয় নির্ধারণ করেছেন।”

এই নির্দেশ পাওয়ার পর সাহাবিরা একে একে গোপনে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাদের হিজরতের লক্ষ্য ছিল—

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন,

২. দ্বীনের নিরাপদ প্রচার,

৩. মক্কার নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ।

কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাচ্ছিল। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার ঘর, সম্পদ, এমনকি পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন করা হতো। সেই নির্যাতনের কারণে সাহাবিরা মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।

সাহাবিরা দলেদলে, কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে মদিনার দিকে পাড়ি জমাতে থাকেন। কেউ উট, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ সামান্য রসদ নিয়ে এই দীর্ঘ যাত্রা করেন। পথে বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা একে অপরকে সাহায্য করেন।

মদিনার আনসাররা তাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন।

প্রথম দিকের হিজরতের সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন—

আবু সালামা (রা.), সুহাইব রুমি (রা.), আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.), বিলাল (রা.), উসমান ইবন আফফান (রা.) ও তার স্ত্রী রুকাইয়া (রা.) (নবী করিমের কন্যা),আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.),তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.),জুবাইর ইবন আওয়াম (রা.),ও আরও অনেকে।

মদিনার মুসলমানরা (আনসাররা) মুহাজিরদের ভাইরূপে গ্রহণ করেন। নবী করিম (সা.) পরে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার পর মুহাজির-আনসারদের মাঝে ভাইচারা (মুআখাত) গড়ে দেন।

তারা নিজেদের ঘর, সম্পদ, এমনকি জমিও ভাগ করে দেন।

ফলে মদিনা ইসলামের প্রথম স্বাধীন ও নিরাপদ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১. ইসলাম একটি নতুন ভিত্তি লাভ করল।

২. মক্কার নির্যাতন থেকে মুক্তি মিলল।

৩. মদিনায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সূচনা হলো।

৪. মুসলমানদের ঐক্য ও আত্মত্যাগের উদাহরণ স্থাপিত হলো।

মদিনার পথপানে

আবু বকরের প্রস্তুতি :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মুসলমানদের মদিনা হিজরতের অনুমতি দিলেন, তখন সাহাবিরা একে একে মক্কা ছেড়ে মদিনার দিকে যেতে লাগলেন। কিন্তু নবী করিম ﷺ নিজে তখনও মক্কায় অবস্থান করছিলেন, আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়। এই সময় তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) গভীর আগ্রহ নিয়ে নবীজির হিজরতের সঙ্গী হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আবু বকর (রাঃ) বহুদিন আগে থেকেই হিজরতের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

“ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকেও কি হিজরতের অনুমতি দেবেন?”

নবীজী ﷺ তখন বলেছিলেন,

“অপেক্ষা করো, সম্ভবত তোমার জন্য এমন সঙ্গী নির্ধারিত আছে।”

(অর্থাৎ, তিনি নিজেই আবু বকরের সঙ্গী হবেন।)

এই কথাটি শোনার পর থেকে আবু বকর (রাঃ) অতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতিদিন নবীজির দিকে তাকিয়ে থাকতেন — কখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে, আর তিনি নবীর সাথেই প্রিয় মদিনার পথে রওনা হবেন।

হিজরতের জন্য তিনি দুটি শক্তিশালী উট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। উভয় উটকেই নিয়মিত ভালোভাবে খাওয়াতেন ও যত্ন করতেন, যেন দীর্ঘ মরুভূমির পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। তিনি তাঁর সম্পদ থেকেও প্রস্তুতি রাখলেন—খাবার, পানি, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রাখলেন।

তিনি তাঁর কন্যা আয়েশা (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)-কে কিছু দায়িত্ব দিলেন, যেন গোপনে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে পারে এবং যাত্রার সময় সহায়তা করতে পারে।

আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে সেই সময় শুধু তাঁর পরিবারের লোকেরাই জানতেন এই পরিকল্পনা। বাইরে কাউকে কিছুই জানতে দেননি। কারণ মক্কার কুরাইশরা তখন নবীজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তিনি বিশ্বাস রাখতেন — আল্লাহই রক্ষা করবেন নবীকে এবং যে-ই তাঁর সঙ্গী হয়, তাকেও নিরাপদ রাখবেন। তাই তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন নিঃশব্দে, ধৈর্য ও আশায়।

হত্যার ফরমান জারি ও আল্লাহর সাহায্য

:- নবী করিম ﷺ মক্কায় আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন বহু বছর ধরে। তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এতে কুরাইশ নেতাদের অহংকারে আঘাত লাগে। তারা বুঝতে পারল, যদি মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াত সফল হয়, তবে তাদের প্রভাব, বংশগৌরব ও মূর্তি ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা প্রথমে নানা প্রলোভন দেখায়—ধন, রাজত্ব, সুন্দরী নারী—কিন্তু নবী ﷺ তাঁর দায়িত্ব থেকে এক চুলও নড়েননি। এরপর তারা নির্যাতন শুরু করে। মুসলমানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। কিন্তু ইসলামের আলো ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় কুরাইশ নেতারা সিদ্ধান্ত নেয়—এই দাওয়াত বন্ধ করতে হলে মুহাম্মদ ﷺ–কেই হত্যা করতে হবে।

দ্বিতীয় আকাবার পর ইসলাম মদিনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নবী ﷺ–এর মদিনায় হিজরতের খবরও তাদের কানে পৌঁছে যায়। কুরাইশরা ভয় পেল—যদি মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় পৌঁছে যান, তবে মুসলমানরা সেখানে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলবে এবং মক্কার জন্য বড় বিপদ তৈরি হবে।

তখন কুরাইশদের প্রধান নেতা আবু জাহল ডেকে পাঠালেন সব গোত্রের নেতাদের। তারা দারুননাদুয়া নামের মক্কার পরিষদ ভবনে বৈঠক বসায়। সেখানে নানা মতামত ওঠে—

কেউ বলল, নবীকে বন্দি করা হোক,

কেউ বলল, মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক,

আর কেউ বলল, সরাসরি হত্যা করা হোক।

শেষ পর্যন্ত আবু জাহল বলল — "প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবক নির্বাচিত করা হোক। তারা সবাই একসঙ্গে মুহাম্মদকে আক্রমণ করবে এবং এক আঘাতে হত্যা করবে। এতে করে দায় এক গোত্রের উপর না পড়ে, বরং সব গোত্রে ছড়িয়ে যাবে; ফলে বানু হাশিম প্রতিশোধ নিতে পারবে না।"

এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে সবাই একমত হয়।

নবী ﷺ–কে আল্লাহ তা'আলা এই ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে দিলেন। জিবরাইল (আ.) এসে বললেন—

"আজ রাতে তোমার ওপর হত্যা চালানোর ষড়যন্ত্র হয়েছে। তুমি হিজরতের নির্দেশ পেয়েছ। এখন তুমি বেরিয়ে পড়ো।"

তখন নবী ﷺ হযরত আলি (রা.)–কে তাঁর বিছানায় শোয়ালেন এবং বললেন—

"তুমি আমার চাদর গায়ে দিয়ে আমার স্থানে শুয়ে থাকবে, যেন তারা বুঝতে না পারে আমি চলে গেছি।"

যখন কুরাইশরা নবী করিম ﷺ–কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ঘর ঘিরে ফেলেছিল, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি ঘর থেকে বের হন। যাওয়ার সময় তিনি এক মুঠো ধূলা হাতে নিলেন এবং শত্রুদের দিকে ছিটিয়ে দিলেন।

এ সময় তিনি সূরা ইয়াসিনের ৯ নম্বর আয়াত পাঠ করেন —

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ <

অর্থ: "আমরা তাদের সামনে এক প্রাচীর ও তাদের পেছনে আরেক প্রাচীর সৃষ্টি করেছি, ফলে আমরা তাদের ঢেকে দিয়েছি—তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

(সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৯)

যখন নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করছিলেন ও ধূলা ছিটাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহর রহমতে কুরাইশের চোখে পর্দা পড়ে যায়। তারা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কেউ নবী ﷺ–কে দেখতে পেল না!

তিনি ঠিক তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলেন —

তারা বুঝতেও পারল না যে, যাকে হত্যা করতে এসেছে, সে এখন তাদের চোখের সামনেই নিরাপদে চলে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে কুরাইশরা ঘরে ঢুকে দেখে, মুহাম্মদ ﷺ–এর স্থানে আলি (রা.) শুয়ে আছেন! তখন তারা বুঝল নবী ﷺ হিজরত করে চলে গেছেন। ক্রোধে ফেটে পড়ে তারা পুরস্কার ঘোষণা করল—

"যে মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে।"

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের হত্যার ফরমান ব্যর্থ হয়, আর নবী করিম ﷺ নিরাপদে মদিনার পথে যাত্রা করেন।

১. আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসুলকে সর্বদা রক্ষা করেন।

২. সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষে সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

৩. ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করতে পারলে শত্রুরা কখনো দমে না—তবুও আল্লাহর পরিকল্পনাই চূড়ান্ত।

হিজরতের পথে নবিজি :

- নবী মুহাম্মদ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) মক্কা ছেড়ে খুব দ্রুত হিজরতের পথে রওনা হন। কারণ, কুরাইশরা তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। তারা নবিজি ও আবু বকর (রাঃ)-এর নামে "ওয়ারেন্ট জারি" করে রেখেছিল—যে তাদের ধরবে বা হত্যা করবে, সে পাবে বড় পুরস্কার।

পুরস্কারের লোভে অনেকেই তাদের খোঁজে রওনা দেয়। মরুভূমির বালুময় পথে নবিজি ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) দ্রুত চলছিলেন, যেন তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা না যায়। চলতে চলতে আবু বকর (রাঃ)-এর মনে ভয় কাজ করছিল—কোথাও শত্রুরা ধরা না পেয়ে যায়। তাই তিনি মাঝে মাঝে নবিজির সামনে চলে যান, কখনো পিছনে, কখনো পাশে—সবসময় নবিজির নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

একবার নবিজি ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

"আবু বকর! কী হলো তোমার? কখনো সামনে যাচ্ছো, কখনো পেছনে যাচ্ছো কেন?"

আবু বকর (রাঃ) বিনীতভাবে বললেন—

"ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ, কখনো মনে হয় শত্রু সামনে থেকে আসতে পারে, তাই সামনে চলে যাই। আবার কখনো মনে হয় পেছন দিক থেকে কেউ আক্রমণ করতে পারে, তাই পেছনে থাকি।"

নবিজি ﷺ তার উত্তরে স্নেহভরে বললেন—"আবু বকর, চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।"

তবুও আবু বকর (রাঃ)-এর মন শান্ত হচ্ছিল না। কারণ, তাদের চারদিকে শত্রু ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অবশেষে তারা দুজন পৌঁছালেন সাওর (ثور) পর্বতের গুহায়। নবিজি ﷺ জানতেন, এখনই মক্কার লোকেরা তাদের খুঁজে বেড়াবে। তাই শহর ছাড়ার পর প্রথমেই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তিনি গুহায় প্রবেশ করলেন।

আবু বকর (রাঃ) আগে গুহায় প্রবেশ করে চারপাশ পরীক্ষা করেন, যেন কোথাও বিষাক্ত প্রাণী বা বিপদ না থাকে। তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে গুহার গর্তগুলো বন্ধ করেন, যাতে নবিজির কোনো কষ্ট না হয়। এরপর নবিজি ﷺ গুহায় প্রবেশ করেন এবং কিছুটা বিশ্রাম নেন।

এই সময় মক্কার কাফেররা নবিজিকে খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত চলে আসে। আবু বকর (রাঃ) আতঙ্কে বললেন—

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি তারা নিচে তাকায়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে!"

নবিজি ﷺ শান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"আবু বকর, ভয় পেয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা আত-তাওবা ৯:৪০)

এদিকে আল্লাহর অলৌকিক কুদরতে এক মাকড়সা গুহার দরজায় জাল বুনে দেয় এবং একটি কবুতর সেখানে ডিম পাড়ে। ফলে কাফেররা যখন গুহার মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন তারা ভাবে—

"এখানে কেউ ঢুকলে তো জাল ছিঁড়ে যেত, আর পাখি ভয় পেয়ে উড়ে যেত।"

তাই তারা ফিরে যায়। এভাবেই আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ ও আবু বকর (রাঃ)-কে শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ রাখেন।

গুহায় তিন দিন অবস্থানের পর, রাতে তারা মদিনার পথে রওনা হন। নবিজির পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উরাইখিত, একজন অভিজ্ঞ দিকনির্দেশক। আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবার খাবার ও পানি পাঠাতো গোপনে। মক্কার লোকেরা তখনো চারদিকে নবিজির খোঁজ করছিল, কিন্তু আল্লাহর হেফাজতে নবিজি ﷺ নিরাপদে মদিনার পথে অগ্রসর হন।

*শিক্ষা

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুলই প্রকৃত সাহসের উৎস।

বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ উদাহরণ দেখিয়েছেন আবু বকর (রাঃ), যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে নবিজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

সাওর গুহা ইসলামের ইতিহাসে ত্যাগ, ধৈর্য ও ঈমানের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মাদানী জীবন

প্রাণের মদিনায় প্রবেশ :-

হিজরতের দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ অতিক্রম করে নবী করিম ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গী আবু বকর (রা.) যখন মদিনার নিকটে পৌঁছালেন, তখন গোটা ইয়াসরিব শহর আনন্দে মেতে উঠেছিল। মদিনাবাসীরা প্রতিদিন সকালবেলা শহরের বাইরে বেরিয়ে আসতেন প্রিয় নবীকে স্বাগত জানানোর আশায়। সূর্য যখন তীব্র হয়ে উঠত, তখন তারা হতাশ হয়ে ফিরে যেতেন।

অবশেষে সেই ঐতিহাসিক দিন এল — রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে, অর্থাৎ হিজরতের প্রথম বছরের সূচনায় নবী মুহাম্মদ ﷺ মদিনা নগরে প্রবেশ করলেন। সূর্যোজ্জ্বল সেই সকালটি ছিল ইতিহাসের এক মহান দিন।

নবী ﷺ প্রথমে মদিনার উপকণ্ঠে কুবা গ্রামে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি প্রায় চার দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ — মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন, যা আল্লাহর ঘরের মর্যাদা লাভ করে। কুবায় নবী ﷺ স্থানীয় আনসার সাহাবিদের আতিথ্য গ্রহণ করেন, নামাজ আদায় করেন ও ইসলামের দাওয়াত দেন।

চতুর্থ দিনে নবী করিম ﷺ মদিনার মূল শহরের দিকে যাত্রা করেন। আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা তাঁকে বরণ করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। শিশুরা আনন্দে গান গাইতে থাকে —

“তালাআল বদরু আলাইনা
মিন সানিইয়াতিল ওয়াদা‘
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মা দা‘আ লিল্লাহি দা‘।”

(অর্থ: “বিদায় পাহাড়ের দিক থেকে আমাদের মাঝে উদিত হল পূর্ণচাঁদ, আল্লাহর দাওয়াতদাতার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ফরজ হয়ে গেল।”)
সবাই চাইলেন নবী ﷺ তাঁদের ঘরে উঠুন। কিন্তু নবী করিম ﷺ বললেন,
“আমার উটকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর নির্দেশেই চলবে।”
উটটি হেঁটে গিয়ে বানু নাজ্জার গোত্রের এক জায়গায়, অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ির সামনে বসে পড়ে। নবী ﷺ সেখানেই অবস্থান নেন।
মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন:
উট যেই স্থানে বসেছিল, সেটি ছিল দুটি অনাথ ছেলের মালিকানাধীন জমি। নবী ﷺ জমিটি কিনে নেন এবং সেখানে মসজিদে নববী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। নবী ﷺ নিজেও সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহন করেন। মসজিদটি নির্মিত হয় সাধারণ কাঁচা ইট ও খেজুরগাছের কাষ্ঠ দিয়ে, কিন্তু এটি হয়ে ওঠে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু।
মদিনায় প্রবেশের পর নবী করিম ﷺ
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন (মুয়াখাত) স্থাপন করেন,
মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন — যা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান,এবং এখানে থেকেই ইসলাম বিস্তারের নতুন যুগ শুরু হয়।
নবী করিম ﷺ-এর এই আগমন শুধু মদিনার নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে।

ইহুদিদের সাথে নতুন এক চুক্তি :-

মদিনায় হিজরতের পর নবী মুহাম্মদ ﷺ একটি নতুন সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেন। মক্কায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু মদিনায় এসে তাঁরা একটি স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। এখানে বসবাস করত তিনটি বড় ইহুদি গোত্র— বানু ক্বাইনুকা, বানু নযীর, এবং বানু কুরাইযা— এছাড়া ছিল আউস ও খাযরাজ নামে দুইটি আরব গোত্র, যাদের মধ্যে পূর্বে দীর্ঘদিনের শত্রুতা চলছিল।

নবী ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি প্রথমেই এমন একটি চুক্তি প্রণয়ন করেন যাতে মদিনার সকল অধিবাসী— মুসলমান, ইহুদি, ও মুশরিক— মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। এই চুক্তি ইতিহাসে পরিচিত "মদিনার সনদ" বা "ইহুদিদের সঙ্গে নবীজির চুক্তি" নামে।

১. মদিনার সকল জাতি ও গোত্রের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।
২. যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিহিংসা বন্ধ করা।
৩. পারস্পরিক সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৪. নবী ﷺ–এর নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো তৈরি করা।

চুক্তিপত্রে প্রায় ৪৭টি ধারা ছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা নিচে দেওয়া হলো—
১. মুসলমান ও ইহুদি সবাই মদিনার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে।
২. প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মে স্বাধীন থাকবে। ইসলাম বা ইহুদি ধর্ম গ্রহণের কোনো জোর-জবরদস্তি থাকবে না।
৩. যদি মদিনার বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করে, তবে সবাই মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবে।
৪. যুদ্ধের সময় খরচে ও দায়িত্বে সবাই অংশ নেবে।
৫. নবী মুহাম্মদ ﷺ হবেন মদিনার সর্বোচ্চ নেতা ও বিচারক, যিনি বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন।
৬. কোনো ব্যক্তি বা গোত্র শত্রুর পক্ষে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।
৭. কেউ কারও রক্তপাত বা অন্যায়ের দায়ে অন্য গোত্রকে দায়ী করবে না।
৮. মদিনার অভ্যন্তরে শান্তি ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

চুক্তির মাধ্যমে নবী ﷺ ইহুদিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের ধর্ম পালন করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত। নবী ﷺ সবসময় তাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহার করতেন।

তবে পরবর্তীকালে কিছু ইহুদি গোত্র এই চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যেমন—
বানু ক্বাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘাতে যায়,
বানু নযীর নবী ﷺ–কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে,
বানু কুরাইযা যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষে চলে যায়।
চুক্তিভঙ্গের পর প্রতিটি গোত্রের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেন।
এই চুক্তি ইসলামি ইতিহাসে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত, কারণ এটি—
মদিনাকে একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে পরিণত করে,
ধর্মীয় সহাবস্থান ও ন্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করে,
নবী মুহাম্মদ ﷺ–কে একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও ন্যায়বিচারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

মক্কা থেকে কুরাইশদের হুমকি :-

নবী করিম ﷺ যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন কুরাইশরা এ ঘটনাকে তাদের জন্য বড় এক বিপর্যয় হিসেবে দেখল। তারা বুঝে গেল যে, মদিনায় গিয়ে মুহাম্মদ ﷺ এখন একটি নিরাপদ ঘাঁটি পেয়ে গেছেন, যেখানে নতুন মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে এবং ইসলাম আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। তাই তারা নবী ﷺ-কে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম হুমকি ও ষড়যন্ত্র শুরু করল। নিচে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হলো—

মদিনায় নবী ﷺ পৌঁছানোর খবর যখন মক্কায় পৌঁছাল, তখন কুরাইশ নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ তারা জানত, মদিনা এমন একটি শহর যেখানে মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারবে, এবং মুহাম্মদ ﷺ এখন একটি শক্তিশালী গোত্র — আনসারদের সহায়তা পেয়েছেন। এই শক্তি ইসলামকে নতুন গতিতে এগিয়ে দেবে — এই ভয়ই তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল।
কুরাইশরা মদিনার নেতাদের উদ্দেশ্যে দূত পাঠাল। তারা আনসারদেরকে হুমকি দিল যে—"তোমরা যদি মুহাম্মদকে আশ্রয় দাও, তাহলে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ হবে। আমরা তোমাদের ধ্বংস করে দেব।"

এই হুমকি তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে আলাদা আলাদাভাবে পাঠায়। উদ্দেশ্য ছিল— মুসলমানদের সঙ্গে নবী ﷺ-র সম্পর্ক নষ্ট করা এবং মদিনার শান্তি ভেঙে দেওয়া।

কুরাইশরা মদিনায় খাদ্য ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করে দেওয়ারও চেষ্টা করেছিল। তারা হুমকি দেয় যে, মদিনার বাজারে তাদের কোনো পণ্য বিক্রি হতে দেবে না এবং মক্কার বণিকরা যেন মদিনার সঙ্গে কোনো বাণিজ্য না করে। এতে মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার পরিকল্পনা ছিল।

কুরাইশরা মক্কা ও আশেপাশের গোত্রগুলোতে প্রচার চালায় যে—

"মুহাম্মদ আমাদের শহর ত্যাগ করেছে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে। সে এখন মদিনায় নতুন রাষ্ট্র গঠন করছে।"

তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করে, যাতে মদিনার বাইরে কেউ ইসলামকে সমর্থন না করে।

কুরাইশরা মাঝে মাঝে তাদের গুপ্তচর মদিনায় পাঠাত নবী ﷺ ও মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য। এমনকি নবীকে হত্যা করার নতুন ষড়যন্ত্রও তারা ভাবতে শুরু করে। তবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সতর্ক রাখলেন এবং প্রতিটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।

সবশেষে কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয়— শুধু হুমকি নয়, এখন তারা মুসলমানদের শক্তি নষ্ট করতে যুদ্ধ করবে। এভাবেই তাদের শত্রুতার পরিণতি হলো বদরের যুদ্ধ, যা ছিল ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ।

যদিও কুরাইশরা নানা হুমকি দিয়েছিল, তবুও মদিনায় মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যায়নি। বরং এই হুমকিই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। নবী করিম ﷺ আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন শুরু করেন।

বদর যুদ্ধ

আতিকার স্বপ্ন :-

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা ত্যাগের কিছু আগে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে — আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন। আতিকা ছিলেন নবী করিম ﷺ–এর ফুফু, অত্যন্ত জ্ঞানী ও সম্মানিত মহিলা। তাঁর দেখা এই স্বপ্ন কুরাইশদের মধ্যে আলোচনার ঝড় তোলে এবং ভবিষ্যতের এক বড় ঘটনার পূর্বাভাস দেয়।

আতিকা (রাঃ) তিন দিন আগে এক স্বপ্ন দেখলেন, যা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি দেখলেন—

"একজন মানুষ মক্কার চারদিক থেকে চিৎকার করে বলছে: 'হে কুরাইশগণ! তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের ওপর বিপদ আসছে।'

তারপর সে মানুষটি কাবা শরিফের দিকে আসে, কুরাইশদের একে একে ঘর ও জায়গায় গিয়ে সতর্ক করে। শেষে সে এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঘোষণা করে—

'হে কুরাইশগণ! আমি এমন এক আঘাত দেখছি, যা তোমাদের ঘরবাড়ি ও জীবন সব কাঁপিয়ে দেবে।'

এরপর সেই মানুষটি একটি বড় পাথর হাতে নেয়, এবং তা পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয়। পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে নিচে নেমে আসে, আর তার প্রতিটি টুকরো মক্কার প্রত্যেক ঘরে গিয়ে পড়ে।

এই দৃশ্য দেখে আতিকা ভয়ে জেগে ওঠেন।

আতিকা (রাঃ) তাঁর ভাই আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)–কে ডাকলেন এবং বললেন—

"ভাই, আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। বুঝতে পারছি, এর অর্থ হয়তো কোনো বড় বিপদ আসছে।"

আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, "ফুফু, আপাতত এটি কাউকে বলবেন না।"

কিন্তু মক্কার মতো সমাজে গোপন কথা টেকে না। কিছুদিনের মধ্যেই এই খবর ছড়িয়ে পড়ে।

যখন আবু জাহল খবরটি শুনল, সে ব্যঙ্গ করে বলল—"হে আবুল ফাদল (আব্বাস), এখন তো তোমাদের নারীরাও নবুওয়াত দাবি করতে শুরু করেছে!"

সে হাসাহাসি করে বলল, “আমরা অপেক্ষা করছি তিন দিন। যদি কিছু না ঘটে, তাহলে তোমাদের এই ‘স্বপ্নদ্রষ্টা নারী’কে মিথ্যাবাদী বলব।”

তিন দিনও পূর্ণ হয়নি, তখনই এক ভয়ংকর সংবাদ আসে—

আবু সুফইয়ানের কাফেলা থেকে একজন দূত ছুটে এসে জানায়, “মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা তোমাদের কাফেলাকে আক্রমণ করতে বের হয়েছেন!”

এই খবরেই বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়।

অর্থাৎ আতিকার দেখা স্বপ্নটি ছিল বদর যুদ্ধের আগমনের এক অলৌকিক পূর্বাভাস, যা সত্য হয়ে গিয়েছিল।

এই স্বপ্ন শুধু এক নারীর দেখা সাধারণ স্বপ্ন ছিল না; এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মক্কার কুরাইশদের জন্য এক সতর্কবার্তা।

কিন্তু তারা সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করল, আর অচিরেই বদরের ময়দানে তাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে গেল।

জরুরি এলান :-

সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। নবী মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করলেন যে, যাদের যা আছে তা সঙ্গে নিতে হবে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। কেউ যেন যুদ্ধের কথা গোপন না রাখে। মদিনায় সর্বত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। নবীজি ﷺ নিজে সাহাবিদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। সাহাবিরা ছিলেন প্রস্তুত, কিন্তু আবু বকর (রাঃ) তখনও কিছুটা দেরি করছিলেন কারণ নবীজি ﷺ তাঁকে সঙ্গী হিসেবে চাননি—তাঁকে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নবীজি ﷺ তখন সাহাবিদের বললেন,

“আল্লাহর রাসুলের আদেশ অনুযায়ী তোমরা কি প্রস্তুত?”

সবাই একবাক্যে বললেন, “হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত!”

সাদ ইবন উবাদা (রাঃ) বললেন,

“ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আপনি যদি বাহিনীকে বাইরে নিয়ে যেতে চান, তাহলে আমাদের নির্দেশ দিন, আমরা প্রস্তুত। আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো—যেখানে আপনি আদেশ দেবেন, আমরা সেখানেই থাকব।”

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০৩ জন, এবং তাদের হাতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া ও ৭০টি উট। প্রত্যেকে ভাগাভাগি করে একসঙ্গে চলছিলেন। নবীজি ﷺ তিনজন

সাহাবির সঙ্গে একটি উটে পালাক্রমে চড়তেন। নবীজি ﷺ-র সঙ্গী ছিলেন আবু লুবাবা ও আলী (রাঃ)। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে উট ভাগ করে নিতেন। নবীজি ﷺ নিজে হাঁটতেন, অন্যরা তাঁকে বলতেন,
"ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ, আপনি উঠুন, আমরা হেঁটে যাব।"
কিন্তু নবীজি ﷺ বলতেন,
"তোমরা হাঁটার চেয়ে আমি হাঁটতে পারব না? তোমরা যেমন সওয়াবের আশা করছ, আমিও তেমন সওয়াব চাই।"
এইভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো, এবং নবীজি ﷺ-র নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতিতে যাত্রা করল—এটাই ছিল সেই "জরুরি এলান", যা মদিনায় যুদ্ধের সূচনা ঘোষণা করেছিল।

সাহাবিদের কাফেলা :-

মদিনায় হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই কঠিন। কুরাইশরা তাদের ধনসম্পদ, পরিবার ও ব্যবসা থেকে বঞ্চিত করেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহর রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর নজর রাখতেন, কারণ সেই কাফেলাগুলোর অর্থই ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল পুঁজি।

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে, নবী করিম ﷺ জানতে পারেন যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসছে। এতে প্রায় এক হাজার উট এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য ছিল। কুরাইশদের প্রায় প্রতিটি ধনী ব্যক্তি এর অংশীদার ছিল। নবী ﷺ সাহাবিদের নিয়ে এই কাফেলাটিকে আটক করার পরিকল্পনা করেন, যাতে মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ কিছুটা হলেও আদায় হয়।
তিনি মদিনা থেকে প্রায় তিন শত তেরো (৩১৩) জন সাহাবিকে নিয়ে রওনা হন। তাঁদের মধ্যে ৭৭ জন মুহাজির ও ২৩৬ জন আনসার ছিলেন। তাদের হাতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া ও প্রায় ৭০টি উট, যেগুলোতে তারা পালা করে চড়তেন।
আবু সুফিয়ান খবর পেয়ে সাবধান হয়ে যান। তিনি গোপনে একজন দূত পাঠিয়ে মক্কার কুরাইশদের সতর্ক করে দেন, যাতে তারা তাদের কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য সেনা পাঠায়।

এই সংবাদ শুনে কুরাইশরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা প্রায় এক হাজার সৈন্য, একশো ঘোড়সওয়ার ও ছয়শো বর্মধারী যোদ্ধা নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের নেতা ছিল আবু জাহল।

বদরের প্রান্তরে :

- বদর ছিল ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ। এটি সংঘটিত হয় হিজরতের দ্বিতীয় বছর, রমজান মাসের ১৭ তারিখে। এই যুদ্ধই প্রথমবারের মতো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। একপক্ষে ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ, অপরপক্ষে মক্কার কুরাইশ নেতারা।

বদর একটি বালুময় সমতল এলাকা, মদিনা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে একাধিক কূপ বা পানির উৎস ছিল। সেই কারণেই এটি কাফেলাদের জন্য বিশ্রামস্থল হিসেবে পরিচিত ছিল।

নবী করিম ﷺ যখন সাহাবিদের নিয়ে বদরে পৌঁছালেন, তখন কুরাইশ বাহিনীও কাছাকাছি এসে অবস্থান নেয়। সাহাবিরা শিবির স্থাপন নিয়ে আলোচনা করলে, হযরত হুবার ইবনুল মুনযির (রা.) প্রস্তাব দেন — "ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা যেন কূপগুলোর পাশে গিয়ে অবস্থান করি এবং বাকি কূপগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে দেই।" নবীজি ﷺ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বদরের প্রান্তরে সাহাবিদের সারিবদ্ধভাবে সাজালেন। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একদম সামনে রেখেছিলেন তীরন্দাজদের, মাঝখানে ছিলেন তলোয়ারধারী যোদ্ধারা, আর পেছনে উট-ঘোড়ার বাহকগণ।

একটি তাঁবু তৈরি করা হয় নবী করিম ﷺ-কে কেন্দ্র করে, যেখানে তিনি আল্লাহর কাছে দীর্ঘ দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ! যদি এই দলটি (মুসলমানরা) আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আর কেউ তোমার ইবাদত করবে না।"

দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় একে একে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। কুরাইশের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে তিনজন যোদ্ধা—উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন তিন মহান সাহাবি—হযরত হামজা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত উবাইদা ইবনুল হারিস (রা.)।

অল্পক্ষণেই উতবা ও শায়বা নিহত হন, ওয়ালিদকেও আলী (রা.) হত্যা করেন।
যুদ্ধের উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে আল্লাহ তা'আলা নবীজির দোয়ার জবাবে ফেরেশতাদের সাহায্য পাঠান। কুরআনে এসেছে:
"আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলাম, যারা পর্যায়ক্রমে আগমন করছিল।"
(সূরা আল-আনফাল: ৯)
সেইদিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, অথচ কুরাইশের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০। তবুও আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন।

রবের কাছে নবিজির বুকভরা আকুতি :-

বদরের সেই ঐতিহাসিক সকাল। আকাশে তখনো সূর্যের আলো পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে উঁচু–নিচু বালুকাময় ময়দানে। এক পাশে তিন শতের একটু বেশি সংখ্যক মুমিন—অস্ত্রশস্ত্রে দুর্বল, কিন্তু ঈমানে পাহাড়সম দৃঢ়; অন্য পাশে হাজারেরও বেশি সজ্জিত কাফির বাহিনী। পরিস্থিতি সংখ্যার বিচারে অসম, শক্তির বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
এই কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার চেয়ে বেশি দায়িত্বের ভারে নত, আর তাই তিনি আল্লাহর দরবারে মুখ তুলে দাঁড়ালেন—এক গভীর, ব্যাকুল, শিহরণ জাগানো আকুতি নিয়ে।
নবিজি ﷺ একটি ছোট ছাউনি সদৃশ তাঁবুর ভেতরে দাঁড়িয়ে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দিলেন। চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাঁর কণ্ঠে ছিলো ব্যথা, আর্তি, ভালোবাসা, আর সার্বিক নির্ভরতার প্রকাশ—
আবেগে কাঁপা কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—"হে আল্লাহ! তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! যদি আজ এ দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না যে তোমার ইবাদত করবে!"
এই বাক্যটি শুধু দোয়া ছিল না—এ ছিলো উম্মতের প্রতি তাঁর সীমাহীন করুণা, ইসলামের ভবিষ্যৎকে ঘিরে তাঁর গভীর উদ্বেগ, এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসার এক অনন্য ঘোষণার মতো।
তিনি কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো সেজদায় পড়ে পড়তে লাগলেন—

“হে রাব! তুমি সাহায্য নাজিল করো... হে আল্লাহ! আমাদের আর কোনো শক্তি নেই তোমাকে ছাড়া...”

আবু বকর রা.-এর প্রতিক্রিয়া

এই মুহূর্তে আবু বকর রা. নবিজির পাশে এসে তাঁকে আলতো করে ধরে বললেন—

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।”

তিনি নবিজির কাঁধে রিদা ঠিক করে দিলেন, তাঁর শরীর আল্লাহর দরবারে আকুতিতে যতটা কাঁপছিল, তা দেখেই চোখে পানি চলে এসেছিল সাহাবাদের।

আল্লাহর জবাব—দোয়ার তাৎক্ষণিক কবুল হওয়ার দৃশ্য

এদিকে নবিজির দোয়া যখন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হলো সাহায্য—

আসমানি বাতাসের শব্দ—গর্জনময়, দ্রুত, যেন অদৃশ্য বাহিনী ছুটে আসছে

ফেরেশতাদের আগমনের সুসংবাদ

নবিজির মুখে হাসি ফুটে ওঠা

তিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে সাহাবাদের বললেন—

“খুশির সংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তোমাকে সাহায্য দিয়েছেন। আমি দেখেছি জিবরিল আছেন, তাঁর ঘোড়ায় সাদা দড়ি বাঁধা।”

নবিজির বদরের দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য প্রেরণা নয়—

এটি ছিলো—

তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর

দীন রক্ষায় এক নবীর ব্যাকুলতা

আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের সবচেয়ে কোমল ও গভীর রূপ

আর সেই মুহূর্ত যখন আসমান জুড়ে আলোড়ন ওঠেছিল এক মানুষের দোয়ার কারণে মুমিন বাহিনী সেই দোয়ার বরকতেই অদেখা শক্তিতে সাহস পায়, আর বদরের ময়দান হয়ে ওঠে ইসলামের প্রথম নির্ণায়ক বিজয়ের সাক্ষী।

যুদ্ধের সূত্রপাত :-

বদরের প্রান্তর—মদিনা থেকে প্রায় ৮০–১০০ কিলোমিটার দূরে মরুভূমির নির্জন স্থান। ১৭ রমজান, হিজরি ২। ইতিহাসের প্রথম মহান ইসলামী যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। উভয় পক্ষই চূড়ান্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে।

মুসলিম বাহিনী সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন—সহজ-সরল, অস্ত্রসস্ত্রে দুর্বল, কিন্তু ঈমানের শক্তিতে শক্তিশালী।

নবিজি (সা.) নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে সাহাবিদের দাঁড় করিয়ে দেন। লাঠি দিয়ে সার সোজা করে দিতেন, যাতে কেউ সামনে-পেছনে না হয়।

তিনি একটি দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ! যদি আজ এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না।"

এই আকুল প্রার্থনা বদরের মূল যুদ্ধের আগে আসমানকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

আরবদের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হয় একক দ্বন্দ্ব–যোদ্ধা বের করার মাধ্যমে।

কুরাইশ বাহিনী থেকে এগিয়ে আসে ৩ জন:

উতবা ইবনে রাবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওয়ালিদ ইবনে উতবা।

মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রথমে আনসারের কয়েকজন এগিয়ে গেলে কুরাইশ বলে—

"আমরা আমাদের সমকক্ষ কুরাইশকে চাই।"

তখন নবিজি (সা.) ডাকলেন তাঁর পরিবার থেকে তিনজনকে—

হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, উবায়দা ইবনে হারিছ, আলী ইবনে আবি তালিব।

আলী (রাঃ) মুহূর্তেই ওয়ালিদকে কুপোকাত করেন। হামজা (রাঃ) শায়বাকে হত্যা করেন। উবায়দা (রাঃ) ও উতবার মধ্যে কঠিন লড়াই হয়; উতবা নিহত হয়।

উবায়দা (রাঃ) গুরুতর আহত হন, পরে শহীদ হন।

এই প্রথম দ্বন্দ্ব মুসলিম বাহিনীর মনোবল কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

মুবারযাহ শেষ হতেই উভয় সেনাদল ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে বদরের মরুপ্রান্তর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নবিজি (সা.) একটি ছাউনিতে অবস্থান করেন।

সা'দ ইবনে মুআজ (রাঃ) এবং অন্য সাহাবারা তাঁকে পাহারা দেন।

মুসলিমরা পানির কূপ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়—এটি যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সুবিধা হয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনী কেন্দ্রে মুহাজির-আনসার মিশ্রিত, ডান-বামে বিশেষ বাহিনী।
কুরাইশ প্রায় ১০০০ সৈন্য, যুদ্ধ-অস্ত্র, ঘোড়া—সবকিছুতেই শক্তিশালী।
তাদের নেতৃত্বে ছিল আবু জাহল। তিনি বলেছিল: "আজ আমরা মুহাম্মদের দলকে চূর্ণ করবো।"
যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে।
যখন পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে, তখন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়—
নবিজি (সা.)-এর উপর আয়াত নাজিল হয়:
"আমি তোমাদের সাহায্য করবো হাজার ফেরেশতা দিয়ে।"
সাহাবিরা বলেন,
"আমরা দেখেছি সাদা পোশাকধারী অশ্বারোহী যোদ্ধারা আমাদের সঙ্গে শত্রুর উপর আঘাত হানছে।"

এটি বদরের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

মুসলিমরা বার বার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি তুলে আঘাত করতে থাকে।
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কুরাইশ নেতা একে একে পতন হয়। শত্রুপক্ষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
কুরাইশের সবচেয়ে দাম্ভিক নেতা আবু জাহল শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।
তার মৃত্যু বদরের বিজয়ের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হয়ে ওঠে।

মুশরিকদের পরাজয় :

- বদরের ময়দানে যখন মুসলিম বাহিনী তাদের ক্ষুদ্র সংখ্যা সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল, তখন কুরাইশের বাহিনী তাদের বিশাল শক্তি ও অহংকার নিয়ে এগিয়ে আসে। বাহ্যিকভাবে সব শক্তি, সামরিক প্রস্তুতি এবং সংখ্যার দিক থেকে মুশরিকরাই ছিল সুদৃঢ়; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য মুসলিমদের পক্ষে ছিল।
১. যুদ্ধের শুরু ও মুশরিকদের সংকটমূহূর্ত। যুদ্ধ শুরুর পরপরই কয়েকটি ঘটনার ফলে মুশরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করে—
প্রথম ধাক্কা আসে যখন কুরাইশের তিন যোদ্ধা (উতবা, শায়বা ও ওলীদ) মুখোমুখি লড়াইয়ে নিহত হয়।

মুসলিম বাহিনী আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্তিশালী ঈমানি তেজ অনুভব করছিল, বিপরীতে কুরাইশরা বুঝতে পারছিল যে তাদের পরিকল্পনা ভেঙে যাচ্ছে। তাদের সারি বিশৃঙ্খল হতে শুরু করে এবং নেতৃত্বে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

২. ফেরেশতাদের সাহায্য ও মুসলিমদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি। রসুল ﷺ দোয়া ও আকুতিতে আল্লাহর সাহায্য চাইলে আল্লাহ মুমিনদের সহযোগিতায় ফেরেশতা পাঠান। এই সহায়তা—

মুসলিমদের মনোবলকে আকাশচুম্বী করে তোলে। কুরাইশদের হৃদয়ে ভয়, বিস্ময় ও অস্থিরতা তৈরি করে।

যুদ্ধে মুসলিমদের আক্রমণ ধারাবাহিক এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। ফলাফল—কুরাইশরা টিকতে পারছিল না, তাদের সামনে যেন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছিল।

৩. আবু জাহলের পতন—পরাজয়ের বড় মুহূর্ত।

মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবু জাহল।

যুদ্ধ চলাকালীন—সে বারবার সৈন্যদের উস্কে দিচ্ছিল

অহংকারভরে দাবি করছিল, "আজ আমরা শেষ করে দেব"—শেষ পর্যন্ত মুজা'যির দুই তরুণ আনসারি সাহাবি তাকে আঘাত করে। আবু জাহল অহংকারে ডুবে মরনাপন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে।

তার মৃত্যু কুরাইশ বাহিনীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙে দেয়।

নেতৃত্বহীন সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করে।

৪. পালানো ও ধ্বংস—কুরাইশদের সম্পূর্ণ বিপর্যয়।

যুদ্ধের শেষ ভাগে—মুসলিমরা সুসংগঠিতভাবে অগ্রসর হতে থাকে। মুশরিকরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেদিকে পারছিল ছুটে পালাচ্ছিল।

কেউ কেউ সরঞ্জাম ফেলে রেখে দৌড় দেয়।

বহু জন নিহত হয়, অনেককে বন্দিও করা হয়। এরা বুঝে যায়—

সংখ্যা বা সরঞ্জাম নয়, আল্লাহ যাদের সাহায্য করেন তারাই বিজয়ী।

৫. যুদ্ধের ফলাফল—পরাজয়ের চিহ্ন কুরাইশের ৭০ জন নিহত। ৭০ জন বন্দি।

বিশাল পরিমাণ অস্ত্র-সরঞ্জাম মুসলিমদের হাতে আসে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি—মক্কার নেতৃত্বের প্রধান স্তম্ভরা নিহত হওয়ায় কুরাইশ সমাজ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড অহংকারে মদিনায় আক্রমণে আসা কুরাইশ বাহিনী অপমানজনকভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

৬. মুসলিমদের জন্য ঐতিহাসিক দিন বদর শুধু একটি যুদ্ধ নয়—
এটি হলো ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বে প্রথম ঐশী বিজয়।
মুশরিকদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে—
ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। মদিনার রাষ্ট্রের মর্যাদা দৃঢ় হয়।
নবিজির নেতৃত্ব সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর-পরবর্তী কিছু ঘটনা

রুকাইয়া এর ইন্তেকাল

:- বদর অভিযানের শুরু থেকেই নবিজির (সা.) কন্যা এবং উসমান ইবন আফফান (রাঃ) এর স্ত্রী রুকাইয়া (রাঃ) মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। জ্বর ও অসহনীয় ক্লান্তি তাঁকে একেবারে শয্যায় আটকে দেয়।
রোগ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, নবিজি (সা.) নিজেই উসমান (রাঃ)-কে বদরে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি স্ত্রী রুকাইয়ার সেবা করতে পারেন। উসমান (রাঃ) দিন-রাত তাঁর সেবা করতেন, পানি পান করাতে, সান্ত্বনা দিতে এবং চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করতে কোনোরকম ত্রুটি রাখেননি।
বদরের ঐতিহাসিক বিজয়ের সংবাদ যখন মদিনায় পৌঁছায়, তখন মুসলমানদের ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ ওঠে।
কিন্তু সেই আনন্দে উসমান (রাঃ) ছিলেন অংশ নিতে অক্ষম—কারণ ঠিক সেই সময় রুকাইয়ার অসুস্থতা চরমে পৌঁছে যায়।

রুকাইয়া (রাঃ)-এর শেষ মুহূর্ত বদরের বিজয়ের দিনই—
হিজরতের দ্বিতীয় বছরের রমজান মাসে, মুসলমানরা যখন বিজয়ের খবর পেয়ে উল্লাস করছিল,
সেই মুহূর্তেই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় রুকাইয়া (রাঃ) এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁর চেহারা শান্ত ছিল। তিনি বারবার শাহাদাহ উচ্চারণ করছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
তাঁর কাছে থাকা নারীরা তাঁর মাথা সোজা করে দেন এবং তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সাক্ষী থাকেন।

এভাবে নবিজির (সা.) ঘরে একদিকে বদরের জয়ের আনন্দ, অন্যদিকে প্রিয় কন্যার মৃত্যু—দুই বিপরীত অনুভূতি একই দিনে মিলিত হয়।
রুকাইয়ার মৃত্যু উসমান (রাঃ)-কে গভীরভাবে ভেঙে দেয়।
তিনি এমনভাবে কেঁদেছিলেন যে মানুষ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসে। তাঁর জন্য নবিজি (সা.)-এর সান্ত্বনার কথা পরে মুসলমানরা দীর্ঘদিন স্মরণ করেন।
জানাজা নামাজ আদায় করা হয় মদিনায়।
নবিজি (সা.) তখন বদরের প্রান্তর থেকে ফেরেননি। সাহাবিরা রুকাইয়া (রাঃ)-কে জন্নাতুল বাকি' কবরস্থানে দাফন করেন। বদরফেরত নবিজি (সা.) মদিনায় এসে তাঁর কবর পরিদর্শন করেন এবং দোয়া করেন। রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন নবিজি (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা—
তাঁর মৃত্যু বদর বিজয়ের আনন্দকে ম্লান করে দেয় এবং ঘরে গভীর শোক নেমে আসে।

রুকাইয়া (রাঃ)-এর জীবনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—
১. তিনি মক্কায় নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করে ইসলাম গ্রহণ করেন।
২. দুটি হিজরতের অংশীদার ছিলেন—
প্রথমে আবিসিনিয়ায় (হিজরত-এ-হাবশা) পরে মদিনায়। এবং তিনি উসমান (রাঃ)-এর প্রথম স্ত্রী—যার ইন্তেকালের পর নবিজি (সা.) উসমানের ব্যাপারে বলেন:"আজ যদি আমার আরেকটি কন্যা থাকত, উসমানকে তাকেই বিয়ে দিতাম।"

বনু কায়নুকা :-

বদর যুদ্ধের বিজয় মদিনাজুড়ে এক নতুন মনোবল সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানরা প্রথমবারের মতো বড় শত্রুর সামনে সাফল্য লাভ করে। এই বিজয়ের ফলে—মুসলমানদের মর্যাদা বাড়ে, আরব উপত্যকায় তাদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়। মক্কার কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মদিনার ভেতরে লুকানো শত্রুরাও অস্থির হতে শুরু করে। মদিনায় বসবাসকারী তিন ইহুদি গোত্র— বনু কায়নুকা, বনু নাদীর, বনু কুরাইজা —এর সঙ্গে নবিজি ﷺ একটি লিখিত মদিনার সনদ অনুযায়ী শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বদরের পর থেকে তারা খোলাখুলিভাবে চুক্তিভঙ্গের পথে হাঁটতে শুরু করে। সবচেয়ে প্রথমে বিদ্রোহে নামে বনু কায়নুকা।

তারা ছিল মদিনার দক্ষ স্বর্ণকার, লৌহকার ও বণিক সম্প্রদায়। বাণিজ্য ও অস্ত্র তৈরি ছিল তাদের হাতে। তারা ছিল দুর্গবেষ্টিত, সামরিকভাবে প্রস্তুত একটি গোত্র। বদরের বিজয়ের পর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উগরে দিতে থাকে।

বনু কায়নুকার গোলায় একদিন এক মুসলিম নারী কিছু সামগ্রী কিনতে যান।

তারা প্রথমে তাকে বরণ করলেও পরে—একজন ইহুদি স্বর্ণকার তার পর্দা খুলে দেওয়ার জন্য একটি কৌশল করে।

নারী লজ্জায় চিৎকার করলে, এক মুসলমান ওই ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে এগিয়ে আসে। সাথে সাথে বেআইনিভাবে বনু কায়নুকার লোকেরা ওই মুসলিমকে হত্যা করে। এই ঘটনা মুহূর্তেই বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এটি ছিল চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মদিনার শান্তি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

নবিজি ﷺ তাদেরকে ডেকে বললেন—"তোমরা কি বদর থেকে কিছু শিক্ষা নিলে না?"

কিন্তু বনু কায়নুকা উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল—"হে মুহাম্মদ! তুমি যেসব লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছো (কুরাইশ), তারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল না। যদি কখনো তুমি আমাদের মুখোমুখি হও—তবে দেখবে যুদ্ধ কাকে বলে।"

এটি ছিল স্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা।

নবিজি ﷺ মদিনার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য হন। তিনি বনু কায়নুকার দুর্গ অবরোধ করেন। অবরোধ চলে ১৫ দিন। এই সময় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বনু কায়নুকার পুরনো মিত্র ছিল।

সে এসে নবিজিকে ﷺ চাপ দিতে থাকে—

"এই আমার মিত্ররা; তুমি তাদের ছেড়ে দাও।"

সে জোরে নবিজির জামা ধরে টেনে ধরে—এমনকি নবিজির মুখে অসন্তোষ দেখা যায়। তবু মদিনায় গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি এড়াতে নবিজি ﷺ তাদের প্রাণভিক্ষা মেনে নেন, তবে— শর্ত রাখেন তারা মদিনা ছেড়ে চলে যাবে।

তাদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।তাদের সম্পত্তির একটি অংশ রাষ্ট্রীয়ভাবে জব্দ করা হয়। তারা মদিনা থেকে সিরিয়ার দিকে নির্বাসিত হয়ে চলে যায়। এটি ছিল মদিনায় প্রথম চুক্তিবহির্ভূত শত্রুর শাস্তি—যা মদিনার শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

নবিজি ﷺ দেখিয়ে দিলেন—

চুক্তিভঙ্গকারীর জন্য মদিনায় কোনো জায়গা নেই। মুসলমান সমাজের নিরাপত্তা রক্ষায় শক্ত অবস্থান প্রয়োজন। মুনাফিকদের অন্তরালে বিরোধ ও তাদের প্রকৃত পরিচয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বনু নাদীর, বনু কুরাইজা এই দুই গোত্রের আচরণেও প্রভাব ফেলে।

ইসলামের শত্রু ইবনু আশরাফকে হত্যা :-

বদরের বিজয়ের পর মুসলিমদের শক্তি ও মর্যাদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকেই ইসলামের প্রভাবকে সম্মান করতে শুরু করলেও মদীনায়

বসবাসকারী কিছু ইহুদি নেতা হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে উঠল। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু ছিল কা'ব ইবনু আল-আশরাফ—বানু নুযায়রের নেতা, ধনবান, কবি এবং প্ররোচনাকারী।

বদরের পরে তিনি আক্রান্ত হন প্রবল ঈর্ষায়। মুসলমানদের বিজয় তাকে সহ্য হয়নি। সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কান্নাকাটি করে উসকে দিল,— "তোমাদের নেতারা ধ্বংস হয়ে গেল, তোমরা কীভাবে বাঁচলে?"

এরপর সে মুশরিকদের সাথে বৈঠক করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল। ইবনু আশরাফ শুধু রাজনৈতিক চক্রান্তেই থামেনি; নবিজি ﷺ-কে নিয়ে অশ্লীল ও অপমানজনক কবিতা রচনা করে ছড়িয়ে দেয়।

মুসলিম নারীদের সম্পর্কে ঘৃণ্য কটুক্তি করতে থাকে। মদীনায় বিদ্রোহ উসকে দিতে এবং মুসলমানদের ওপর আকস্মিক হামলার পরিকল্পনা করে। এভাবে মদীনার নিরাপত্তা সরাসরি হুমকির মুখে পড়ে।

যখন তার ষড়যন্ত্র ও অশ্লীলতার সীমা অতিক্রম করল, তখন নবিজি ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে ডেকে বললেন—

"কা'ব ইবনু আশরাফের মন্দ কাজ আর সহ্য করা যায় না। তোমরা কেউ কি তাকে শেষ করতে পারবে?"

ইউসাইদ ইবনু হুদাইর, মুহাম্মদ ইবনু মাসলমা ও সিলকানাই মুহাম্মদী সালামার নেতৃত্বে একটি দল স্বেচ্ছায় আগাল। তাদের মধ্যে ছিল—

মুহাম্মদ ইবনু মাসলমা, আবু নায়িলা (সালিক ইবনু সালামা) — তিনি কা'বের পালিত ভাইদের একজন ছিলেন। এবং আরও চারজন আনসারী সাহাবি।

কা'ব খুব অভিমানী ও আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার পালিত ভাই আবু নায়িলা তার সাথে সহজেই মিশতে পারতেন। তাই তিনি কা'বকে ধৈর্য ধরে কয়েকদিন ধরে আড্ডা দেন। একদিন কবির দুবলা-মজবুত মনে দেখিয়ে বলেন—

"আমরা তো অনেক কষ্টে আছি। তোমার কাছে চাইলে কিছু পেতে পারি কি?"

কা'ব রাজি হল। এরপর আবু নায়িলা তাকে রাতের অন্ধকারে বাইরে আসার আমন্ত্রণ জানাল।

কা'ব নিজ স্ত্রীকে বলেছিল,

— "রাতে কিছু লোক আমাকে ডাকছে, যাচ্ছি।"

স্ত্রী বললেন,

— "রাতের এই সময়? আমি তোমার মুখে অশুভ ছায়া দেখছি।"

কা'ব অহংকারে বলল,

— "ধনবান মানুষ কি ভয় পায়?"

এক রাত গভীর অন্ধকারে তাকে বের করে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। চলার পথে সাহাবিরা তার শরীরের সুগন্ধি ছুঁয়ে দেখলেন যেন কথা বলার অজুহাত থাকে। যখন তিনি নির্ভার হয়ে পড়লেন, তখন মুহাম্মদ ইবনু মাসলমা ইশারা দিলে দলটি একযোগে আক্রমণ করল।

ইবনু আশরাফ প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেল। এভাবেই মদীনার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রুর পতন ঘটে।

মদীনা আবার নিরাপদ হলো। ইহুদি গোত্রগুলো নবিজির ﷺ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সম্মান করতে শুরু করল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে থেমে গেল। এই অভিযান নবিজির ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনার দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

উহুদের যুদ্ধ :-

বদর যুদ্ধের পরাজয় কুরাইশরা কোনোভাবেই সহজে মেনে নিতে পারছিল না। বদরের প্রান্তরে নিহত হয়েছিল তাদের বহু প্রধান নেতা—ইকরিমা, সাফওয়ান, আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ, আবুল বুহরীক প্রমুখ। এসব ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। নিহতদের পরিবার-পরিজনরা বিশেষভাবে এই প্রতিশোধের দাবিতে তৎপর হয়ে ওঠে।

তাদের নারীসমাজ পর্যন্ত ঘোষণা দেয়—যে পর্যন্ত নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়া না হবে, তারা স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, এমনকি কোনো সাজগোজও করবে না। মক্কার প্রতিটি ঘরে তখন শোক ও প্রতিশোধের জ্বালা।

কুরাইশদের নেতারা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। যুদ্ধ-অস্ত্র, বাহিনী, উট—সবকিছু জোগাড়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কবি-গায়করা কবিতা আবৃত্তি করে তাদের উন্মাদনা আরও উসকে দিত। বিশেষত কবি আবু সুফিয়ান ইবন হারিস মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণাময় কবিতা পড়ে মানুষকে যুদ্ধে উসকে তোলে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে তারা নানা ধরনের অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও গুজব ছড়ায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনোবল দুর্বল করা এবং নিজেদের বাহিনীকে উসকে দিয়ে প্রস্তুত করা।

অবশেষে প্রায় তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়। বাহিনীতে ১৫ জন নারীও ছিল—তারা যুদ্ধ করত না, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করে, ঢোল বাজিয়ে সৈন্যদের উৎসাহ দিত।

বাহিনীতে ছিল—

অসংখ্য উট, প্রচুর ঘোড়া, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা।

সব মিলিয়ে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ন।

কুরাইশ বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিয়োগ করা হয় আবু সুফিয়ানকে। সে বদরের প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত ছিল। তার ডান হাতে মানদণ্ড বহন করছিল ওয়াকীদ ইবনু মুগিরার ছেলে খালিদ। আর আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিল।

ওরা ঘোষণা করেছিল—

"মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবার এমন আঘাত হানা হবে, যা আর কখনো ভুলতে পারবে না।"

বাহিনীর উৎসাহ, ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল—শিগগিরই একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি :-

বদরের বদলা নেওয়ার সংকল্পে কুরাইশরা যখন মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এমন সংবাদ মদিনায় পৌঁছাতেই মুসলিম সমাজে যুদ্ধ প্রস্তুতির উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। সবাই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে লাগল।

১. ফৌজ সাজানোর কাজ শুরু, মুসলিম বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর জন্য একটি ইউনিট নবীজির (ﷺ) নির্দেশে দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এই ইউনিটের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন— সাদ ইবনে মুযাহ, উসাইদ ইবনে হুযাইর, আবাদ ইবনে বশীর (রাঃ) প্রমুখ আনসার সাহাবি। তারা বিভিন্ন প্রান্তে টহল ও সুরক্ষার কাজ চালাতে থাকেন, যেন শত্রুপক্ষ হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে।

২. দুধারের শক্তি: তীর-তলোয়ার প্রস্তুতি এই ফোর্সের দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের সবধরনের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা। মুসলিমরা তাঁদের তীর-তলোয়ার ঠিকঠাক করে রাখলেন। কেউ কেউ নিজেদের বর্ম, ঢাল, অশ্ব, অস্ত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। প্রত্যেকে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন যে, শত্রুরা যখন আসবে, তখন তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

৩. কুরাইশ বাহিনীর আগমন সংবাদ

শুক্রবার সকালে খবর এলো—কুরাইশ বাহিনী মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তারা উহুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ কথা শুনে মদিনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবিরা দ্রুত মসজিদে জড়ো হতে থাকেন।

৪. জুমুআর খুতবার নির্দেশনা

নবী করীম (ﷺ) জুমুআর খুতবায় সবাইকে—ধৈর্যের উপদেশ, ঈমানের দৃঢ়তা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার তাগিদ দেন। এরপর তিনি মসজিদেই অবস্থান করে জিহাদের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন।

৫. নবীজির ঘরে গিয়ে যুদ্ধসাজ লওয়া

খুতবা শেষে নবীজী (ﷺ): নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন, যুদ্ধবর্ম পরিধান করলেন, কমান্ডারের উপযোগী সজ্জা গ্রহণ করলেন।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) — তাঁরা নবীজির মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন, যা ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ।

৬. মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি

নবীজীর (ﷺ) সাহসিক সাজ-পোশাক দেখে সাহাবিদের মনোবল আরও বেড়ে যায়। প্রত্যেকে বুঝতে পারে—এ যুদ্ধ সাধারণ নয়, বরং ইসলাম রক্ষার এক মহান পরীক্ষা।

উহুদের বাহিনী :

- উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের আগের রাতেই মদিনায় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নবিজি ﷺ পরের সকালে সাহাবিদের নিয়ে বের হন। মদিনা নগরী তখন যেন এক অদৃশ্য উত্তেজনায় কাঁপছিল—প্রত্যেক ঘরে ঘরে আলোচনা, কুরাইশের বিশাল বাহিনী মদিনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, মুসলমানদের নেতৃত্বে আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত। নবিজি ﷺ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সাহাবিদের শৃঙ্খলা ও সহিষ্ণুতার নির্দেশ দেন, আর এভাবেই মুসলিম বাহিনী ওহুদের দিকে এগোতে থাকে।

মুসলিম বাহিনী সংখ্যা ছিল খুব কম—প্রায় এক হাজার লোক নিয়ে বের হলেও মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তিনশ লোককে নিয়ে মাঝপথেই ফিরে যায়। ফলে নবিজির সাথে থেকে যায় কেবল সাতশত মোহাম্মদপ্রেমী সাহাবি—তারা জানত, সংখ্যার আধিক্য বা অস্ত্রশস্ত্র তাদের শক্তি নয়, তাদের শক্তি হলো ঈমান, আনুগত্য আর নবিজি ﷺ-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

এই সাতশত বাহিনীকে নবিজি ﷺ চূড়ান্ত কৌশলে সাজান। তিনি উহুদ পাহাড়ের পেছনে নিজ বাহিনীকে অবস্থান করিয়ে দেন—যাতে কুরাইশরা সামনে থেকে আক্রমণ করলেও পিছন দিয়ে ঘিরে ফেলতে না পারে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আইনের পাহাড়—জাবাল আররমাহর ওপর তীরন্দাজ বাহিনী নিয়োগ। নবিজি ﷺ পঞ্চাশ জন দক্ষ তীরন্দাজকে সেখানে দাঁড় করালেন, আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে তাদের নেতা বানিয়ে কঠোরভাবে বলে দিলেন—"যে পরিস্থিতিই হোক, আমাদের জিত কিংবা পরাজয়—কোনো অবস্থাতেই তোমরা এই পাহাড় ছেড়ে নিচে নামবে না।"

এদিকে কুরাইশ বাহিনী ছিল অপর প্রান্তে—তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। ঘোড়সওয়ার বাহিনী, পদাতিক সৈন্য আর ধনুক, ঢাল, বর্শা দিয়ে সজ্জিত তাদের বিশাল দল। আবু সুফিয়ান ছিল সর্বাধিনায়ক। তার সাথে ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালিদ—যে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি; ছিল ইকরিমা ইবনু আবু জাহল, আরো বহু অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তাদের বাহিনী বহন করছিল বদরের প্রতিশোধের আগুন—প্রত্যেকে বদরের পরাজয়ের ক্ষত ভুলতে পারেনি।

দুটো বাহিনী যখন উহুদের বুক চিরে মুখোমুখি দাঁড়াল, মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকালে মনে হতো নিভৃত, শান্ত, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ মানুষদের একটি দল; যারা সংখ্যায় কম হলেও আত্মবিশ্বাসে অটল। আর অপর দিকে কুরাইশ বাহিনী—ধুলা উড়তে উড়তে

অগ্রসর হওয়া তাদের বিশাল বাহিনী, পুরনো ক্ষোভে চোখে রক্তিম আগুন, মন ভরা প্রতিশোধের ঝড়।
নবিজি ﷺ–এর বাহিনী ছিল সংগঠিত, আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু খুব সীমিত সামর্থ্যের। তাদের বেশির ভাগের কাছে ছিল একেকটি তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। ঢালও ছিল কম, ঘোড়সওয়ারও ছিল হাতে গোনা। তবুও তাদের ভরসা ছিল আল্লাহর সাহায্য আর রাসূলের নির্দেশ—এই দৃঢ়তা সংখ্যার ঘাটতিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে কুরাইশ বাহিনী ছিল সংখ্যায় বিপুল, অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ এবং বদরের প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত। তাদের নারী দল পর্যন্ত এসেছিল—যাতে পুরুষ যোদ্ধাদের উত্তেজনা আরো বাড়ে; আর যাতে তারা পিছু হটার কথা কল্পনাও না করে।
উহুদের প্রান্তর এভাবে পরিণত হয়েছিল দুই ভিন্ন শক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানোর ময়দানে একদিকে বিশ্বাসভরা সাতশত মুমিন, অন্যদিকে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলা তিন হাজার মুশরিক। আর এই বাহিনীগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল যুদ্ধের পরিণতি, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা, আর মুসলমানদের জন্য এক গভীর শিক্ষা।

মুনাফিকদের আসল চেহারা :-

উহুদ অভিযানের প্রস্তুতি যখন চূড়ায়, তখন পুরো মদিনায় এক ভিন্নরকম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নবিজি ﷺ মুশরিকদের বিশাল বাহিনীর খবর পেলেন, সাহাবারা বিরামহীন তৎপরতায় প্রস্তুত হতে লাগলেন। বাহিনী রওনা দেবে—এই ঘোষণা শোনার পর সবাই মনে মনে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াইয়ের অঙ্গীকার নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। মদিনার প্রত্যেক কোণে তখন ঈমানের স্পন্দন। কিন্তু এই প্রবাহের মাঝেই এক প্রবল অন্ধকার ছায়া ছিল—মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই।

বদরের বিজয়ের পর থেকে তার অন্তরে যে হিংসা জ্বলে উঠেছিল, তা ধীরে ধীরে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বদরে নবিজি ﷺ–এর নেতৃত্ব ও সাহাবিদের আত্মত্যাগ তাকে অন্তরে চূর্ণ করে দিয়েছিল। মদিনায় তার নেতৃত্বের স্বপ্ন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তাই উহুদের প্রস্তুতির সময় সে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে ফুঁসছিল। যখন শুরুর সভায় নবিজি ﷺ শহরের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার প্রস্তাব দিলেন, ইবনু উবাই এতে সম্মত হয়েছিল, কারণ সে চাইছিল যুদ্ধের আগেই মুসলমানদের মনোবল নষ্ট

হোক। কিন্তু সাহাবিদের একদল—বিশেষ করে যারা বদরে অংশ নিতে পারেনি—বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার আহ্বান জানালে নবিজি ﷺ তাদের মত গ্রহণ করলেন। ইবনু উবাইয়ের অহং তখন প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। সে মনে করল—তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বাহিনী রওনা হলো, কিন্তু বিদ্বেষে পোড়া ইবনু উবাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল—যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগেই নবিজি ﷺ-কে এমন এক সংকটে ফেলে দেবে যাতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। উহুদের দিকে এগোতেই মুনাফিক নেতা অজুহাত দাঁড় করাল—"আমাদের কথাই ছিল শহরের ভিতরে থাকা। আমাদের মত নেওয়া হয়নি। এখন যুদ্ধ করে লাভ কী?"

তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনশোরও বেশি লোককে নিয়ে পিছনে ফিরে গেল।

এই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নবিজি ﷺ পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—যারা সামনে আসার কথা ছিল, তারা ফিরে যাচ্ছে; যারা নামাজে নবিজির পেছনে দাঁড়াত, তারা সংকটমুহূর্তে পলায়ন করছে; যারা মুখে ঈমানের কথা বলত, অন্তরে তাদের কোনো বিশ্বাস নেই।

মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। ইবনু উবাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাহিনী দাঁড়িয়ে রইল মাত্র সাতশো বীরের উপর। পরিস্থিতি মুহূর্তে ভয়াবহ হয়ে উঠল। অনেক তরুণ সাহাবির হৃদয় কেঁপে উঠল—ভেবেছিল, এ কি তবে যুদ্ধ শুরুর আগেই পরাজয়ের সূচনা? কিন্তু তারা ছিল ঈমানদার; মন ভেঙে গেলেও পা ভাঙেনি।

মুনাফিকদের এই ফিরে যাওয়াই তাদের আসল মুখোশ উন্মোচন করে দিল। সবসময় তারা বলত—"আমরা মুসলমান", "আমরা নবিজিকে ভালোবাসি", "আমরা মদিনার রক্ষক"—কিন্তু বিপদের মুখে তাদের কথার কোনো মূল্য রইল না। তাদের কপটতা রোদে শুকিয়ে যাওয়া পোশাকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। যুদ্ধে যাওয়ার পথে তারা আঘাত করেনি, বর্শা চালায়নি; কিন্তু তারা করেছে তার থেকেও ভয়াবহ আঘাত—মনোবল ভাঙা, সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, সাহাবিদের মাঝে শঙ্কা তৈরি করা।

এমনকি তারা ফিরে যাওয়ার সময় মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছিল। তারা আওস ও খাজরাজ গোত্রের পুরনো বিবাদের কথা তুলে বলেছিল—"তোমরা কেন তাদের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছ?" কিন্তু সংখ্যালঘু মুমিনদের ঈমান সেই পরীক্ষায় অটল ছিল।

মুনাফিকদের এই কৌশল ছিল খুব সরল কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর—

যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগেই মুসলমানদের উপর মানসিক চাপে আঘাত করা।
যেন তারা বলছে—"দেখো, আমরা না থাকলে তোমরা দুর্বল; আমরা না থাকলে তোমাদের কোনো শক্তি নেই।"
কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। তাদের অনুপস্থিতিই মুসলমানদের পরিচ্ছন্নতা; তারা দূরে সরে যাওয়ায় উহুদের বাহিনী হয়ে উঠল শুধু ঈমানদারদের বাহিনী। যুদ্ধে তাদের অনুপস্থিতি প্রমাণ করল—মুনাফিকদের বাহুতে শক্তি থাকলেও হৃদয়ে শক্তি নেই; তারা বাহিনীর সংখ্যা বাড়ায়, কিন্তু শক্তি বাড়ায় না; তাদের মুখ আল্লাহর নাম নেয়, কিন্তু হৃদয়ে আল্লাহর কোন নূর নেই।
উহুদ শুধু মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল না; এটি ছিল মুনাফিকদের আসল পরিচয় প্রকাশের মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্তে তাদের চেহারা এমন উন্মোচিত হয়েছিল যে এরপর মদিনার কোনো মুমিনই আর তাদের ওপর ভরসা করেনি।

কুরাইশদের চালবাজি :-

উহুদের পথে বের হওয়ার পর থেকেই কুরাইশ বাহিনীর নেতারা বুঝেছিল যে সরাসরি যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল ভাঙা সহজ হবে না। তাই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগেই নানা ধরনের ছল-চাতুরী, মানসিক কৌশল এবং রাজনৈতিক চাল তৈরি করতে থাকে। এসব কৌশল ছিল মুসলমানদের আতঙ্কিত করা, বিভক্ত করা এবং ভিতরে ভিতরে সন্দেহ ও ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই।

১. যুদ্ধের আগেই মুসলমানদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা
মক্কা থেকে বের হয়ে কুরাইশদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান বোঝাতে লাগল—এবার তারা বদরের প্রতিশোধ নিতেই এসেছে। পথে পথে তারা এমন বার্তা ছড়াতে লাগল যে, এই বাহিনী এত বড় ও এত শক্তিশালী যে কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের মনোবল যাতে যুদ্ধের আগেই নরম হয়ে যায়—এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

২. মদিনায় পৌঁছেই গুপ্তচর প্রেরণ- উহুদের সংলগ্ন এলাকায় এসে তারা নিজেদের গুপ্তচরদের বিভিন্ন জনপদে পাঠায়। খবর সংগ্রহ করতে থাকে—মুসলমানদের সংখ্যা কত, কৌশল কী, নবিজি ﷺ কোন অবস্থান নিতে পারেন। তাদের গোয়েন্দারা রাতের

অন্ধকারে মুসলিম বাহিনীর গতিবিধিও লক্ষ্য করত। যুদ্ধের আগেই শত্রুর শক্তি-দুর্বলতা জেনে নেওয়া ছিল তাদের প্রধান কৌশলের অংশ।

৩. বাহিনীর সামনে নারীশক্তি—এক মানসিক যুদ্ধনীতি। কুরাইশরা যুদ্ধে নারী নেওয়ার প্রথা আগে খুব ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মক্কার বিখ্যাত নারীদের আনল—হিন্দা, উম্মে হাকিম, ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ প্রমুখ।

লক্ষ্য ছিল তিনটি—

যুদ্ধে পালাতে গেলে নারীরা তাদের অপমান করবে। পুরুষদের উন্মত্ত করে তুলবে। মুসলমানদের মনে এক ধরণের ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। এই নারীরা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, কবিতা পড়ে, শাপ-শাপান্ত করে কুরাইশ সৈন্যদের উত্তেজিত করতে থাকে।

৪. মুনাফিকদের দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে দুর্বল করার চক্রান্ত। কুরাইশরা জানত—মুসলমানদের ভেতরেও কিছু লোক আছে যারা অন্তরে নবিজির প্রতি আনুগত্য রাখে না। এদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ ছিল। যুদ্ধের আগের রাতেই তারা এমন বার্তা পৌঁছায় যে—

"মদিনায় থেকে লাভ কী? তোমাদের নেতা তোমাদের কথাই শোনে না। যুদ্ধ হলে সবাই মারা যাবে।"

এ আবহ সৃষ্টি করতে করতে শেষ পর্যন্ত, আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ৩০০ লোক নিয়ে বাহিনী থেকে সরে দাঁড়ালো।

কুরাইশদের এই চাল সফলও হলো—মুসলিম বাহিনী মুহূর্তেই এক-তৃতীয়াংশ কমে গেল।

৫. যুদ্ধভূমির অবস্থান নির্ধারণে প্রতারণামূলক ফাঁদ। কুরাইশরা এমনভাবে নিজেদের বাহিনী সাজায় যাতে উহুদ পর্বতের ঢাল ও মদিনার দিক দুটিই তাদের সুবিধায় আসে। প্রথমে তারা এমন ভান করে যে তারা সমতলভূমিতেই যুদ্ধ করবে। কিন্তু মুহূর্তেই কৌশল বদলে তাদের অশ্বারোহী ও ধনুকধারীদের পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রাখে। এই চাল তারা সফলভাবে ব্যবহার করল—

যখন মুসলিম তীরন্দাজরা স্থান ত্যাগ করল, তখন লুকানো অশ্বারোহীরা পাহাড়ের পেছন দিয়ে মুসলমানদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়।

৬. যুদ্ধের ভেতর আরেক চাল—মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে গুজব ছড়ানো। যুদ্ধের মাঝামাঝি কুরাইশদের একটি দল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘোষণা করতে থাকে—

“মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন!”এই গুজব মুহূর্তেই মুসলমানদের সারিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মনে করে যুদ্ধ শেষ। গুজব রটানোর এই কুরাইশ কৌশল মুসলিম বাহিনীর মুহূর্তের মনোবল ভেঙে দেয়।

৭. শহীদদের মরদেহ বিকৃতি—মুসলমানদের ভীতি ছড়ানো যুদ্ধ শেষে তারা শহীদদের মরদেহ বিকৃত করতে থাকে—নাক-কান কেটে ফেলা, তীর ভরা, বুকে আঘাত করা ইত্যাদি। এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল—আগামীতে মুসলমানরা যেন যুদ্ধের কথা শুনলেই ভয় পায়। হিন্দা হামজাহ রা.-এর মরদেহ বিকৃত করে প্রতিশোধ নেওয়া—এই ঘৃণ্য কৌশলেরই অংশ।

ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড় :

- উহুদ যুদ্ধের শুরুটা ছিল মুসলমানদের অনুকূলে—কিন্তু একটি সিদ্ধান্ত, কয়েক মুহূর্তের ভুল, আর কুরাইশদের চালাক কৌশল যুদ্ধের পুরো পরিস্থিতিকে উল্টে দেয়। সেই মোড় ঘুরে যাওয়ার ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে এভাবে ঘটে—

উহুদের ঢালে মুসলিম তীরন্দাজরা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে পাহাড়ের ঢাল রক্ষা করছিলেন। প্রথম ধাক্কায় কুরাইশরা পিছিয়ে পড়ে। মুসলমানরা যখন শত্রুশিবিরে অগ্রসর হতে থাকে, তখন দেখা যায় মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে অনেক সাহাবি মনে করলেন—যুদ্ধ শেষ, বিজয় নিশ্চিত, এখন লুটের মাল সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদিও তীরন্দাজদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—রাসূল ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে নামা যাবে না।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সাফল্য দেখে তীরন্দাজদের অধিকাংশই নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করলেন। মাত্র কয়েকজন সেখানে থেকে গেলেন। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-নীতিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ—যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন পাহাড়ের সেই পথফাঁকা হয়ে গেছে। মুহূর্তেই তিনি ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে সেই ফাঁক দিয়ে আক্রমণ করলেন।

এই আক্রমণ মুসলমানদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সামনের দিক থেকে মুসলমানরা এগোচ্ছিল বিজয়ের উচ্ছ্বাসে, কিন্তু পিছন থেকে হঠাৎ চেপে বসলো শক্তিশালী অশ্বারোহীরা। দুই দিকের চাপা আক্রমণে সারি ভেঙে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। কুরাইশদের পরাস্ত যোদ্ধারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় শত্রুপক্ষের হাতে।

এই বিশৃঙ্খলার ভেতর গুজব ছড়িয়ে পড়ে—রাসূল ﷺ শহীদ হয়েছেন। অনেক সাহাবির মন ভেঙে যায়, কেউ লড়াই থামিয়ে বসে পড়েন; কেউ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। শত্রুদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়। যেসব সাহাবি দৃঢ় ছিলেন তারা ছুটে যান রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করতে। সেই সময় নবিজি ﷺ-ও আঘাতপ্রাপ্ত হন; তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়, দাঁত ভেঙে যায়, হেলমেটের কাঁটা গেঁথে যায় গালে।

যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি বদলে যাওয়ার মূল কারণ ছিল—তীরন্দাজদের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া এবং খালিদ ইবনু ওয়ালিদের দ্রুত সুযোগ নেওয়া। শুরুতে যে যুদ্ধ মুসলমানদের বিজয়মুখী ছিল, শেষপর্যন্ত তা পরিণত হয় কঠিন পরীক্ষায়, ত্যাগে, এবং শিক্ষা ও সতর্কতার এক বিশাল ঘটনায়।

আহত ও নিহতদের অবস্থা

:- উহুদ যুদ্ধ শুরুতে মুসলিম বাহিনী প্রায় বিজয়ী অবস্থায় ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজে সামনের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু পাহারাদারদের অবাধ্যতা ও কিছু সাহাবির দুর্বলতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কুরাইশরা সুযোগ নিয়ে তাড়াতাড়ি আক্রমণ চালায়। সেই সময় মুসলিমদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হয়।

নিহতদের অবস্থা:

মুসলিম বাহীর মধ্যে প্রায় ৭০ জন সাহাবি শহীদ হন।

শহীদদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম:

হামজা ইবনে আবু উমাইয়া (নবীজির চাচা), যিনি সাহস ও শক্তির প্রতীক ছিলেন, কুরাইশ ও ইহুদিদের আক্রমণে নিহত হন। অন্যান্য শহীদরা ছিলেন সাহাবী যারা নবীজির সাথে প্রায়ই যুদ্ধ করতেন, যেমন: কাসিম ইবনে আবু জাহল ইত্যাদি। শহীদরা অধিকাংশ মাথায় বা বুকে তীর বা তলোয়ার আঘাতে প্রাণ হারান। তাদের মৃত্যু মুহূর্তটি ছিল চরম তীব্র এবং দুঃখজনক।

আহতদের অবস্থা:

বহু মুসলিম যোদ্ধা আহত হন। আহতরা বিভিন্ন ধরনের চোট পেয়েছিলেন: তীরের আঘাত, তলোয়ারের আঘাত, ঘা এবং পায়ে আঘাত। আহতদের মধ্যে অনেককে তখনই ময়দানে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। নবীজি নিজে আহতদের পাশে গিয়ে সাহস জোগাতেন। আহতদের কিছু কিছু দিক থেকে তীব্র অবস্থার কারণে কিছুদিন পর মারা যান।

মানসিক ও নৈতিক প্রভাব:

মুসলিমদের মধ্যে প্রথমে হতাশা দেখা দেয়, বিশেষ করে হামজা শহীদ হওয়ার পর। নবী মুহাম্মদ (সা.) আহতদের দেখভাল করার মাধ্যমে তাদের মনোবল বাড়ান। যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজ শোকগ্রস্ত হলেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ধরে রাখে। উহুদ যুদ্ধে আহত ও শহীদরা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বড় শিক্ষা হয়ে যায়: সাহস, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা।

শোকের মধ্যেও সুখ :

- পথিমধ্যে দাড়িয়ে আছেন হামনাহ বিনতু জাহশ। হঠাৎ তিনি শুনলেন কেউ একজন বলছে, "তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ শহীদ হয়েছেন।" মুহূর্তের জন্য তার চারপাশ যেন থমকে গেল। হারানো ভাইয়ের খবর শুনে হৃদয় ব্যথিত হলো, চোখে জল ভরলো, কিন্তু সেই সাথে একটি অদ্ভুত শান্তি অনুভূত হলো—কারণ তার ভাই আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন।

যুদ্ধের মাঠে মৃত্যুর দৃশ্য, আহত সাহাবীদের করুণ অবস্থা, আর চারপাশে বিশৃঙ্খলতার মাঝে, এই সংবাদ এক রকম আলোকবর্তিকা হয়ে উঠল। হামনাহ অনুভব করলেন, শোকের সঙ্গে সঙ্গে গর্বও তার হৃদয়ে ঢেউ খেলছে—তার ভাই আল্লাহর প্রিয় পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শহীদের মর্যাদা, আত্মত্যাগ এবং ঈমানের শক্তি—এসবের উপলব্ধি তাকে এক অদৃশ্য সুখের অনুভূতি দিচ্ছিল।

সে মুহূর্তে হামনাহ চোখে অশ্রু নিয়ে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন যে, তার ভাই এমন মহিমান্বিত মর্যাদায় পৌঁছেছেন। মনে মনে তিনি অনুরোধ করলেন, "হে আল্লাহ, আমার জন্যও তেমন ধৈর্য এবং বিশ্বাস দাও।" শোকের সঙ্গেও এক ধরনের শান্তি ও তৃপ্তি তার হৃদয়ে বাসা বাঁধল।

উহুদ যুদ্ধের সেই দিন, প্রত্যেক শহীদই কষ্টের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের খবর যখন পরিবারের কাছে পৌঁছাল, তখন শোকের মাঝে আনন্দও লুকিয়ে থাকে। কারণ তারা জানে, তাদের প্রিয়জন আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল অবস্থানে পৌঁছেছেন। এই অনুভূতি—শোক ও সুখের এক অদ্ভুত মিলন—ই ছিল সেই সময়ের একটি গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতা।

যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি, আহত সাহাবীদের চিৎকার, এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিশৃঙ্খলার মাঝেও হামনাহ অনুভব করলেন, যে প্রকৃত সুখ হলো ঈমান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে

বিশ্বাসের শক্তি। এই মুহূর্তে শোক এবং আনন্দ একসঙ্গে হৃদয়ে বিরাজ করল—এক গভীর শিক্ষণীয় বাস্তবতা যা যুদ্ধের করুণতা ও ইসলামের মূল্যবোধকে একই সঙ্গে প্রতিফলিত করে।

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ :-

উহুদ যুদ্ধের পরপরই যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে, তা হলো হামরাউল আসাদ অভিযান। এটিকে অনেক সময় "উহুদের পর দ্বিতীয় ধাক্কা" বা "নবিজির কৌশলগত পাল্টা-ব্যবস্থা" হিসেবেও বলা হয়। এই ঘটনা মূল উহুদ যুদ্ধের অংশ না হলেও তার সরাসরি ফলাফল এবং মুসলমানদের মনোবল পুনরুদ্ধারের এক অসাধারণ অধ্যায়।

উহুদের যুদ্ধ শেষ হলো—মুসলমানরা ক্লান্ত, আহত, অনেকে প্রিয়জন হারিয়েছেন। মক্কার কুরাইশ বাহিনীও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত; তবে তারা মনে মনে ভাবছিল, ফিরে গিয়ে আরও একবার আক্রমণ করলে হয়তো মদীনাকে সম্পূর্ণভাবে দমিয়ে রাখা যাবে। আবু সুফিয়ান যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ার সময়ই এই কথাটি ইঙ্গিত দিয়েছিল—"আগামী বছরে আবার দেখা হবে বদরের মেলায়!"

এই সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ খবর পেলেন যে, কুরাইশরা হয়তো মাঝপথেই ফিরে এসে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে পারে। এমন অনিশ্চয়তায় তিনি সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন—যারা উহুদের যুদ্ধ শেষে প্রাণ হাতে করে ফিরেছেন, যারা আহত-শ্রান্ত—ঠিক সেই সময়ই নবিজি ﷺ ঘোষণা দিলেন:

"যারা আজ আমাদের সাথে ছিল, শুধু তারাই আমার সঙ্গে বের হবে।"

এই কথা ছিল এক বিরল পরীক্ষার ঘোষণা। অনেক সাহাবি তখন রক্তাক্ত, কারো হাঁটতে কষ্ট, কারো শরীর ব্যথায় নড়াচড়া করা দায়—তবুও তারা নবিজির আহ্বানে সাড়া দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ নয় বরং কুরাইশকে বুঝিয়ে দেওয়া—মুসলমানরা ভেঙে পড়েনি, তারা এখনও শক্ত অবস্থানে আছে।

উহুদের যুদ্ধের পরদিনই নবিজি ﷺ প্রায় সত্তরজন সাহাবিকে নিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানের দিকে রওনা হন। পথে একদিকে ছিল পাহাড়ি এলাকা, অন্যদিকে শুষ্ক প্রান্তর; বাতাসে তখনও যুদ্ধের গন্ধ। সাহাবিরা নিজেদের ক্লান্তি, ক্ষতচিহ্ন, ব্যথা—সব ভুলে এগিয়ে চললেন। তারা যখন হামরাউল আসাদ পৌঁছে তাঁবু খাটাল, তখনই এলাকাজুড়ে খবর ছড়িয়ে গেল—মুহাম্মদের বাহিনী আবার প্রস্তুত হয়েছে, তারা যুদ্ধভীত বা দুর্বল নয়।

এদিকে কুরাইশরা মাঝপথে একটি সংবাদদাতার কাছ থেকে শুনল—মুহাম্মদের বাহিনী উহুদের থেকেও অধিক দৃঢ় হয়ে বেরিয়েছে। তারা এক মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিল: ফিরে গেলে আবার ভয়াবহ লড়াই হতে পারে। ফলে তারা মক্কার পথে ফিরে চলে গেল এবং দ্বিতীয় আক্রমণের চিন্তাই ত্যাগ করল।

এই পুরো অভিযানে কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি, তলোয়ারও তোলার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু মুসলমানদের মনোবল, সাহস, দৃঢ়তা—সবকিছু আবার জেগে উঠল। উহুদের ক্ষত বিক্ষত মুহূর্তে এই অভিযান ছিল যেন মনোবলের পুনর্জন্ম। নবিজি ﷺ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে মদীনায় ফিরে এলেন। আরবজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল খবর: "মদীনাকে দুর্বল ভাবা যাবে না; মুহাম্মদের বাহিনী এখনও অদম্য।"

হামরাউল আসাদ অভিযান তাই শুধু সামরিক কৌশল নয়; এটি সাহাবিদের ঈমানের দৃঢ়তা, নবিজির নেতৃত্ব, এবং কঠিন মুহূর্তে শত্রুকে মানসিকভাবে পরাস্ত করার এক অনন্য উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺহামরাউল আসাদে পৌঁছেছিলেন রবিবার। তার সুন্নাহ মাফিক সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। এরপর বুধবার ফিরে এলেন মদিনায়। দিনটি ছিল শাওয়ালের ১১তারিখ।

উহুদ পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা :

হৃদয়বিদারক বনু রাযীর ঘটনা :-

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযাল' এবং 'ক্বারাহ' গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করে যে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ইসলামের চর্চা রয়েছে। কাজেই, কুরআন ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে পাঠালে ভাল হয়। সে মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের মতে ছয় জন এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে দশ জন সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ইবনে ইসহাক্বের মতে মুরশেদ বিন আবূ মুরশেদ গানাভীকে এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে 'আসিম বিন উমার বিন খাত্তাবের নানা 'আসিম বিন সাবেতকে এ দলের নেতৃত্বে প্রদান করা হয়। এরা যখন রাবেগ এবং জেদ্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোযাইল গোত্রের 'রাযী' নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছান তখন

আযাল এবং ক্বারাহর উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ হুযাইল গোত্রের শাখা বানু লাহয়ানকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়।

এ গোত্রের একশত তীরন্দাজ তাঁদের অনুসন্ধান করতে থাকে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে তাদের পেয়ে যায়। সাহাবাগণ একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বনু লাহয়ান তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পর বলতে থাকে, 'তোমাদের সঙ্গে এ মর্মে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে তোমরা যদি নীচে নেমে আস তাহলে আমরা কাউকেও হত্যা করব না। 'আসিম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন শাহাদতবরণ করেন। জীবত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খুবাইব (রাঃ), যায়দ বিন দাসিন্নাহ (রাঃ) এবং আরও একজন। আবারও বনু লাহয়ান তাদের ওয়াদা পুনর্ব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা

ভঙ্গ করে ধনুকের ছিলা দ্বারা তাঁদের বেঁধে ফেলে। অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃতীয় সাহাবী তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তারা তাঁকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব (রাঃ) এবং যায়দ বিন দাসিন্নাহকে (রাঃ) মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'দু' রাকআত সালাত পড়ার জন্য সময় ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম

ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন,

(اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا)

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।

এ কথার পর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

অর্থ: আমার শত্রুগণ তাদের দলবল ও তাদের গোত্রসমূহকে আমার চারদিকে একত্রিত করেছে এবং তাদের সকলেই এক স্থানে একত্রিত হয়েছে।

তারা আমার হত্যার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য তাদের সন্তান-সন্ততি এবং নারীদেরকেও একত্রিত করেছে। আর আমাকে হত্যা করার জন্য প্রকান্ড ও সুদৃঢ় এক খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

অর্থঃ হে আরশের মালিক (আল্লাহ)! আমাকে হত্যার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তারা যা করতে চায় তুমি আমাকে তাতে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দান কর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমার মাংসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার নিরসন ঘটাবে।

আমাকে হত্যার পূর্বে কুফরী গ্রহণ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ তারা দিয়েছিল, কিন্তু কুফরী গ্রহণ না করে ধর্মের পথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি। তখন আমার নয়ন যুগল বিনা অস্থিরতায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে আমি অস্থির হই নি, বরং তাদের অন্যায় আচরণ ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে আমার নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়েছে।

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلٰى أَيِّ جَنْبٍ كَان لِلهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমি যখন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর পথে কাফিরদের হাতে নিহত হচ্ছি তখন আমার হত্যা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।

আমি জানি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার মৃত্যু হচ্ছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার শরীরের বিখন্ডীকৃত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই বরকত দান করতে পারেন।'

এরপর খুবাইব (রাঃ)-কে আবূ সুফইয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজনসহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটাই তো সহনীয় নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাঁটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'

এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু 'আমির বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল উক্কবাহ বিন হারিস। খুবাইব (রাঃ) তার পিতা হারিসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, খুবাইব (রাঃ) সর্বপ্রথম সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হত্যার মুহূর্তে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল, অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়দ বিন দাসিন্নাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরাইশগণ 'আসিম (রাঃ)-এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সনাক্ত করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দুরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। 'আসিম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। উমার যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।

বীরে মাউনার ঘটনা :-

যে মাসে রাযী এর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বি'রে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযী'র ঘটনার চাইতেও কঠিন ও বেদনাদায়ক।

এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবূ বারা' 'আমির বিন মালিক যিনি 'মুলায়েবুল আসিন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে ইসলামের

দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে (রাঃ) নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ) 'নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি।'

আবূ বারা' বললেন, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।'

এ কারণে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে ৪০ জন এবং সহীহুল বুখারীর তথ্য মোতাবেক ৭০ জন সাহাবাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে প্রেরণ। ৭০ জনের সংখ্যাটি সঠিক বলে প্রমাণিত। মুনযির বিন আমিরকে (বনু সায়েদা গোত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল এবং 'মু'নিক লিইয়ামূত' (মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবাবৃন্দ (রাঃ) ছিলেন বিজ্ঞ, ক্বারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দন্ডায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ কূপটি বনু 'আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।
সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ (রাঃ) উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্রসহ আল্লাহর শত্রু 'আমির বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, 'আল্লাহর মহান! কাবার প্রভূর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।'

এরপর পরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (রাঃ) আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহবান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবূ বারা'র আশ্রয়ে

ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহবানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সুলাইমকে আহবান জানাল। বুন সুলাইমের তিনটি গোত্র উমাউয়া, রে'ল এবং যাকওয়ান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। কেবলমাত্র কা'ব বিন যায়দ (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাছাড়া আরও দু'জন সাহাবী- 'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এবং মুনযির বিন উক্কবা বিন আমির (রাঃ) উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর মুনযির তাঁর বন্ধুগণের সংখ্যা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করেন। 'আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয়ে যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে- যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল- তাঁকে মুক্ত করে দেয়।
আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এ বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদাত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) প্রত্যাবর্তন কালে কানাত উপত্যাকার প্রান্তভাবে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করেন। বনু কিলাব গোত্রের দু' ব্যক্তিও তথায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা উভয়েই যখন ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন 'আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদের হত্যা করে তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অথচ তাদের দু' জনের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু 'আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তা জানতেন না। কাজেই, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করেন তখন তিনি বললেন যে, (لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيْلَيْنِ

لَأُدِيَنَّهُمَا) ‘তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে করতে হবে।’ এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম এবং তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের নিকট থেকে শোনিত পাতের খেসারত একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই পরিণামে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

মা’উনাহ এবং রাযী’র উল্লেখিত বেদনা-দায়ক ঘটনাবলীতে যা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এ পরিমাণ চিন্তিত ও মর্মাহত হন যে, যে সকল গোত্র ও সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা ক’রে সাহাবীগণকে (রাঃ) হত্যা করে নাবী কারীম (ﷺ) এক মাস যাবৎ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সমীপে বদ দু‘আ করতে থাকেন। তিনি ফজরের সালাতে রে’ল যেকওয়ান, লাহইয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্-দোয়া করেন এবং বললেন যে, عُصَيَّةُ) عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ) ‘উসাইয়া আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী করেছে।’

আল্লাহ তা‘আলা সে সম্পর্কে স্বীয় নাবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তী কালে মানসুখ হয়ে যায়। সেই আয়াত ছিল এইরূপ- بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقِيْنَا رَبَّنَا) فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ) ‘আমার সম্প্রদায়কে এ কথা বলে দাও যে, আমরা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমারও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুনুত পাঠ করা ছেড়ে দেন।

বনু নাজিরের যুদ্ধ :

- উহুদ যুদ্ধে পরবর্তী সময়ে বনু নাজিরের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনা ইসলামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। উহুদ যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশরা শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিল, আর মুসলমানরা এখন পর্যন্ত যুদ্ধের ধাক্কা সামলে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করছিল। বনু নাজিরের ঘটনাটি সেই প্রেক্ষাপটে ঘটে।

বিস্তারিতভাবে বলা যায়, বনু নাজির মূলত ইয়াহুদি উপজাতি ছিল, যারা মদিনায় বসবাস করত। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছু পরাজয়ের পরে, তারা নবী মুহাম্মদের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা কুরাইশদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, যাতে মুসলমানদের ক্ষতি করা যায়।

মুহাম্মদ (সা.) যখন বনু নাজিরের ষড়যন্ত্র জানতে পারলেন, তখন তিনি শান্তিপূর্ণভাবে পরিস্থিতি সমাধান করার চেষ্টা করলেন। মুসলমানরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল না, বরং তাদেরকে শহর থেকে নির্বাসিত করা হলো। নবী (সা.) তাদেরকে নিরাপদে শহর থেকে বের করে দিলেন, যাতে কোনো রক্তপাত না হয়। তবে, এই ঘটনা মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এটি তাদেরকে সতর্ক করে দেয় যে, বিশ্বাসঘাতকতা কখনোই নির্দিষ্ট কোনও দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বনু নাজিরের পরবর্তী অবস্থান এবং মক্কার সাথে তাদের যোগসূত্র মুসলমানদের নিরাপত্তা নীতি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ঘটনা মুসলমানদের জন্য শক্তি, ধৈর্য্য এবং নৈতিক উচ্চতার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসে সংরক্ষিত থাকে।

খন্দকের যুদ্ধ :

যুদ্ধের সূচনা :

- উহুদের পর মদীনায় মুসলিম রাষ্ট্র ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে কুরাইশরা উহুদের আংশিক জয়ের পরও তাদের মূল লক্ষ্য—মদীনা ধ্বংস—অর্জন করতে পারেনি। ঠিক এই সময়েই মদীনার কিছু ইহুদি গোত্র, বিশেষ করে বনু নাদীরের নেতা হুইয়্যি ইবনু আখতাব, মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। বনু নাদীরকে নির্বাসিত করার পর তারা খায়বারে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার বৃহত্তর পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে।

হুইয়্যি ইবনু আখতাব এবং তার সঙ্গীরা প্রথমে মক্কায় যায়। সেখানে তারা আবু সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতাদের কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃহৎ জোট গঠনের আহ্বান জানায়। তারা কুরাইশদের বুঝিয়ে বলে—"এই মুহূর্তে আক্রমণ করলে মুহাম্মদ ﷺ-কে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।" মক্কাবাসীরা এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। ফলে মুসলমানবিরোধী একটি অভূতপূর্ব জোট তৈরি হলো।

এরপর বনু নাদীরের প্রতিনিধিরা গেল গাতফান, বনি আসাদ, বনি সুলাইমসহ আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে। আরব গোত্রীয় বৈরিতা, লোভ, এবং দীর্ঘদিনের মুসলিম-বিদ্বেষ তাদের একত্র করলো। শত্রুদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ হাজারেরও বেশি সৈন্যের একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী তৈরি হয়—যা সে সময় আরবে অকল্পনীয়।

মদীনায় যখন খবর পৌঁছাল যে বিভিন্ন গোত্র বিশাল বাহিনী নিয়ে একত্র হয়েছে, তখন পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ হয়ে উঠল। নবিজি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ঠিক তখনই সলমান ফারসি (রাঃ) ইরানে প্রচলিত এক সামরিক কৌশল—শহরের দুর্বল দিক ঘিরে খন্দক খনন—প্রস্তাব করেন। মদীনার উত্তর দিকটি ছিল উন্মুক্ত, সেখানেই আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রশস্ত খন্দক খনন শুরু হলো। নবিজি ﷺ নিজেও সাহাবিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি কাটলেন, ঠাণ্ডা বাতাস আর ক্ষুধার কষ্ট সত্ত্বেও সবাই প্রাণপণ পরিশ্রম করলেন।

এভাবেই শুরু হলো ইসলামের অন্যতম কঠিন ও নাটকীয় যুদ্ধ—খন্দকের যুদ্ধ (গযওয়াতুল আহযাব)। এটি ছিল শুধু সামরিক লড়াই নয়; বরং ধৈর্য, কৌশল, ঐক্য ও আল্লাহর ওপর ভরসার এক অনন্য পরীক্ষা।

শুরু হলো পরিখা খনন :-

উহুদের পর মদিনাকে সম্পূর্ণভাবে আক্রমণ করার জন্য কুরাইশ ও তাদের মিত্র গোত্রগুলো বিশাল এক যৌথ বাহিনী নিয়ে প্রস্তুতি নেয়। এ খবর যখন মদিনায় পৌঁছে, তখন নবিজি ﷺ সাহাবাদের পরামর্শ সভা ডাকেন। সভায় পারস্য বীর সালমান আল-ফারসী (রাঃ) একটি অভূতপূর্ব পরামর্শ দিলেন—

"ইরানে আমরা আক্রমণ প্রতিহত করতে শহরের চারপাশে বড় পরিখা খনন করি।"

এর আগে আরবদের মাঝে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। নবিজি ﷺ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং মদিনার সেই দিকটায় পরিখা খননের নির্দেশ দেন, যেদিক দিয়ে বাহিনী প্রবেশ করতে পারে।

শুরু হলো পর্বতসম কঠিন এক কাজ। শীতকাল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, খাবার সংকট—সাহাবিরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামলেন কাজে। নবিজি ﷺ নিজে শাবল হাতে কাঁধে মাটি তুলছেন, পাথর ভাঙছেন, দলের সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন—

এ যেন রাষ্ট্রনেতা, সৈনাপতি ও সাধারণ কর্মীর একীভূত রূপ।

সাহাবিদের দলগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় ভাগ হয়ে গেল। প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী মাটি কাটছেন, কেউ মাটি তুলছেন, কেউ ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলে দিচ্ছেন। ক্ষুধায় পেট শুকিয়ে এলেও মুখে ছিল ঈমানের দীপ্তি।

একসময় একটি বিশাল পাথর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কেউ সেটি নড়াতে পারছিল না। খবর দেওয়া হলো নবিজি ﷺ–কে। তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন শাবল দিয়ে প্রথম আঘাত করতেই আগুনের মতো আলো বের হলো। নবিজি ﷺ বললেন:

"আল্লাহ আমাকে ইয়েমেনের বিজয় দেখালেন।"

দ্বিতীয় আঘাতে আবার আলো বের হলো—

"আল্লাহ আমাকে শামের বিজয় দেখালেন।"

তৃতীয় আঘাতে পাথরটি ভেঙে গেল—

"আল্লাহ আমাকে পারস্যের বিজয় দেখালেন।"

ক্ষুধার্ত সাহাবিদের জন্য এটি শুধু একটি পাথর ভাঙা নয়, বরং ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল আশার প্রতিশ্রুতি।

অল্প খাবারে হাজার জন :-

খন্দক খননের দিনগুলো ছিল তীব্র ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড পরিশ্রম আর ভয়াবহ ক্ষুধার। মদিনা যেন ক্লান্ত মানুষের শহর—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই পরিখা খুঁড়ছে, শত্রু মুহূর্তে এসে পড়বে এই ভয়ে পাহারা দিচ্ছে, আর ক্ষুধার জ্বালা যেন ভিতরটা ক্ষয় করে দিচ্ছে। এমন সময়ে সাহাবিদের অনেকেই পেটে পাথর বেঁধে কাজ করতেন, যাতে ক্ষুধা একটু সামলে নেয়া যায়। তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করতেন না, শুধু বলতেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি।" অথচ নবিজি ﷺ-এর নিজের পেটেও একটির বদলে দুইটি পাথর বাঁধা ছিল। তিনি যে কত বড় কষ্টে ছিলেন, তা সাহাবিরা দেখলেই চোখ ভিজে উঠত।

ঠিক একদিন, খন্দকের শ্রম আর ক্লান্তির মাঝে জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. নবিজিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে বললেন, "নবিজি ﷺ খুব ক্ষুধার্ত। ঘরে যে সামান্য খাবার আছে, তা দিয়ে আমরা অন্তত তাঁকে আপ্যায়ন করি।" বাড়িতে ছিল একটি ছোট ছাগলছানা আর সামান্য যবের আটা। তারা দুজনে মিলেই ছাগলটি জবেহ করলেন, হাড়ভাঙা কষ্টে কিছু মাংস রান্না করলেন,

আর যব দিয়ে সামান্য রুটি প্রস্তুত করলেন। জাবিরের মনে তখনও মনে হচ্ছিল—এত সামান্য জিনিস হয়তো নবিজি ﷺ ও তাঁর দুই-একজন সঙ্গীর জন্যই যথেষ্ট হবে।

জাবির রা. লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে আস্তে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘরে সামান্য খাবার প্রস্তুত হয়েছে... আপনি ও কয়েকজন সাথী যদি দয়া করে আসতেন..."। তিনি চেয়েছিলেন বিষয়টা গোপন থাকুক। কিন্তু নবিজি ﷺ-এর স্বভাব তো সর্বদা উদারতা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। তিনি জোরে ডাক দিলেন—"হে খন্দকবাসী! চলুন, জাবিরের ভোজে যাই!"

জাবির তো হতবাক! তিনি দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে বললেন, "রাসূল ﷺ পুরো বাহিনীকে নিয়ে আসছেন!" স্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করলেন—"আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। নবিজি ﷺ আমাদের খাবার নষ্ট হোক—এমন হতে দেবেন না। তিনি যা করছেন, নিশ্চয় আল্লাহর ওপর ভরসা করেই করছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে এসে প্রথমেই হাঁড়ির ঢাকনা খুলতে বারণ করলেন। তিনি বরকতের জন্য দোয়া করলেন, খাবারের ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া নামালেন। তারপর বললেন, "রুটি বানাতে থাকো, আর হাঁড়ি থেকেও খাবার পরিবেশন বন্ধ করো না—বাসন ভরো, কিন্তু ঢাকনা তুলবে না।" অতঃপর একদল সাহাবি ঢুকলেন, খেলেন, বের হয়ে গেলেন... তারপর পরের দল। এভাবে দল বেঁধে আসতে থাকলেন—দশজন, কুড়িজন, চল্লিশজন... অবশেষে সমগ্র এক হাজার সাহাবি পেট ভরে খেলেন। ভিতরে যে ছোট ছাগলছানা ছিল, সে যেন শেষই হচ্ছিল না; হাঁড়িতে মাংসও কমছিল না, রুটির আটা ফুরোচ্ছিল না।

বাড়িটি ভরে উঠেছিল তাকবিরে, বিস্ময়ে, অশ্রুভেজা ঈমানী অনুভূতিতে। সবাই বুঝতে পারলেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক খাঁটি মু'জিজা, এক অসীম বরকত। ক্ষুধার্ত যোদ্ধারা তৃপ্ত হয়ে বের হচ্ছেন, আবার পরিখায় ফিরে গিয়ে নবিজি ﷺ-এর সাথে কাজ করছেন নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে।

দিনশেষে দেখা গেল—যে খাবার এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিল, তা দিয়ে পুরো মুসলিম বাহিনী খেয়েছে, তবুও হাঁড়ি ভরতেই আছে। জাবির রা. ও তাঁর স্ত্রী চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন—এ তো কোনো মানবিক প্রচেষ্টার ফল নয়; এটি সেই স্রষ্টার দান, যিনি ক্ষুধার্ত উম্মতকে তাঁর প্রিয় নবির দোয়ার বরকতে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

এভাবেই খন্দকের যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়েও আল্লাহ তাআলা তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত সাহাবিদের শক্তি দিয়ে আবারও পথ দেখালেন। তারা ফিরে গেলেন পরিখার শীতল বাতাসে, হাতে কোদাল, মনে অটল ঈমান—কারণ তাদের প্রাণে তখনো তাজা হয়ে বাজছিল সেই অনুভব—"আমাদের রব আমাদের যথেষ্ট।"

ঈমান ও নিফাক

:- মদীনার চারদিকে যখন বিশাল জোটবদ্ধ শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে আসে, তখন মুমিনদের ঈমানের শক্তি ও মুনাফিকদের নিফাকের কালো চেহারা একই ময়দানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খন্দক খননের দিনগুলোতে ঠাণ্ডা, ক্ষুধা, কষ্ট—সবকিছু মুমিনদের জন্য ছিল ঈমানের পরীক্ষা। নবিজি ﷺ নিজ হাতে কোদাল চালান, পেটের সঙ্গে পাথর বেঁধে ক্ষুধা সহ্য করেন—এ দৃশ্য সাহাবিদের হৃদয়ে ঈমানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তারা বুঝে যায়, আল্লাহর রাসুল যদি কষ্টে তাদের সাথে থাকেন, তবে সত্যিই এ পথ আল্লাহর পথ।

অপরদিকে মুনাফিকরা শুরু থেকেই আলাদা এক অবস্থান নেয়। খন্দক খননের কষ্ট, শত্রুর আগমন, খাদ্যাভাব—এসবকে তারা ছড়িয়ে পড়ে হতাশা তৈরির উপায় হিসেবে। যখন চারদিক থেকে মদীনা অবরুদ্ধ হয়, তখন মুমিনরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়কে আরও দৃঢ় বিশ্বাসে ধরে রাখে, কিন্তু মুনাফিকদের অন্তর ভয় ও সন্দেহে ভরে ওঠে। তারা বলে বসে—"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তো আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!" তাদের চোখে শুধু বিপদ, অন্ধকার; ঈমানের আলো নেই।
সত্যিকার মুমিনদের অন্তরে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। খন্দকের ওপারে থেকে শত্রুর আক্রমণের শব্দ শোনা গেলেই তারা নবিজির পাশে দাঁড়িয়ে আরও দৃঢ় হয়। যেন প্রতিটি মুহূর্তে তারা আল্লাহর সাহায্যকে আরও কাছে অনুভব করে। এই সময়েই আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেন—শত্রুর সমাবেশ দেখে তাদের ঈমান বেড়ে যায়, তারা বলে—"এ তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সত্য প্রতিশ্রুতি।"
মুনাফিকরা সুযোগ খোঁজে যুদ্ধপালানোর। কেউ বলে—"আমাদের ঘর অসুরক্ষিত।" কেউ আবার গোপনে ইহুদি গোত্র বানু কুরায়যার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজেরা যুদ্ধ করবে না, অন্যদের মনোবল ভাঙবে—এটাই ছিল তাঁদের কাজ। খন্দকের পরিখা

পেরিয়ে শত্রুরা আক্রমণ করতে না পারলে তারা ব্যঙ্গ করে, অজুহাত দেয়, আর মুমিনদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

এই কঠিন দিনগুলোতে মুমিনদের ঈমান এবং মুনাফিকদের নিফাক যেন দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হয়। কঠিন সংকটে মুমিনরা প্রমাণ করে—আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করলে মন যেমন দৃঢ় হয়, তেমনি একতার বন্ধনও শক্ত হয়। আর মুনাফিকদের হৃদয় ভয়, সন্দেহ ও স্বার্থে আটকে যায়—তারা প্রতিটি পরীক্ষায় ভেঙে পড়ে। খন্দকের সেই অন্ধকার দিনে ঈমান ও নিফাকের এই বিপরীত অবস্থানই মদীনার সমাজকে স্পষ্ট করে দেয় কে আল্লাহর পথে সত্যিকারের সহযোদ্ধা, আর কে কেবল মুখের বুলি।

সম্মিলিত জোটের আক্রমণ

:- খন্দক খননের দিনগুলো ছিল তীব্র ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড পরিশ্রম আর ভয়াবহ ক্ষুধার। মদিনা যেন ক্লান্ত মানুষের শহর—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই পরিখা খুঁড়ছে, শত্রু মুহূর্তে এসে পড়বে এই ভয়ে পাহারা দিচ্ছে, আর ক্ষুধার জ্বালা যেন ভিতরটা ক্ষয় করে দিচ্ছে। এমন সময়ে সাহাবিদের অনেকেই পেটে পাথর বেঁধে কাজ করতেন, যাতে ক্ষুধা একটু সামলে নেয়া যায়। তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করতেন না, শুধু বলতেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি।" অথচ নবিজি ﷺ-এর নিজের পেটেও একটির বদলে দুইটি পাথর বাঁধা ছিল। তিনি যে কত বড় কষ্টে ছিলেন, তা সাহাবিরা দেখলেই চোখ ভিজে উঠত।

ঠিক একদিন, খন্দকের শ্রম আর ক্লান্তির মাঝে জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. নবিজিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে বললেন, "নবিজি ﷺ খুব ক্ষুধার্ত। ঘরে যে সামান্য খাবার আছে, তা দিয়ে আমরা অন্তত তাঁকে আপ্যায়ন করি।" বাড়িতে ছিল একটি ছোট ছাগলছানা আর সামান্য যবের আটা। তারা দুজনে মিলেই ছাগলটি জবেহ করলেন, হাড়ভাঙা কষ্টে কিছু মাংস রান্না করলেন, আর যব দিয়ে সামান্য রুটি প্রস্তুত করলেন। জাবিরের মনে তখনও মনে হচ্ছিল—এত সামান্য জিনিস হয়তো নবিজি ﷺ ও তাঁর দুই-একজন সঙ্গীর জন্যই যথেষ্ট হবে।

জাবির রা. লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে আস্তে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘরে সামান্য খাবার প্রস্তুত হয়েছে... আপনি ও কয়েকজন সাথী যদি দয়া করে আসতেন..."। তিনি চেয়েছিলেন বিষয়টা গোপন থাকুক। কিন্তু নবিজি ﷺ-এর

স্বভাব তো সর্বদা উদারতা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। তিনি জোরে ডাক দিলেন—"হে খন্দকবাসী! চলুন, জাবিরের ভোজে যাই!"

জাবির তো হতবাক! তিনি দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে বললেন, "রাসূল ﷺ পুরো বাহিনীকে নিয়ে আসছেন!" স্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করলেন—"আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। নবিজি ﷺ আমাদের খাবার নষ্ট হোক—এমন হতে দেবেন না। তিনি যা করছেন, নিশ্চয় আল্লাহর ওপর ভরসা করেই করছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে এসে প্রথমেই হাঁড়ির ঢাকনা খুলতে বারণ করলেন। তিনি বরকতের জন্য দোয়া করলেন, খাবারের ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া নামালেন। তারপর বললেন, "রুটি বানাতে থাকো, আর হাঁড়ি থেকেও খাবার পরিবেশন বন্ধ করো না—বাসন ভরো, কিন্তু ঢাকনা তুলবে না।" অতঃপর একদল সাহাবি ঢুকলেন, খেলেন, বের হয়ে গেলেন... তারপর পরের দল। এভাবে দল বেঁধে আসতে থাকলেন—দশজন, কুড়িজন, চল্লিশজন... অবশেষে সমগ্র এক হাজার সাহাবি পেট ভরে খেলেন। ভিতরে যে ছোট ছাগলছানা ছিল, সে যেন শেষই হচ্ছিল না; হাঁড়িতে মাংসও কমছিল না, রুটির আটা ফুরোচ্ছিল না।

বাড়িটি ভরে উঠেছিল তাকবিরে, বিস্ময়ে, অশ্রুভেজা ঈমানী অনুভূতিতে। সবাই বুঝতে পারলেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক খাঁটি মু'জিজা, এক অসীম বরকত। ক্ষুধার্ত যোদ্ধারা তৃপ্ত হয়ে বের হচ্ছেন, আবার পরিখায় ফিরে গিয়ে নবিজি ﷺ-এর সাথে কাজ করছেন নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে।

দিনশেষে দেখা গেল—যে খাবার এক পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিল, তা দিয়ে পুরো মুসলিম বাহিনী খেয়েছে, তবুও হাঁড়ি ভরতেই আছে। জাবির রা. ও তাঁর স্ত্রী চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন—এ তো কোনো মানবিক প্রচেষ্টার ফল নয়; এটি সেই স্রষ্টার দান, যিনি ক্ষুধার্ত উম্মতকে তাঁর প্রিয় নবির দোয়ার বরকতে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

এভাবেই খন্দকের যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়েও আল্লাহ তাআলা তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত সাহাবিদের শক্তি দিয়ে আবারও পথ দেখালেন। তারা ফিরে গেলেন পরিখার শীতল বাতাসে, হাতে কোদাল, মনে অটল ঈমান—কারণ তাদের প্রাণে তখনো তাজা হয়ে বাজছিল সেই অনুভব—"আমাদের রব আমাদের যথেষ্ট।"

বনু কুরাইযার স্পর্ধা :

- মদীনার চারদিকে যখন বিশাল জোটবদ্ধ শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে আসে, তখন মুমিনদের ঈমানের শক্তি ও মুনাফিকদের নিফাকের কালো চেহারা একই ময়দানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খন্দক খননের দিনগুলোতে ঠাণ্ডা, ক্ষুধা, কষ্ট—সবকিছু মুমিনদের জন্য ছিল ঈমানের পরীক্ষা। নবিজি ﷺ নিজ হাতে কোদাল চালান, পেটের সঙ্গে পাথর বেঁধে ক্ষুধা সহ্য করেন—এ দৃশ্য সাহাবিদের হৃদয়ে ঈমানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তারা বুঝে যায়, আল্লাহর রাসুল যদি কষ্টে তাদের সাথে থাকেন, তবে সত্যিই এ পথ আল্লাহর পথ।

অপরদিকে মুনাফিকরা শুরু থেকেই আলাদা এক অবস্থান নেয়। খন্দক খননের কষ্ট, শত্রুর আগমন, খাদ্যাভাব—এসবকে তারা ছড়িয়ে পড়ে হতাশা তৈরির উপায় হিসেবে। যখন চারদিক থেকে মদীনা অবরুদ্ধ হয়, তখন মুমিনরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়কে আরও দৃঢ় বিশ্বাসে ধরে রাখে, কিন্তু মুনাফিকদের অন্তর ভয় ও সন্দেহে ভরে ওঠে। তারা বলে বসে—"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তো আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!" তাদের চোখে শুধু বিপদ, অন্ধকার; ঈমানের আলো নেই।

সত্যিকার মুমিনদের অন্তরে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। খন্দকের ওপারে থেকে শত্রুর আক্রমণের শব্দ শোনা গেলেই তারা নবিজির পাশে দাঁড়িয়ে আরও দৃঢ় হয়। যেন প্রতিটি মুহূর্তে তারা আল্লাহর সাহায্যকে আরও কাছে অনুভব করে। এই সময়েই আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেন—শত্রুর সমাবেশ দেখে তাদের ঈমান বেড়ে যায়, তারা বলে—"এ তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সত্য প্রতিশ্রুতি।"

মুনাফিকরা সুযোগ খোঁজে যুদ্ধপালানোর। কেউ বলে—"আমাদের ঘর অসুরক্ষিত।" কেউ আবার গোপনে ইহুদি গোত্র বানু কুরায়যার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজেরা যুদ্ধ করবে না, অন্যদের মনোবল ভাঙবে—এটাই ছিল তাঁদের কাজ। খন্দকের পরিখা পেরিয়ে শত্রুরা আক্রমণ করতে না পারলে তারা ব্যঙ্গ করে, অজুহাত দেয়, আর মুমিনদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

এই কঠিন দিনগুলোতে মুমিনদের ঈমান এবং মুনাফিকদের নিফাক যেন দুনিয়ার সামনে উন্মোচিত হয়। কঠিন সংকটে মুমিনরা প্রমাণ করে—আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করলে মন যেমন দৃঢ় হয়, তেমনি একতার বন্ধনও শক্ত হয়। আর মুনাফিকদের হৃদয় ভয়, সন্দেহ ও স্বার্থে আটকে যায়—তারা প্রতিটি পরীক্ষায় ভেঙে পড়ে। খন্দকের

সেই অন্ধকার দিনে ঈমান ও নিফাকের এই বিপরীত অবস্থানই মদীনার সমাজকে স্পষ্ট করে দেয় কে আল্লাহর পথে সত্যিকারের সহযোদ্ধা, আর কে কেবল মুখের বুলি।

নাজুক পরিস্থিতি :-

খন্দকের যুদ্ধের দিনগুলোতে মদিনার আকাশ যেন বোঝাই হয়ে ছিল উত্তেজনা, আতঙ্কআর অনিশ্চয়তায়। শীতের কনকনে হাওয়া বইছে উত্তরের দিক থেকে। শরীর বিদ্ধ করা ঠান্ডা, ক্ষুধা, ক্লান্তি—সব মিলিয়ে মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছিল বড় কঠিন এক পরীক্ষা। তবুও পরিখার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ঠেকাতে সবার মনে ছিল একটাই কথা—এই শহরই আমাদের আশ্রয়, এই নবীই আমাদের প্রাণ।

কিন্তু পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। সম্মিলিত কুরাইশ–গাতাফান জোটের তীব্র উপস্থিতি, তাদের অব্যাহত চাপ, আর হাওয়া–বাতাসকে অবরুদ্ধ করা যুদ্ধের শব্দ—সব মিলিয়ে যেন জীবনটাই থমকে গিয়েছিল। দিন দিন খাদ্যশস্য কমে আসছে, গৃহস্থালির কাজ বন্ধ, রাতের ঘুম প্রায় উধাও। যারা দিনভর পরিখায় পাহারা দিচ্ছে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে তাদের সামনে খাবার বলতে সামান্য খেজুর আর পানির চেয়ে বেশি কিছু নেই।

তার ওপর শুরু হলো মুনাফিকদের চক্রান্ত। তারা ভেতর থেকে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছিল। কেউ কেউ এসে বলছিল, "এত বড় বাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আমাদের ঘরবাড়ি উন্মুক্ত পড়ে আছে, আমরা ফিরে যাই।" কেউ বলছিল, "এই পরিখা যে কাজ দেবে, তা মনে হয় না।"

নবিজি ﷺ জানতেন—এটাই মুনাফিকদের স্বভাব। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, তাদের ব্যাঘাত ততই বাড়বে।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভ্যন্তরীণ দুশ্চিন্তা তৈরি হলো তখন, যখন খবর এলো—মদিনার ভেতরে থাকা বনু কুরাইযা চুক্তিভঙ্গ করেছে। শুরুতে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। কারণ এই ইহুদি গোত্রের সঙ্গে স্পষ্ট চুক্তি ছিল—মদিনায় আক্রমণ হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবে না। কিন্তু আবু সুফিয়ানদের প্ররোচনায় তারা নীরবে সেই অঙ্গীকার ভেঙে দেয়। এই সংবাদ যখন মুসলমানদের কাছে পৌঁছালো, তখন যেন বুকের ভেতর অন্যরকম কাঁপুন ধরিয়ে দিল।

বাইরের শত্রু বিশাল, আর ভিতরে তৈরি হলো নতুন ফাঁক। সবাই উপলব্ধি করল—যদি কুরাইযারা তাদের পাশের অঞ্চল থেকে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, তবে মদিনা দুই দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। নবিজি ﷺ–এর মুখে তখন গভীর উদ্বেগের ছায়া। তিনি সাহাবাদের বোঝাচ্ছিলেন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। ধৈর্যধারণ করো।"

এই পরীক্ষার সময়ে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত সাহাবিদের ত্যাগ ও ঈমানের দৃঢ়তা। ক্ষুধার কণ্ঠ যেন ভেতর থেকে তীব্রভাবে চিৎকার করছিল। এমনকি নবিজি ﷺ–এর পেটেও পাথর বাঁধা। অনেক সাহাবিও তাই করেছেন। ঠান্ডায় শরীর জমে যাওয়া সত্ত্বেও তারা পরিখার ধারে দাঁড়িয়ে রাত কাটাচ্ছে।

দূর থেকে শত্রুর অশ্বারোহীরা পরিখার ভেতর নেমে আসার চেষ্টা করছে, আর মুসলমানরা নিক্ষেপ করছে ধনুক–বাণ, পাথর, বর্শা। পরিস্থিতি সত্যিই নাজুক—এক মুহূর্তের অসাবধানতা মানে শহরের দেয়াল ভেদ করে শত্রুর প্রবেশ।

উপরন্তু, একদিন হাওয়া এত তীব্র হয়ে উঠল যে শিবিরে দাঁড়ানো মশালগুলো নিভে গেল, তাঁবুগুলো কেঁপে উঠল, ঘোড়াগুলো অশান্ত হয়ে উঠল। শত্রুসৈন্যদের মনে হঠাৎ ভয় ও অস্থিরতা ছড়িয়ে গেল; কিন্তু মুসলমানরা তখনও জানত না সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে। সবকিছু এত অনিশ্চিত, এত উত্তেজনাকর ছিল যে প্রতিটি মুহূর্তে মনে হতো—এবার হয়তো যুদ্ধের রূপ পুরোপুরি বদলে যাবে।

এ সময় নবিজি ﷺ–এর নেতৃত্বই ছিল সবার ভরসা। তিনি সারারাত দোয়া করছেন, সাহাবাদের উদ্বুদ্ধ করছেন, আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখছেন। যারা মনোবল হারাচ্ছিল, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি দিচ্ছিলেন, বলছিলেন—"এ পরীক্ষার পরই আল্লাহ বিজয় দেবেন।"

এইভাবে খন্দকের যুদ্ধের দিনগুলো ছিল ভয়, দুর্ভিক্ষ, পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ ঈমানের মিলিত পরীক্ষার সময়। বাইরের হাজারো সশস্ত্র শত্রু ঘিরে রেখেছে, ভেতরে বিদ্রোহী গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর মুনাফিকরা অস্থিরতা বাড়িয়েছে—সব মিলিয়ে মদিনার অবস্থা সত্যিই ছিল সংকটময় ও নাজুক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছায়—সেই প্রবল ঝড়, সেই ভীতি, সেই আত্মবিশ্বাসহীনতা—সব মিলিয়ে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর মুসলমানরা বুঝতে পারে—অন্ধকার যত গভীর হোক, আল্লাহর নূর শেষ পর্যন্ত পথ দেখিয়েই দেয়।

:- মদিনার চারদিকে ধুলোর ঝড় বইছে, উত্তুরে বাতাস হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। এমন কঠিন সময়েই নবিজি ﷺ-এর প্রজ্ঞা আর কৌশলই মুসলমানদের রক্ষা করল। খন্দকের যুদ্ধ ছিল শক্তির নয়—বুদ্ধির, ধৈর্যের, এবং সময়কে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার যুদ্ধ। শত্রুর সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি; মুসলমান ছিল মাত্র তিন হাজার। সরাসরি লড়াইয়ে নামলে মদীনায় ধ্বংস নেমে আসত। তাই নবিজি ﷺ ঠিক করলেন—এই যুদ্ধ সরাসরি তলোয়ারে নয়, কৌশলে জেতা হবে।

ফারসী সাহাবি সালমান আল-ফারসী পরামর্শ দিলেন—মদিনার উন্মুক্ত দিকটিতে এক বিশাল পরিখা খনন করা হোক। আরবরা আগে কখনো যুদ্ধের কৌশলে এমন কিছু দেখেনি। তারা জানত না, লড়াইয়ের মাঠে কৌশলও তলোয়ারের মতো ধারালো হতে পারে।

পরিখা খুঁড়তে গিয়ে ছিল না পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, ছিল না পর্যাপ্ত খাবার। দিনভর পাথর-ধুলার সঙ্গে লড়াই করা মানুষগুলো ক্ষুধায় কাতর হলেও নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে থেকে এগিয়ে যেতে থাকল। তারা জানত—এই পরিখাই হবে বিজয়ের প্রথম ধাপ। আর যেটুকু খাবার ছিল, সেটাও আশ্চর্যভাবে সবার জন্য বরকতময় হয়ে গেল।

পরিখা খুঁড়ে মুসলমানরা এক অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। মদীনার সেই দিকটি একেবারে অতিক্রম-অযোগ্য হয়ে উঠল। কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। এত বড় বাহিনী নিয়ে এসেছে, কিন্তু সামনে এগোবার পথ নেই। তলোয়ার তুলে আক্রমণ করার সুযোগ নেই, হামলার জন্য উন্মুক্ত ময়দান নেই।

দিনের পর দিন শত্রুরা পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে রইল—হতাশ, ক্ষুব্ধ, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। তারা শুধু বুঝতে পারল—এই যুদ্ধ তাদের শক্তি দিয়ে জেতা যাবে না। নবিজি ﷺ-এর বিচক্ষণ পরিকল্পনা তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছে।

এরপর শুরু হল এক দীর্ঘ অপেক্ষা। রাতের তীব্র ঠান্ডায় মুশরিকদের মনোবল ভেঙে পড়ল। খাদ্য সংকট দেখা দিল। আর ঠিক সেই সময় আল্লাহ পাঠালেন শীতল বায়ুর প্রচণ্ড ঝড়—শত্রুর তাঁবু উপড়ে ফেলল, আগুন নিভিয়ে দিল, অস্ত্র ছড়িয়ে দিল। বিশাল বাহিনী আতঙ্কে মদীনা ছেড়ে পালাল।

এভাবে খন্দকের যুদ্ধ শক্তির নয়—কৌশলের, ধৈর্যের, ইমানের এক ইতিহাস হয়ে রইল। নবিজি ﷺ দেখিয়ে দিলেন—যুদ্ধ শুধু তলোয়ার চালানোর নাম নয়, সঠিক সময়

সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নামও বটে। ছোট একটি জাতি বিশাল এক জোটকে পরাস্ত করল শুধু প্রজ্ঞা আর পরিকল্পনার মাধ্যমে।

আল্লাহর সাহায্য

:- খন্দকের প্রান্তে দিন যত এগোতে লাগল, মুসলমানদের অবস্থা তত কঠিন হয়ে উঠছিল। শীতের তীব্রতা, ক্ষুধা, ক্লান্তি—সব মিলিয়ে তাদের মনোবল যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম। এর ওপর ছিল শত্রুসেনার বিশাল সমাবেশ। চোখ যতদূর যায়, শুধু অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত আরবের সম্মিলিত বাহিনী। মনে হচ্ছিল এই যুদ্ধ হয়তো আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। ঠিক এই কঠিন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে একের পর এক সাহায্য নেমে আসতে শুরু করল।

প্রথম সাহায্য আসে তাদের ভেতরের শক্তি ফিরে পাওয়ার মাধ্যমে। ক্লান্ত হাতে যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিল, সাহাবারা এমন বিশাল পাথরের সামনে দাঁড়ালেন, যা ভাঙা প্রায় অসম্ভব। নবী করিম (সা.) নিজে হাতুড়ি হাতে নিলেন। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো বের হয়ে এল। সেই আলোর সাথে যেন তাঁদের হৃদয়ে নেমে এলো আল্লাহর পক্ষের এক অদৃশ্য শক্তি—যা জানিয়ে দিল, এই যুদ্ধের পর ইসলাম সুদূরপ্রসারী বিজয় লাভ করবে। সাহাবারা নতুন উদ্দীপনায় আবার কাজে লেগে গেলেন। যুদ্ধ শুরু হলে শত্রুপক্ষ বারবার চেষ্টা করল খন্দক পার হওয়ার। তারা ভাবতেই পারেনি যে এত বড় প্রতিরোধ আছে। তাদের অহংকার বারবার ভেঙে যেতে লাগল। খন্দক তাদেরকে বিভ্রান্ত, দুর্বল এবং মনোবলহীন করে তুলল। শত্রুরা যেমনই আক্রমণ করতে চাইত, মুসলমানরা তাদের সামনে এমন স্থিরতা দেখাত যা তাদের ব্যাপকভাবে হতবাক করে দিত। এই ধৈর্য, এই স্থিরতা—এটি আল্লাহর সেই সাহায্য, যা দুর্বলদের বুকের ভেতর শক্তি ঢেলে দেয়।

সবচেয়ে বড় সাহায্য আসে সেই রাতে, যখন মদিনায় প্রচণ্ড ঠান্ডা আর অন্ধকারে শত্রুরা শিবির গেড়েছিল। মুসলমানরা ভীত, শত্রুরা ছিল ক্রোধান্বিত—মনে হচ্ছিল ভোর হলেই হয়তো বড় আক্রমণ নেমে আসবে। হঠাৎ রাতের নিরবতা চিরে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। বাতাসের শব্দ এমন ছিল যেন পাহাড় ভেঙে পড়ছে। ঝড়ের তাণ্ডবে শত্রুপক্ষের তাঁবু উড়ে যেতে লাগল, আগুন নিভে গেল, খাবারের পাত্র উলটে গেল, ঘোড়াগুলো ছুটোছুটি করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করল। শত্রুদের মনে ভয় চেপে বসলো—এ যেন মানুষের লড়াই না, বরং আকাশের লড়াই।

ঝড় থামার কোনও লক্ষণ নেই দেখে তারা বুঝতে পারল, এখানে থাকা অসম্ভব। তারা নিজেরাই প্রত্যাহার শুরু করল। যারা মুসলমানদের ধ্বংস করতে এসেছিল, তারাই নিজেদের সুরক্ষার জন্য পালাতে লাগল। মুসলমানরা দূর থেকে দেখল—শত্রুরা চলে যাচ্ছে, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য বাহিনী এসে তাদের তাড়িয়ে দিল।

অন্যদিকে মুসলমানদের হৃদয়ে এমন প্রশান্তি নেমে এলো, যা সাধারণ ঝড়-বৃষ্টির ফল নয়। যেন আল্লাহ নিজেই বলছেন—"তোমরা ধৈর্য ধরো, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি।"

এই সাহায্য শুধু বাহিরের ঝড়ে ছিল না; ভেতরের ভয়ভীতি মুছে যাওয়াতেও ছিল। যারা ক্ষুধা, শীত আর দুর্বলতার কারণে ভেঙে পড়ছিল, তারা আবার শক্তি ফিরে পেল। মনে হলো আল্লাহর ব্যবস্থার সামনে শত্রুর সব পরিকল্পনাই তুচ্ছ।

শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা একটি তীরও ছুঁড়ে যুদ্ধ জেতেনি; আল্লাহর সাহায্যই শত্রুপক্ষকে নিজেই পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। খন্দকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সবাই দেখল—কিছু মুহূর্ত আগেও যারা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য পাহাড়সম শক্তি নিয়ে এসেছিল, তারা এখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মরুভূমির দিকে পালাচ্ছে।

এভাবেই খন্দকের যুদ্ধ প্রমাণ করেছিল—সংখ্যায় বড় হলেই জয় নিশ্চিত নয়; যার সঙ্গে আল্লাহ, জয় তারই।

মুসলমানরা বুঝল, আল্লাহর সাহায্য কখনো দেরি হয় না—সময়মতো এসে সব বদলে দেয়।

বনু কুরাইযার যুদ্ধ :

মিশন বনু কুরাইযা

:- খন্দকের যুদ্ধ শেষ হতেই পরিস্থিতি তখনো ক্লান্তিকর। মুসলমানরা দিন-রাত পরিখা পাহারা দিয়ে এবং যুদ্ধ লড়ে প্রচণ্ড অবসন্ন। ঠিক সেই সময় দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন জিবরাইল (আ.)। মাথায় তাঁর ধুলোমাখা পাগড়ি, হাতে অস্ত্রের চিহ্ন—যেন যুদ্ধ করে এসেছেন। তিনি আকস্মিক এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন,

"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন?"

নবি ﷺ বললেন—

"হ্যাঁ।"

জিবরাইল (আ.) বললেন—

“আমাদের শপথ, ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র নামায়নি। আপনি উঠুন, সাহসীদের নিয়ে আবার বের হন। এবার বনু কুরাইযার দিকে।”

রাসুল ﷺ তারপর ঘোষণা করলেন—

“কেউ আসরের নামাজ যেন বনু কুরাইযার বংশের দুর্গে গিয়ে না পড়ে।”

এ নির্দেশের মধ্যে ছিল কঠোর তাগিদ—এখনই যাত্রা, কোনো বিলম্ব নয়। মুসলমানরা তখনো সবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে; কেউ গোসল করেছে, কেউ ক্ষত বাঁধছে—শরীরের প্রত্যেক কোণে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু নবি ﷺ–এর নির্দেশ অমান্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

অনেকে আঘাতে হাত-পা হারিয়েছেন, কেউ রক্তাক্ত। তারপরও কেউ পিছিয়ে থাকেনি। সবাই দাঁড়িয়ে গেল—

“নবি যা নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেটাই করব।"

মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই ছিল বনু কুরাইযার বসতি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দুশমনরা পিছন থেকে হামলা করবে—এমন অশনি সংকেত পাঠাচ্ছিল তারা। মুসলমানদের জন্য এটি ছিল ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি।

এখন সেই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবার সময় এসেছে। রাসুল ﷺ নিজে উটের পিঠে চড়ে সামনে চললেন; সাহাবারা পেছনে। সৈন্যরা চলতে চলতে তাড়াহুড়ো করছে—কারণ তাদের উদ্দেশ্য পৌঁছে আসরের নামাজ দেরি না করে পড়া।

সেদিন ছিল একটানা যুদ্ধ শেষে মুহূর্তের মধ্যেই নতুন অভিযান। পোশাকে তখনো ধুলা–বালু, শরীরে তাজা ক্ষতের ব্যথা। অনেকের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সামান্য কাপড়ে, কেউ কাঠির ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিল। কিন্তু কারো চোখে ছিল না ক্লান্তির অভিযোগ—বরং ছিল আনুগত্য, ঈমান এবং দৃঢ়তার আলো।

এমনকি যারা অস্ত্র হাতে নিতে কষ্ট পাচ্ছিল, তারাও পিছিয়ে দাঁড়ায়নি। সৈন্যদের মধ্যে কেউ বলল—

“রাসুল ﷺ যেদিকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সেদিকেই যাচ্ছি। বনু কুরাইযায় গিয়েই আমরা আসরের নামাজ পড়ব।”

এই কথায় উঠে এলো আনুগত্যের দুটি রূপ—একদল রাসুল ﷺ–এর জুমলার আক্ষরিক মানে নিল, সত্যিই তারা বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবেই নামাজ পড়ল।

অন্য দল বুঝল, রাসুল ﷺ তাড়াহুড়োর তাগিদ দিতে চেয়েছেন; তারা পথেই সময় হলে নামাজ পড়ে নিল।

দুই দলই সঠিক ছিল, কারণ উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য।

এই পুরো দৃশ্য একদিকে দেখায়—যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত সৈন্যদের ঈমান কত দৃঢ় ছিল, আর অন্যদিকে দেখায়—চুক্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ আসে। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল—সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি।

বনু কুরাইযার যুদ্ধের শুরু এভাবেই—হঠাৎ, তীব্র, এবং অবিচল আনুগত্যের শক্তি নিয়ে।

ইহুদিদের সলাপরামর্শ :

- খন্দকের যুদ্ধের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মদীনার ভেতরেই হঠাৎ বাতাসে এক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। সেই অস্থিরতার উৎস ছিল বনু কুরাইযা। তারা বহুকাল ধরে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে করা চুক্তির অংশ ছিল, আর মদীনা সনদের অধীনে মুসলমানদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও তাদের ওপর ছিল। খন্দকের পূর্ব দিক তাদের ইলাকা হওয়ায় যুদ্ধের শুরু থেকেই মুসলিম বাহিনী তাদের বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু জোটবদ্ধ আরব-মুশরিক বাহিনী যখন পরিখার ওপারে টালের মতো দাঁড়িয়ে রইল, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলো, খাবার কমে এলো—ঠিক তখনই তাদের ভেতরে শুরু হলো গোপন পরামর্শ আর ষড়যন্ত্র।

বনু কুরাইযার প্রধান কাব ইবনু আসাদ নিজের দুর্গে সর্বোচ্চ নেতাদের ডাকলেন। ডাকা হলো বংশের প্রবীণদের, ডাক পড়ল সামরিক দায়িত্বে থাকা লোকদেরও। তাদের মুখগুলোতে ছিল উৎকণ্ঠা, আবার কোথাও কোথাও ভেসে উঠল সুযোগসন্ধানী আনন্দের রেখা। তারা জানত—মুসলমানরা বাইরে শত্রুবাহিনীর চাপে ক্লান্ত, শহরের ভেতর সামান্য অসতর্কতাই তাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে। তাই প্রথমই আলোচনার টেবিলে উঠল এই প্রশ্ন: “এই সংকটে নবীর সাথে চুক্তি রক্ষা করব, না কি জোটবদ্ধ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুহাম্মদের শক্তিকে চিরদিনের জন্য গুঁড়িয়ে দেব?”

এদিকে খন্দকের বাইরে অবস্থানরত কুরাইশ ও গাতফান নেতাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন গোপনে বনু কুরাইযার অঞ্চলে যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—যদি ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে, দুর্গের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়, তবে পুরো আরব তাদের পাশে থাকবে। এই প্রতিশ্রুতির কথা কা’ব প্রথমে

সভায় তুলে ধরলেন। অনেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের চোখে একটিই চিত্র—যদি মুহাম্মদ ﷺ নিহত হন, তবে মদীনার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় তাদের হাতে ফিরে আসবে। যুদ্ধ ছাড়া সরে দাঁড়ানো নবী ﷺ-কে দুর্বল দেখানোর সুযোগও তারা হারাতে চাইছিল না।

কিন্তু সবাই এমন ছিল না। বংশের কিছু বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ শঙ্কিত ছিলেন। তারা বললেন, "মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে কখনো খেয়ানত করেননি। তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের রক্ষা করেছেন, আমাদের অধিকার মান্য করেছেন। যাদের সঙ্গে আমরা প্রতিশ্রুতি করেছি, তাদের পেছনে ছুরি মারা ঠিক হবে না।" আবার কেউ কেউ উল্লেখ করল যে বাইরে অবস্থানরত আরব জোটের ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না; তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু অধিকাংশই আবেগে, হিংসায় ও মনের গভীরে জমে থাকা ক্ষোভে যুক্তি শুনল না। সভার ভেতর ধীরে ধীরে যুক্তির কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল, আর শত্রুতা কিংবা প্রতিশোধের দাবি জোরালো হয়ে উঠল।

কাব ইবনু আসাদের মুখে শেষ কথা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তিনি বললেন—"মুহাম্মাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদি আজ আমরা ওঠে দাঁড়াই, তবে আরবের সব শক্তি আমাদের সাথে থাকবে। এটি আমাদের সুযোগ।" এই কথার পর নীরবতার দেয়াল ভেঙে এক ধরনের সম্মতি ছড়িয়ে পড়ল। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল—চুক্তি ভঙ্গ করবে। এমনকি একদল নেতা পরামর্শ দিল—মুসলমানদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করা যায়, মহিলাদের ও শিশুদের ওপর হঠাৎ হামলা চালানো যায়, যাতে মদীনার ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের পরিকল্পনা ছিল—বাইরের জোটবাহিনী যখন পরিখা পেরোতে পারবে না, তখন অন্তত শহরের ভেতর থেকে আঘাত করলে মুসলিম বাহিনী দুই দিক থেকে চাপে পড়ে ধ্বসে পড়বে।

এই সলাপরামর্শের সভা এমনই ছিল—অন্ধ প্রতিশোধ, ভ্রষ্ট সিদ্ধান্ত, আর নৈতিকতার সব রেখা পেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। তারা নিজেরাই বুঝতে পারেনি যে এ সিদ্ধান্ত শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, তাদের নিজের বংশের জন্যও এক ভয়ানক পরিণতির দরজা খুলে দিচ্ছে।

একটি চুক্তিভঙ্গ, একটি বিশ্বাসঘাতকতা, আর এক সভার ভুল সিদ্ধান্ত—শেষ পর্যন্ত পুরো বনু কুরাইযা গোত্রের ভাগ্যকে বদলে দিয়েছিল।

:- বনু কুরাইযার অবরোধ ও বিচার শেষ হওয়ার পরও সাদ ইবনু মুআয রা.-এর শরীরে লাগা গভীর আঘাত ধীরে ধীরে আরো জটিল হয়ে উঠছিল। খন্দক খননের সময় কুরাইশ–মিত্র বাহিনীর এক তীর এসে তাঁর বাহুর প্রধান শিরা কেটে দেয়। রক্ত থামানো গেলেও ক্ষত পুরোপুরি শুকায়নি। তিনি তখন নবিজি ﷺ–এর জন্য এবং ইসলামের জন্য যে দৃঢ়তায় লড়াই করেছিলেন, তারই মূল্য হিসেবে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল।
বনু কুরাইযার বিচার শেষে তাঁকে চিকিৎসার জন্য মসজিদের পাশের তাঁবুতে রাখা ছিল। রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ তাঁর ক্ষত আবার দুঃসহভাবে খুলে যায়। রক্ত প্রচণ্ড বেগে বের হতে থাকে। তিনি অনুভব করেন যে, হয়তো দুনিয়ার জীবন শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় তিনি মাথা তুললেন, আকাশের দিকে তাকালেন এবং গভীর তৃপ্তি নিয়ে বললেন—
“হে আল্লাহ! আপনি জানেন, কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার থেকে আমার প্রাণের কোনো দুঃখ নেই। কারণ তারা আপনার রাসুলকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল শুধু একটি বেদনা—বনু কুরাইযা যে চুক্তিভঙ্গ করল, তাদের ব্যাপারে যেন আমি আপনার সন্তুষ্টির বিচার দেখতে পাই। আপনি আজ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। এখন চাইলে আপনি আমার প্রাণ গ্রহণ করতে পারেন।”

এই দোয়া করার পর অল্পক্ষণেই তাঁর শরীর নিস্তেজ হতে থাকে। তাঁর চারপাশে দাঁড়ানো সাহাবিরা লক্ষ্য করলেন—সাদ রা. ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করছেন। মুহূর্তেই খবর পৌঁছে যায় নবিজি ﷺ–এর কাছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ–এর হৃদয় প্রিয় এই সাহাবি—যিনি আনসারদের নেতা, যিনি আকাবা বায়আতে ইসলামকে নতুন শক্তি দিয়েছিলেন, যিনি ইসলামের জন্য প্রতিটি যুদ্ধে সর্বাগ্রে দাঁড়িয়েছিলেন—আজ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে।

ঠিক তখনই একটি বিস্ময়কর বিষয় ঘটে। নবিজি ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন—
“সাদ ইবনু মুআয রা.-এর মৃত্যুতে আরশে রহমান কেঁপে উঠেছে।”
মানব ইতিহাসে কখনো কোনো মানুষের মৃত্যু এভাবে আল্লাহর আরশের আন্দোলনের সঙ্গে উল্লেখ হয়নি। সাদ ইবনু মুআয রা. ছিলেন সত্যের জন্য অবিচল, ঈমানের জন্য

অবিচল; আল্লাহ তাঁর এমন সম্মান দান করলেন যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেবে।

জানাজা প্রস্তুত করার সময় সাহাবিরা দেখলেন—তার দেহ আনতে অনেক জনবল লাগছে। মুমিনদের একদল তাঁর খাটিয়া ধরেছিলেন, তবু মনে হচ্ছিল যেন তা অস্বাভাবিকভাবে ভারী। এ কথা শুনে নবিজি ﷺ বললেন—
"মালাইকা (ফেরেশতারা) জানাজায় অংশ নিয়েছে, সে জন্য তোমরা ওজন ভারী মনে করছো।"
এভাবে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিলেন সাদ ইবনু মুআয রা.—একজন সাহাবি, যার ঈমান ছিল পাহাড়সম দৃঢ়, যার সিদ্ধান্তে বনু কুরাইযার বিচার সম্পন্ন হলো, এবং যার মৃত্যুকে সম্মান জানিয়ে আসমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল।

নবীজির নির্দেশে আবু রাফির হত্যাকাণ্ড

:- মদিনার বাইরে হিজাজ অঞ্চলে লোকাইর নামে একটি দুর্গে বসবাস করত এক ধনী ইহুদি ব্যবসায়ী—সামুউইল ইবন আবুল হুকাইক। মুসলিমদের কাছে তিনি বিশেষভাবে কুখ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি শুধু বদর-উহুদের পর ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রই করতেন না, বরং আরবের বিভিন্ন কাবিলা-গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার কাজেও বড় ভূমিকা রাখতেন।
ইসলামের শত্রু হিসেবে তার পরিচয় এতটাই স্পষ্ট ছিল যে মুসলিমরা তাকে 'আবু রাফি' নামেই বেশি চিনত। তিনি ছিলেন একজন বড় অর্থবিত্তের মালিক; সেই সম্পদ ব্যবহার করে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের জন্য নানা চক্রান্ত চালাতেন। খন্দকের যুদ্ধে যখন মদিনা চারদিক থেকে শত্রু-বেষ্টিত হয়ে পড়ে, সেই যুদ্ধের আগেও এবং পরেও তিনি ক্রমাগত কুরাইশ, বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদি কাবিলাদের ইসলামবিরোধী জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দিয়ে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছিলেন।
খন্দকের বিপদ কেটে যাওয়ার পরেও তার ষড়যন্ত্র থামেনি। তাই মুসলিম সমাজের নিরাপত্তা ও মদিনার ভবিষ্যৎ রক্ষার স্বার্থে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে নিস্তব্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগেই কাব ইবন আশরাফের ব্যাপারটি ঘটেছিল; এবার আবু রাফি।
এই কাজের জন্য মনোনীত হন পাঁচজন অভিজ্ঞ সাহাবি—অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আতিক। তার সঙ্গে ছিলেন মাসউদ ইবন সিনান, আবদুল্লাহ ইবন

উনাইস, হাসান ইবন রিবি' এবং আবু কাতাদা ইবন আশওয়াদ। তারা গোপনে রওনা হন এবং কঠোর পাহারাবেষ্টিত লোকাইর দুর্গে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। সন্ধ্যার দিকে দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, আর ভেতরে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই তাদের পুরো পরিকল্পনাই ছিল অন্ধকার নামার আগেই দুর্গের আশপাশে লুকিয়ে থাকা এবং সুযোগ বুঝে ভেতরে ঢোকার।

সন্ধ্যায় অবশেষে সেই সুযোগ আসে। আবদুল্লাহ ইবন আতিক খুব কষ্টে দুর্গের ভেতরে ঢোকেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে যান যেখানে আবু রাফির ব্যক্তিগত ঘর ছিল। এ সময় আবু রাফি রাতের খাবার সেরে তার অন্ধকার কুঠুরিতে বিশ্রামে যাচ্ছিল। ইবন আতিক নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং আচমকা তাকে আঘাত করেন।

আবু রাফি চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু অন্ধকারের কারণে তার পরিবার বা দাসরা বুঝতে পারে না কী ঘটছে বা কোথা থেকে শব্দ আসছে। ইবন আতিক দ্রুত সরে গিয়ে দরজার কাছে লুকিয়ে থাকেন। লোকজন যখন ভিতরে ঢুকে পরীক্ষা করে আবার বের হয়ে যায়, তখন তিনি পুনরায় প্রবেশ করে নিশ্চিত করেন যে শত্রুটি আর জীবিত নেই।

মিশন সম্পন্ন হওয়ার পর দরজা দিয়ে নেমে পালানোর সময় তিনি দুর্ঘটনাবশত সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলেন। তবুও রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে দুর্গের বাইরে আসতে সক্ষম হন। পরে সঙ্গীরা তাকে নিয়ে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে। রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের মিশন সফল হওয়ার সংবাদ শুনে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাদের অভিযানকে অনুমোদন দেন।

এইভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা আবু রাফির ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটে। মদিনার নিরাপত্তা ফিরে আসে এবং বনু কুরাইযার যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কৌশলগত অবস্থান আরও দৃঢ় হয়।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ :

উহুদের পরবর্তী সময়টায় মুসলিম সমাজ আবার ধীরে ধীরে স্থিরতা ফিরে পাচ্ছিল। তবে আরবের নানা কোণে এখনও কিছু গোত্র ছিল যারা মুহাম্মদের (সা.) নেতৃত্বাধীন নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থানকে নিজেদের জন্য বিপদের কারণ মনে করত। এদের মধ্যেই ছিল বনু মুস্তালিক—যারা খুযাআ গোত্রভুক্ত এবং জাহেলি আরবে বেশ প্রভাবশালী একটি শাখা। গোত্রপ্রধান আল-হারিস ইবনু আবি বিরার বহুদিন ধরেই কুরাইশদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। মুসলিম সমাজের শক্তি বাড়তে থাকায় সে মনে করল, যদি

দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে মদিনার উত্থান তাদের গোত্রের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেই ভয় থেকেই সে বিভিন্ন আরব গোত্রের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করল এবং মুসলমানদের ওপর আকস্মিক আক্রমণের পরিকল্পনা করল। খবরটি প্রথম মদিনায় পৌঁছে যায় এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বুঝতে পারলেন, যদি তিনি আগাম ব্যবস্থা না নেন, তবে মদিনার ওপর বড় ধরনের হামলা নেমে আসতে পারে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আক্রমণকারীদের আঘাত করার আগেই তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

মুসলিম বাহিনী রওনা হলো মুরাইসী'নামক একটি পানির উৎসের দিকে, যেখানেই বনু মুস্তালিকের লোকেরা সমবেত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। মুরাইসী' পৌঁছানোর পর উভয় পক্ষের চোখাচোখি হয়। বনু মুস্তালিক বুঝতে পারে তাদের গোপন পরিকল্পনা ইতোমধ্যে ভেস্তে গেছে। যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। আরবের গোত্রগুলো সাধারণত আকস্মিক হামলায় দক্ষ হলেও সুশৃঙ্খল প্রস্তুত বাহিনীর সামনে তারা টিকতে পারে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বনু মুস্তালিকের প্রধানসহ অনেকেই আত্মসমর্পণ করে।

এই অভিযানে বহু নারী-পুরুষ বন্দি হয়, প্রচুর ধন-সম্পদ আসে এবং মুসলিম বাহিনী বিজয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যেই ছিলেন বনু মুস্তালিক প্রধানের কন্যা জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস—যিনি পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে স্থান পান। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও নবীজির (সা.) সঙ্গে বিবাহের কারণে গোত্রের বহু মানুষ মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং অনেক বন্দি মুক্তি পায়। মদিনার ইতিহাসে এটি ছিল এক শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক সুফলের অনন্য উদাহরণ।

তবে ফেরার পথে ঘটে এক দুঃখজনক ঘটনা—একটি পানি সংগ্রহ নিয়ে দুজন মুসলিমের মধ্যে ঝগড়া হয়, এবং মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই সেই সুযোগে মুসলমানদের বিভক্ত করার চেষ্টা করে। সে বলেছিল—"মদিনায় গেলে সম্মানিতেরা অপমানিতদের বের করে দেবে।" এই উস্কানি মুসলিম সমাজকে অস্থির করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও মনস্তাত্ত্বিক চালনায় বিষয়টি দমন হয়ে যায়। এই ঘটনাই পরবর্তীতে সূরা মুনাফিকুন নাজিল হওয়ার পটভূমি হয়।

এরপর আরও একটি বড় পরীক্ষা আসে—হাদিসে ইফক, যার মাধ্যমে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) কে নিয়ে ভয়াবহ অপবাদ ছড়ানো হয়। সমাজের কিছু দুর্বল লোক সেই গুজবে কান দেয়, কিন্তু আল্লাহ অবশেষে আয়েশা (রা.)-এর নির্দোষিতা কুরআনের আয়াত নাজিল করে ঘোষণা করেন।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ তাই শুধু একটি সামরিক অভিযানই ছিল না; এটি ছিল মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় সংকটের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের একটি পর্ব। একদিকে যুদ্ধজয়, অন্যদিকে সামাজিক অস্থিরতা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে মুরাইসী'র অভিযান ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

মুনাফিকদের উৎপাত :-

বনু মুস্তালিক অভিযানে মুসলিম বাহিনী যখন বিজয় লাভ করে মদীনায় ফেরার পথে ছিল, তখনই মুনাফিকদের ভেতরের বিষাক্ত চেহারা আবার প্রকাশ পেল অন্য এক রূপে। যুদ্ধে মুসলিমদের দৃঢ় ঐক্য, আল্লাহর সাহায্য এবং কম ক্ষয়ক্ষতিতে বিজয়—এসবই তাদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। বাইরে তারা বিজয়ে সন্তুষ্টির ভান করলেও ভেতরে ভেতরে ছিল বিরাট ক্ষোভ। এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে একটি সামান্য পানি তোলাকে কেন্দ্র করে, যা পরে পুরো কাফেলার মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়।

মদীনার একসঙ্গে অবস্থানকারী দুটি প্রধান গোষ্ঠী—আনসার ও মুহাজির—দীর্ঘদিনের ভ্রাতৃত্বে বাঁধা ছিল। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই সবসময় সেই বন্ধন ভাঙার সুযোগ খুঁজত। সে লক্ষ্য করল যে বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর মনোবল এখন উঁচু, আর তাদের সামাজিক ঐক্য আগের চেয়ে আরও দৃঢ়। তাই সে একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে বড় করে তুলতে চাইল যাতে মুহাজির-আনসারের মধ্যে বিবাদ লাগানো যায়।

ঘটনাটি হয়েছিল এমন—মুহাজিরদের একজন পানির জন্য নামে, আর আনসারদের এক ব্যক্তি তার সাথে কথাকাটাকাটি করে। মুনাফিকরা তাৎক্ষণিকভাবে এতে লাফিয়ে পড়ে। তারা সামান্য বিরোধকে এমনভাবে উসকে দিতে থাকে যেন দুই গোষ্ঠী আবার সেই জাহেলিয়াতের জাতিভেদ-বিভাজনে ফিরে যায়। মুহূর্তেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গলা ওঠে, তর্ক বাড়ে, এমনকি অস্ত্র ধরার মতো অবস্থাও তৈরি হতে থাকে।

এই সুযোগ ঠিকই কাজে লাগাতে চাইল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে ছায়ার নিচে বসে মুসলিমদের ঐক্যকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল—"মদীনার মানুষরা তো এগিয়ে যায় তাদের সাহায্য করতে করতে, আর এরা (মুহাজিররা) এসে আমাদের

ঘাড়ে চেপে বসে। আমরা তাদের সাহায্য দিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি, অথচ এখন ওরাই আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে চায়!" তারপর সে আরেকটি বিষাক্ত বাক্য বলেছিল, যা পরবর্তীতে পুরো মুসলিম জগতে পরিচিত হয়ে যায়—"যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে শক্তিশালী দুর্বলকে বের করে দেবে।" তার ইঙ্গিত ছিল সে-ই সম্মানিত আর মুহাজিররা নাকি দুর্বল।

এই কথা শুনে মুসলিমদের হৃদয় যেন কেঁপে উঠল। এমন স্পর্ধা, এমন বিশ্বাসঘাতকতা—তাও আবার ইসলামের নামধারী কারও মুখে! একজন তরুণ সাহাবি ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। নবী ﷺ কথা শুনে প্রথমেই পরিস্থিতি প্রশমিত করার দিকে নজর দিলেন। তিনি জানতেন আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ফোঁড়াটি যদি আরও গভীর হয়, তাহলে বহু বছরের গড়া মুহাজির-আনসারের ভ্রাতৃত্বের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে কাফেলাকে তৎক্ষণাত যাত্রার আদেশ দেন—সাধারণত যে সময় সবাই বিশ্রাম করার জন্য থামে, ঠিক সেই সময়েই তিনি চলার নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সবাইকে এমনভাবে ব্যস্ত করে রাখা যাতে কেউ আর মুনাফিকদের কথায় মন দিতে না পারে। মানুষ ক্লান্ত হতে হতে সন্ধ্যায় এসে যখন থামল, তখন প্রত্যেকেই বিছানায় ঢলে পড়ল। কেউ আর তর্ক, বিভেদ বা খবর নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেল না।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের নিজের ছেলে—আবদুল্লাহ—একনিষ্ঠ মু'মিন তরুণ, পিতার আচরণ শুনে চরম ব্যথিত হল। সে প্রতিজ্ঞা করে দাঁড়িয়ে গেল যে, পিতা ফিরে মদীনার ফটকে ঢোকার আগে সে প্রথমে তার মুখোমুখি হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে, রাসূল ﷺ-কে অপমান করার সাহস কোথা থেকে এলো।

এ ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সামনে মুনাফিকদের চেহারাটি আরও উন্মুক্ত হলো। তারা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে ভয় সৃষ্টি করে না, বরং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ভেঙে দেওয়ার জন্যও সক্রিয় থাকে। কিন্তু নবী ﷺ-এর প্রজ্ঞা, দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং মুসলিমদের ঈমানি দৃঢ়তা তাদের সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ তাই শুধু বাহ্যিক বিজয়ের কাহিনি নয়; বরং মুনাফিকদের অন্তর্ঘাত থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার নবী ﷺ-এর অতুলনীয় রাষ্ট্রনেতৃত্বেরও এক শক্তিশালী উদাহরণ।

:- বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তখনকার ইসলামী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও আগ্রাসী ইহুদি উপজাতিদের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করছিল। নবী মুহাম্মদ (স.) লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই উপজাতি বাহ্যিকভাবে শান্তচিন্তক হলেও অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত এবং আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় যখন নবী (স.) জানেন যে বনু মুস্তালিকরা আশেপাশের মুসলিম অঞ্চলে হানা দিতে পারে। নবীজির প্রজ্ঞার প্রথম নিদর্শন ছিল তিনি সরাসরি আক্রমণ বা প্রতিরোধের পরিবর্তে কৌশলগত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহে মনোযোগ দেন। তিনি বাহিনীকে সুসংগঠিত করে রণকৌশল শেখান, সৈন্যদের মনোবল বজায় রাখেন এবং প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য কৌশল সম্পর্কে সতর্ক করেন।

যুদ্ধের সময়, মুনাফিকদের প্রকৃত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে তারা সুবিধা অনুসন্ধান এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। উদাহরণস্বরূপ, তারা সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহ ও ভয় সঞ্চার করতে চেয়েছিল, যাতে বাহিনী অগোছালো হয়। তবে নবীজির প্রজ্ঞা এবং দৃঢ় নেতৃত্ব তাদের সকল চেষ্টা বিফল করে দেয়।

নবী মুহাম্মদ (স.) কৌশলগতভাবে সৈন্যদের এমন অবস্থানে স্থাপন করেন যেখানে বনু মুস্তালিকরা বিভ্রান্ত হন। তিনি জানতেন প্রতিপক্ষের দুর্বল দিকগুলো এবং তা কাজে লাগিয়ে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর সুবিধা পেয়েছিল। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, নবীজির নেতৃত্ব কেবল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা নয়, বরং মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করারও একটি পরীক্ষা ছিল।

শেষপর্যায়ে, মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। বনু মুস্তালিকরা হেরে যায়, এবং সেই সঙ্গে মুনাফিকরা তাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করে। এই জয় শুধুমাত্র সামরিক কৌশলের নয়, বরং নবীজির দূরদর্শিতা, মনোবল ও নৈতিক নেতৃত্বেরও ফল।

যুদ্ধটি ইসলামী ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—শুধু বাহ্যিক শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা নয়, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবিলা করতে প্রজ্ঞা, সতর্কতা ও কৌশল প্রয়োজন।

ইফকের ঘটনা :-

ইফক বলতে সেই মিথ্যা অপবাদ রটনার ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে, যে ঘটনায় মুনাফিকরা হজরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে ও সতীত্বে কলঙ্ক ও কালিমা লেপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতার স্বপক্ষে আয়াত অবতীর্ণ করে তার সম্মান ও মর্যাদা আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছেন।

ইফক শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো জিনিসকে উল্টে দেয়া। এ ঘটনায় যেহেতু মুনাফিকরা আসল ব্যাপারকে উল্টে দিয়েছিল। তাই এ ঘটনা ইতিহাসে 'ইফকে আয়েশা' নামে প্রসিদ্ধ।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল কোনো যুদ্ধে যাওয়ার আগে স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম উঠতো, তাকে সঙ্গে নিতেন। সে হিসেবে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে হজরত আয়েশা (রা.) রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হন।

আয়েশা (রা.)-এর স্বর্ণের হার হারিয়ে যায়। আয়েশা (রা.) যাত্রাকালে প্রিয় ভগ্নী আসমা (রা.)-এর একটি হার ধার নেন। হারটির আংটা এতো দুর্বল ছিলো যে বারবার খুলে যাচ্ছিলো। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে মদিনার নিকটবর্তী বিশ্রামস্থলে তার গলার স্বর্ণ হারটি হারিয়ে যায়। যা তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে ধার হিসেবে এনেছিলেন। হাজত সারতে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। ফলে সেখানেই হারটি পড়ে গেছে মনে করে তিনি পুনরায় সেখানে গমন করেন ও হারটি সেখানে পেয়ে যান। আয়েশা (রা.) কাফেলার পিছনে থেকে যান। সফরে আয়েশা(রা.) নিজ হাওদাতে আরোহণ করতেন। এরপর হাওদার দায়িত্বে থাকা সাহাবিগণ হাউদা উটের পিঠে উঠতেন। তখন আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল কেবল চৌদ্দ বছর। তিনি এতো হালকা গড়নের ছিলেন যে, হাওদা-বাহক সাহাবিগণ সাধারণত বুঝতে পারতেন না যে, ভিতরে কেউ আছে কি নেই!

ইতিমধ্যে কাফেলা যাত্রা শুরু করে এবং লোকেরা তার হাওদা উঠিয়ে নিয়ে যায়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ভেবেছিলেন যে, তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের। ফলে ঐ ব্যক্তির মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়নি যে, তিনি হাওদার মধ্যে নেই।

হজরত আয়েশা (রা.) দ্রুত নিজের বিশ্রামস্থলে ফিরে এসে দেখেন যে, সব ফাঁকা। 'সেখানে নেই কোন আহ্বানকারী, নেই কোন জবাবদাতা'। তখন তিনি নিজের স্থানে

চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এ ভেবে যে, নিশ্চয়ই তার খোঁজে এখুনি লোকেরা এসে যাবে।

ছাফওয়ান বিন মুয়াত্ত্বাল যিনি কোন কাজে পিছনে পড়েছিলেন, তিনি ত্রস্ত পদে যেতে গিয়ে হঠাৎ মা আয়েশার প্রতি নজর পড়ায় জোরে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করেন ও নিজের উটটি এনে তার পাশে বসিয়ে দেন। আয়েশা (রা.) তার শব্দে সজাগ হন ও কোন কথা না বলে উটের পিঠে হাওদায় গিয়ে বসেন। অতঃপর ছাফওয়ান উটের লাগাম ধরে দ্রুত হাঁটতে থাকেন কাফেলা ধরার জন্য।

পর্দার হুকুম নাজিলের আগে তিনি আয়েশা (রা.)-কে দেখেছিলেন বলেই তাকে সহজে চিনতে পেরেছিলেন। দুজনের মধ্যে কোনো কথাই হয়নি। তিনি বলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাদল যেখানে বিশ্রাম করছিল, পথপ্রদর্শক ব্যক্তি আমাকে নিয়ে সেখানে তাদের মধ্যে উপস্থিত হল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্য একটি সফর থেকে ফেরার পথে মদিনার নিকটবর্তী 'বায়দা' (الْبَيْدَاء) নামক বিশ্রামস্থলে পৌঁছলে আয়েশা (রা.)-এর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। ফলে তা খুঁজতে কাফেলা দেরি হওয়ায় ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পানি না থাকায় তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হয় (মায়েদাহ ৬)। ইতিমধ্যে উটের পেটের নীচ থেকে হার খুঁজে পাওয়া যায়।

এ ঘটনায় উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) হজরত আবুবকর (রা.)-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,'হে আবুবকর-পরিবার! এটি উম্মতের জন্য আপনাদের প্রথম অবদান নয়।'

সৎ ও সরল প্রকৃতির লোকেরা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাঁকা অন্তরের লোকেরা এবং বিশেষ করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এটাকে কুৎসা রটনার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করল। মদিনায় ফিরে এসে তারা এ সামান্য ঘটনাকে নানা রং চড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জোটবদ্ধভাবে প্রচার করতে লাগল। তাতে হুজুগে লোকেরা তাদের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হল।

এ অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব ওহির মাধ্যমে পাওয়ার আশায় আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ চুপ রইলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরেও এবিষয়ে কোনরূপ ওহি নাজিল না হওয়ায় তিনি একদিন কয়েকজন সাহাবিকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন।

তাতে হজরত আলী (রা.) ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে পরামর্শ দিলেন আয়েশাকে তালাক দেবার জন্য। অপরপক্ষে উসামা ও অন্যান্যগণ তাকে রাখার এবং শত্রুদের কথায়

কর্ণপাত না করার পরামর্শ দেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অব্যাহত কুৎসা রটনার মনঃকষ্ট হতে রেহাই পাওয়ার জন্য একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন আউস গোত্রের পক্ষে উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। একথা শুনে খাযরাজ নেতা সাদ বিন ওবাদাহর মধ্যে গোত্রীয় উত্তেজনা জেগে ওঠে এবং তিনি এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। এর ফলে মসজিদে উপস্থিত উভয় গোত্রের লোকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায়। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে থামিয়ে দেন।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আয়েশা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাসব্যাপী একটানা পীড়িত থাকেন। বাইরের এতসব অপবাদ ও কুৎসা রটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। তবে অসুস্থ অবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যে আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার কথা ছিল, তা না পেয়ে তিনি মনে মনে কিছুটা অশান্তি বোধ করতে থাকেন।

দীর্ঘ রোগভোগের পর কিছুটা সুস্থতা লাভ করে হাজত সারার উদ্দেশ্যে একরাতে তিনি পিতা আবু বকরের খালা উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গমন করেন। এ সময় উম্মে মিসতাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে পড়ে যান এবং নিজের ছেলেকে বদ দোয়ো করেন। আয়েশা (রা.) এটাকে অপছন্দ করলে উম্মে মিসতাহ তাকে সব খবর বলে দেন (কেননা তার ছেলে মিসতাহ উক্ত কুৎসা রটনায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিল)। আয়েশা (রা.) ফিরে এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান।

সেখানে সব কথা জানতে পেরে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দুই রাত ও একদিন নির্ঘুম কাটান ও অবিরত ধারে কাঁদতে থাকেন। এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে তাশাহহুদ পাঠের পর বললেন, ‘হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু বাজে কথা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে সত্বর আল্লাহ তোমাকে দোষমুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোনো পাপকর্মে জড়িয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তওবা করো। কেননা বান্দা যখন দোষ স্বীকার করে ও আল্লাহর নিকটে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন।’

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য শুনে আয়েশার অশ্রু শুকিয়ে গেল। তিনি তার পিতামাতাকে এর জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তারা এর জবাব খুঁজে পেলেন না। তখন আয়েশা (রা.) বললেন,

আল্লাহর কসম! যে কথা আপনারা শুনেছেন ও যা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং যাকে আপনারা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন- এক্ষণে আমি যদি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ- তবুও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিষয়টি স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ- তাহলে আপনারা সেটাকে বিশ্বাস করে নিবেন। এমতাবস্থায় আমার ও আপনার মধ্যে ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা হজরত ইউসুফের পিতা (হজরত ইয়াকূব) বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 'অতএব ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম এবং আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কাম্য, যেসব বিষয়ে তোমরা বলছ' (ইউসুফ ১২/১৮)।

একথাগুলো বলেই আয়েশা (রা.) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম যে, আল্লাহ তার রসুলকে এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখাবেন। 'আমি কখনোই ভাবিনি যে,وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِى شَأْنِى وَحْيًا يُتْلَى 'আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আল্লাহ এমন অহী নাজিল করবেন, যা তেলাওয়াত করা হবে'। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা ঘরের কেউ বের হননি, এরি মধ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অহী নাজিল শুরু হয়ে গেল।

ওহি অবতরণ শেষ হলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিমুখে আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,أَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে অপবাদ মুক্ত করেছেন'। এতে খুশী হয়ে তার মা তাকে বললেন, আয়েশা ওঠো, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।

কিন্তু আয়েশা (রা.) অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন,لاَ، وَاللهِ، هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ بَرَاءَتِى أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللهَ 'না আমি তার কাছে যাব না এবং আমি কারো প্রশংসা করব না আল্লাহ ব্যতীত। যিনি আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছেন'। এটা ছিল নিঃসন্দেহে তার সতীত্বের তেজ এবং তার প্রতি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রগাঢ় ভালোবাসার উপরে গভীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

ইবনু উবাইয়ের পরিণতি :

- বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় ইবনু উবাই নিজেকে শান্তি এবং ন্যায়ের পক্ষের হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেও, তার প্রকৃত মনোভাব ছিল মুসলিমদের ক্ষতি করা। তিনি যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে, ভয় সৃষ্টিতে এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসহীনতা ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখেছিলেন।

যুদ্ধ শেষে যখন সব কিছু শান্ত হয়, তখন ইবনু উবাইর প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায়। মুসলিম উম্মাহ বুঝতে পারে যে তিনি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে মুনাফিক চক্রান্ত করছিলেন। নবী (সাঃ)ও তার মুনাফিক প্রকৃতির কারণে সতর্ক ছিলেন।
ইবনু উবাইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি হলো:
১. সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া: মুসলিম উম্মাহর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারান। তিনি আর মুসলিম সমাজের মধ্যে নেতৃত্ব দিতে পারেননি।
২. নৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্যুতি: তার আচরণ এবং ষড়যন্ত্র ইসলামের নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। তিনি ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে ব্যর্থ হন।
৩. মৃত্যু: ইবনু উবাই অবশেষে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তার মুনাফিক প্রকৃত চরিত্র নিয়ে মারা যান। কিছু সূত্রে উল্লেখ আছে, তার মৃত্যু অবশেষে স্বাভাবিকভাবে হলেও, তার জীবনকালে তিনি কখনো সত্যিকারের ইসলামী জীবন লাভ করেননি।

হুদায়বিয়ার বিজয়মালা :

- ষষ্ঠ হিজরি পয়লা জিলকদ। মক্কা ও অভিমুখে রওনা হয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের খুশি যেন আর ধরে না। কতদিন পর প্রিয় জন্মভূমিতে পা রাখতে যাচ্ছেন! আহ কি আনন্দ! কি খুশি দোলা দিয়ে যাচ্ছে তাদের হৃদয়ে। তারা তাওয়াফ করবেন আল্লাহর ঘর। রহমানের নামে কোরবানি দেবেন পশু! তাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺচলছেন আগে আগে। হেলেদুলে চলছে তার উটনি কাসওয়া। আম্মাজান উম্মু সালমা ও আছেন সফরসঙ্গী হিসেবে । ১৪০০ সাহাবীর কাফেলা আশা নিয়ে এগিয়ে চলছে মক্কার পানে। যুল হুলায়ফায় পৌঁছে বিরতি দিলেন নবীজি। সেখানে তার পশুকে কোরবানির জন্য সজ্জিত করেন নিলেন। উমরার জন্য বেঁধে নিলেন ইহরাম। তিনি কেবল উমরা পালনের

জন্যই যাচ্ছেন। যুদ্ধের কোন ইচ্ছা তার নেই। রাতে আছে আত্মরক্ষার সামান্য হাতিয়ার, আর ৭০ টি কোরবানির পশু। ভারী কোন অস্ত্রশস্ত্র আনেননি কেউ।

কুরাইশদের বাধা :

- হুদায়বিয়ার বিজয়মালায় কুরাইশদের বাধা ঘটনাটি সিরাহ অনুযায়ী একটি জটিল ও সূক্ষ্ম কূটকৌশলের মাধ্যমে দেখা যায়। মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবারা মক্কা থেকে হজ্জ পালন করতে গিয়ে হুদায়বিয়ার কাছে পৌঁছান। তখন মক্কার কুরাইশরা তাদের প্রবেশে বাধা দেয়। কুরাইশদের প্রতিরোধ ছিল মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের কারণে। তারা ইসলামী সম্প্রদায়ের দ্রুত শক্তিশালী হওয়ার আশঙ্কায় সাহাবাদের হজ্জে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। তারা চায় না, মুসলমানরা হজ্জ করার সময় তাদের সংখ্যাগত ও সামাজিক শক্তি প্রদর্শন করুক।

কুরাইশরা প্রথমে কৌশলে আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের প্রস্থানে বাধা দেয়। তারা অযথা সময় নষ্ট করে এবং সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে মুসলমানদের প্রবেশে ভীতি সৃষ্টি করতে চায়। এতে মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবারা বিপদ ও চাপে পড়েন, কিন্তু নবি ﷺ শান্ত ধৈর্য ধরে কৌশলীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রজ্ঞা অনুযায়ী নবী ﷺ চূড়ান্ত কূটকৌশল ও সংলাপের মাধ্যমে কুরাইশদের সাথে চুক্তি করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা সাময়িকভাবে হজ্জের সুযোগ না পেলেও বড় ধরনের রক্তপাত ও সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়। কুরাইশদের বাধা মূলত শক্তি, স্বার্থ ও ভীতি থেকে উদ্ভূত, কিন্তু নবী ﷺ এর প্রজ্ঞা, ধৈর্য এবং কূটকৌশল তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় এবং মুসলমানদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিজয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।

হুদায়বিয়ার প্রান্তরে :-

হুদায়বিয়ার প্রান্তর মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। সিরাহ অনুযায়ী, মক্কার কুরাইশরা ইসলামের সম্প্রসারণ বন্ধ করতে চেয়েছিল, আর মুসলমানরা পবিত্র মক্কায় তওয়াফ করতে গিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার প্রান্তরের পুরো ঘটনা নিম্নরূপভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায়:

মুসলিমরা, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। তারা যুদ্ধের জন্য নয়, বরং উমরা বা তওয়াফ করার উদ্দেশ্যে

যাচ্ছিলেন। প্রান্তরে পৌঁছার পর কুরাইশরা তাদের বাধা দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথমে কুরাইশরা মুসলিমদের মক্কার প্রবেশে বাধা দেয়, ফলে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি বা সুলহের দরজা খুলে। মুসলিমরা ও কুরাইশরা হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এক সমঝোতা চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী, মুসলিমরা সে বছর তওয়াফ করতে পারবে না, তবে পরের বছর নির্দিষ্ট সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ পাবে। এছাড়াও দুই পক্ষ ১০ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

প্রান্তরে এই চুক্তি নবীজির কৌশল ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। মুসলিমরা সরাসরি যুদ্ধ না করে কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। এই পরিস্থিতিতে, প্রান্তরের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক থাকলেও, দুটি পক্ষের মধ্যে মানসিক ও কৌশলগত উত্তেজনা ছিল।

হুদায়বিয়ার প্রান্তর মূলত এমন একটি স্থান হয়ে ওঠে যেখানে ইসলামের কৌশল, শান্তিপূর্ণ সমঝোতা, ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অবস্থান সুনিশ্চিত করা হয়। এই প্রান্তরে মুসলিমদের ধৈর্য, নবীজির দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুরাইশদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

সন্ধির প্রস্তাবনা

:- মক্কার কাছাকাছি হুদায়বিয়ার নির্জন প্রান্তরে মুসলিম কাফেলা যখন উমরাহর নিয়তে অবস্থান নেয়, তখন কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাধা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও প্রিয় নবী ﷺ শান্তি ও ধৈর্যের পথ বেছে নিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সন্ধির প্রস্তাবনা তৈরি হয়। এই প্রস্তাবনাটিই পরবর্তী সময়ে "হুদায়বিয়ার চুক্তি" নামে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

সন্ধির সূচনালেখ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যময়। নবী ﷺ আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)-কে লিখিয়ে নিলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।"

কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবনু আমর আপত্তি করল—

"আমরা 'রাহমান' 'রাহিম' চিনি না। লিখ- 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'।"

নবী ﷺ শান্তভাবে তা মেনে নিলেন। এরপর লেখা হলো—

"এটি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ও কুরাইশদের মাঝে সম্পাদিত একটি সন্ধি।"

কিন্তু সুহাইল বলল—

"আমরা আপনাকে 'রাসূলুল্লাহ' মানি না; যদি মানতাম, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। লিখুন— 'মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ'।"

আলী (রা.)-এর পক্ষে 'রাসূলুল্লাহ' মুছতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই নবী ﷺ নিজ হাতে লেখাটি মুছে 'মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ' লিখে দিলেন।

এই নমনীয় ও শান্ত মনোভাবই কুরাইশদের মন নরম করেছিল এবং চুক্তির মূল ভিত্তি গড়ে।

হুদায়বিয়ার চুক্তির ধারাগুলো — বিস্তারিত

চুক্তিটিতে কয়েকটি মূল ধারা ছিল, যা দেখতে আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের ক্ষতির মতো মনে হলেও পরবর্তীতে এগুলোই ইসলামের বিজয়ের দরজা খুলে দেয়।

১. এ বছর মুসলিমরা উমরাহ না করে ফিরে যাবে

মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তারা শুধুমাত্র পরের বছর উমরাহ আদায় করতে পারবে, তাও মাত্র তিন দিন অবস্থানের অনুমতিতে এবং অস্ত্র ছাড়া—শুধু যাত্রীর তলোয়ার খাপের মধ্যে থাকবে।

২. দুই পক্ষের মধ্যে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি

এই দশ বছরে কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈরিতা, লড়াই, হামলা বা রক্তপাত হবে না। উভয় দল নিরাপদে এলাকা অতিক্রম করতে পারবে।

৩. আরবের গোত্রগুলোর জন্য স্বাধীনতার ধারা

আরবের যে কোনো গোত্র স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে—

তারা চাইলে মুসলিমদের সঙ্গে বা কুরাইশদের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারবে।

এটি ছিল আরব উপদ্বীপে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এক ধারা।

৪. মক্কা থেকে মুসলিম হয়ে কেউ মদিনায় গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যে ব্যক্তি মক্কায় থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় চলে আসবে, মুসলিমরা তাকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু উল্টোটা হবে না—মদিনা থেকে কুরাইশদের দিকে কেউ গেলে তাকে ফেরত আনার অধিকার মুসলিমদের নেই।

এই ধারাটি শুনে অনেক সাহাবি ব্যথিত হলেও নবী ﷺ গভীর প্রজ্ঞায় এটিকে মেনে নিলেন।

(এই ধারাই পরবর্তীতে ইসলামের পক্ষে বিশাল পরিবর্তন এনে দেয়, কারণ মক্কায় আটক নতুন মুসলিমরা গোপনে ইসলামের শক্তিশালী বার্তা ছড়িয়ে দেয়।)

৫. কেউ গোপনে বা চুরি করে আনা হলে গ্রহণ করা যাবে না। যে ব্যক্তি কুরাইশদের অনুমতি ছাড়া মুসলিমদের দিকে পালিয়ে আসবে, তাকে গ্রহণ করা যাবে না। কুরাইশদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রেখেই মুসলিমদের শান্তির প্রতিশ্রুতি জারি থাকবে।

৬. মুসলিমরা পরের বছর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবে

এই তিন দিনে মক্কার মানুষ মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। মুসলিমরা শুধু ইবাদতপরায়ণতার লক্ষ্যেই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল নবী ﷺ–এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। আপাতদৃষ্টিতে কিছু ধারার কারণে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত মনে হলেও চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ইসলামের প্রচার শান্তির পরিবেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলামের শক্তি এত বেড়ে যায় যে কুরাইশরাই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে এবং শেষ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ ছাড়াই মক্কা মুসলিমদের তত্ত্বাবধানে চলে আসে।

প্রকাশ্য বিজয়

:- হুদায়বিয়ার নীরব প্রান্তরে যখন মুসলমানরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শুধু ওমরাহ পালন করতে এসেছিল, তখন তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কুরাইশেরা যে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয় তা মুহূর্তেই পরিস্থিতিকে টানটান করে তোলে। কিন্তু রক্তপাতের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ নয়—শান্তির পথ বেছে নিলেন। এই শান্তিই পরবর্তীতে যুদ্ধের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী প্রমাণিত হয়।

চারদিকের উত্তেজনার মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয়, তার প্রতিটি ধারা যেন প্রথমে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলেও, পরবর্তীতে দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা সেই ধারা দিয়েই দ্বীনকে বিজয়ী করলেন।

সন্ধির ফলে মদিনা ও মক্কার মধ্যে দশ বছরের যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা হলো। এ যুদ্ধে বিরতি মুসলমানদের এমন নিরাপদ পরিবেশ দিলো, যেখানে তারা প্রথমবারের মতো ভয়ের ছায়া ছাড়া দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারল। আরবের নানা গোত্র যখন দেখল কুরাইশেরা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, তখন তারা বুঝে গেল—

মুসলমানরা দুর্বল নয়; বরং শক্তি ও মর্যাদায় তারা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে যেখানে কুরাইশের মতো পরাক্রমশালী গোত্রও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

সন্ধির পরে মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলাম এমন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, যা পূর্ববর্তী বিশ বছরের দাওয়াত থেকেও বড় প্রভাব ফেলল। মানুষ দলে দলে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল। নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেল, আর তাদের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় হয়ে উঠল।

হুদায়বিয়ারই সেই সন্ধি, যা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের দরজা খুলে দেয়। কারণ কুরাইশরা নিজ হাতে যে চুক্তি লিখে দিল, সেটাই তাদের নিজের জন্য ভবিষ্যতে বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল। চুক্তি ভঙ্গ করার দায়ে তারা নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর মুসলমানরা দৃঢ় ও বৈধ দাবির ভিত্তিতে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো।

হুদায়বিয়া তাই শুধু একটি সন্ধি নয়—এটি ছিল ধৈর্য, দূরদর্শিতা ও আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ের প্রকাশ্য দলিল। আপাতদৃষ্টিতে পরাজয়ের মতো মনে হলেও, এর অন্তরালে ছিল এমন এক মহান পরিকল্পনা, যা ইসলামকে তার পরবর্তী উজ্জ্বল পর্বে পৌঁছে দেয়।

গেরিলা যোদ্ধা আবু বাসির :

- হুদায়বিয়া সন্ধির পর মক্কায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতন আরও বেড়ে গেল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যদি কোনো মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে মদিনায় পালিয়ে আসে, নবী ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হতেন। এমন কঠিন সময়ে এক তরুণ মুসলমান—আবু বাসির উতবা ইবনু উসাইদ (রাঃ)—নিজেকে মুক্ত করার জন্য অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিলেন।

তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় পৌঁছালেন। তার মুখে সেই নির্যাতনের চিহ্ন–ক্ষত-বিক্ষত দেহ, অনাহার-তৃষ্ণায় শুকিয়ে যাওয়া চেহারা, কিন্তু চোখে ছিল দৃঢ় ঈমানের জ্যোতি। তিনি নবীজি ﷺ–এর সামনে এসে বললেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর পথে বের হয়ে এসেছি। আমাকে রক্ষা করুন।"

কিন্তু চুক্তির শর্ত অমান্য করতে নবীজি ﷺ চাননি। অল্পক্ষণ পরে তাঁর পেছন পেছন কুরাইশের দু'জন লোক মদিনায় এসে হাজির হলো এবং দাবি করল—"এই লোককে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন।" নবীজি ﷺ আবু বাসিরকে ডেকে অনেক মমতার সঙ্গে বললেন—"হে আবু বাসির, তুমি জানো আমরা অন্যায় করতে চাই না। আল্লাহ নিশ্চয় তোমার জন্য পথ খুলে দেবেন। ফিরে যাও।"

আবু বাসির বুঝলেন—নবীজি ﷺ তাঁর জান রক্ষা করতে চান, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করতে চান না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেই দু'জন কুরাইশির সঙ্গে রওনা হলেন। তবে তাঁর মনে ছিল—"আমি ফিরে গেলে ওরা আমাকে জীবিত রাখবে না... আমি অন্য পথ খুঁজে নেব।"

রাস্তা ধরে যখন তারা সমুদ্রতীরবর্তী লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক কুরাইশি তাকে কটাক্ষ করে বলল—"আবু বাসির, তোমাকে তো আমরা এমনভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমাদের কিছুই করতে পারবে না।" তার হাতে ঝুলতে থাকা ধারালো তরোয়ার দিকে তাকিয়ে আবু বাসির বললেন—"তোমার এই তরোয়ার ধার কত সুন্দর!" গর্বে ফুলে ওঠা লোকটি তরোয়াল বের করে দেখাতে গেল, আর মুহূর্তেই আবু বাসির হাত বাড়িয়ে সেটি ধরে এক আঘাতে তার জীবন শেষ করেন। অপর ব্যক্তি ভয়ে পালাতে শুরু করে মদিনার দিকে। সে দৌড়ে এসে নবীজি ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল—"আবু বাসির আমাকে হত্যা করবে!"

এর পরেই আবু বাসির মদিনায় এসে দাঁড়ালেন। নবীজি ﷺ বললেন—"এই মানুষটি আগুন ধরালে পুরো যুদ্ধ জ্বলে উঠবে।" অর্থাৎ তিনি সত্যিই যদি মুক্ত হয়ে যান, কুরাইশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো সাহস তাঁর আছে। এর মাধ্যমে নবীজি ﷺ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে মদিনায় থাকা তাঁর জন্য সম্ভব নয়—অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। আবু বাসির নবীজি ﷺ-এর ইঙ্গিত বুঝে মদিনা ছেড়ে গেলেন। তিনি চলে গেলেন সিফুল-বাহর নামক উপকূলীয় জায়গায়। সেখানে তিনি একাকী জীবন শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই মক্কা থেকে নির্যাতিত অন্য মুসলমানরাও গোপনে তাঁর কাছে পালাতে লাগল। ৩০, ৪০, ৭০—ক্রমে পুরো একটি স্বাধীন মুসলিম দল হয়ে উঠল তারা। তাদের কাছে ছিল না কোনো রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী, দুর্গ—ছিল শুধু ঈমান, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের রক্ষার তীব্র তাগিদ।

উপকূলবর্তী বাণিজ্যপথ দিয়ে কুরাইশের কাফেলা যেত। আবু বাসির ও তাঁর সঙ্গীরা সেই কাফেলাকে গেরিলা কৌশলে আক্রমণ করে সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন না, বরং তাদেরকে কুরাইশের অত্যাচারের প্রতিশোধ বুঝিয়ে দিতেন। কুরাইশরা আতঙ্কে পড়ে যায়—মদিনায় থাকা নবীজি ﷺ তখন এই সবকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তারা পুরোপুরি আবু বাসির দলের বাইরে।

অবশেষে কুরাইশ নিজেই অনুরোধ জানাল—"হে মুহাম্মদ, চুক্তির সেই ধারা আমরা বাতিল করছি। যারা ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে আসবে, তাদের আর মক্কায় ফেরত পাঠাবেন না!"

এইভাবে আবু বাসির নিজের প্রাণের তাগিদে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা পরিণত হলো চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতিলের কারণ হিসেবে—যা মুসলমানদের স্বাধীনভাবে মদিনায় আসার পথ খুলে দিল।

এই খুশির সংবাদ যখন আবু বাসির ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হলো। কিন্তু ঠিক তখনই আবু বাসির অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি বারবার নবীজি ﷺ-এর কথার স্মৃতি করছিলেন—"আল্লাহ তোমার জন্য পথ খুলে দেবেন।" সত্যিই তাই হলো—তাঁর ত্যাগ মুসলমানদের জন্য পথ তৈরি করে দিল।

আবু বাসির রাতে ঘুমাতেন বালুর ওপর, দিনে গেরিলা যোদ্ধার মতো উপকূলে টহল দিতেন, আর হৃদয়ে বয়ে বেড়াতেন স্বাধীনতার মর্মস্পর্শী ব্যথা। তাঁর দলে থাকা সঙ্গীরা তাকে স্মরণ করত—"যে মানুষটি একাই কুরাইশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।"

তিনি ছিলেন এক অদম্য মুজাহিদ—রাষ্ট্রহীন, অস্ত্রহননহীন, কিন্তু স্বাধীনতা ও ঈমানের ঝলকানি দিয়ে গড়া এক গেরিলা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা।

যী-কারাদ যুদ্ধ

:- হুদায়বিয়া চুক্তির পরবর্তী সময়। গোটা আরব ভূখণ্ড শান্ত-অশান্তের দোলাচলে। মুসলিম রাষ্ট্র মদিনা একদিকে কুরাইশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ, অন্যদিকে মরুপ্রান্তের বিভিন্ন গোত্রেরা ভাবতে থাকে—নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নন। এই সুযোগে কেউ কেউ অস্থির হয়ে ওঠে, বিশেষ করে তারা যারা আগে থেকেই নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত।

মদিনার আশপাশে পশুচারণের জন্য মুসলিমদের বহু উট ছড়িয়ে থাকত। নবী ﷺ-এর উটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল একজন সাহাবী—রায়ান বা উয়াইনা ইবন হাসন-এর গোত্রভুক্ত একদল রক্ষকের ওপর। মরুপ্রান্তের বিভিন্ন গোত্র উট চুরি করাকে কখনো কখনো যুদ্ধ-লাভ বা গোত্রিক শক্তি প্রদর্শনের উপায় মনে করত।

ঠিক এমনই সময়ে বনু ঘতফান এবং কিছু ফাজারা গোত্র মুসলিম উটগুলোর ওপর আকস্মিক হামলা চালায়।

একদিন সুবেহ-সুবেহ তারা হঠাৎ এসে মদিনার উটগুলো কাবু করে ফেলে।
আক্রমণ ছিল এত দ্রুত যে রক্ষক এক সাহাবী—উয়ায়নাহর গোত্রের এক রাই—শত্রুর হাতে শহীদ হন। উটগুলো তারা টেনে নিয়ে চলে যায় মরুর গভীর দিকে।
এ খবর মুহূর্তেই পৌঁছে যায় নবী ﷺ-এর কাছে।
নবী ﷺ-এর নেতৃত্বে মদিনায় একটি বিশেষ গুণ ছিল—গতি, ধৈর্য ও শৃঙ্খলা।
ঘটনা শুনেই তিনি বিলম্ব করলেন না।
তিনি ডেকে নিলেন দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষম সাহাবীদের—
আবু কাতাদা, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, আব্বাস ইবন রাঈলা, সালামা ইবন আকওয়া,এবং আরও কিছু অশ্বারোহী
এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
নবী ﷺ নিজে মদিনা সীমানা পর্যন্ত এসে সাহাবীদের রওনা করিয়ে দেন।
এ অভিযানের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র হয়ে ওঠেন সালামা ইবন আকওয়া।
তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্রুতগামী দৌড়বীর। উট চোরদের লক্ষ্য করে তিনি মরুপ্রান্তে একাই দৌড়াতে শুরু করেন।
তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে যুদ্ধের চিরচেনা বাক্য—
"আমি সালামা! আজ তোমাদের ধ্বংস হবে!"
তিনি তীর ছুড়ে ছুড়ে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করেন।
তারা বাধ্য হয় লুট করা উটগুলো ছেড়ে দিতে।
উট চোরদের তাড়া করতে করতে সাহাবীরা এসে পৌঁছান যী কারাদ নামে এক স্থানে।
এখানে শত্রুদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়।
সাহাবীদের দৃপ্ত অগ্রযাত্রা দেখে শত্রুরা পশ্চাৎপসরণ শুরু করে। কেউ কেউ উট ছেড়ে পালিয়ে যায়, কেউ বা মরুর অন্ধকারে হারিয়ে যায়।
আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্থির কৌশলে অবস্থান নেন।
সালামা ইবন আকওয়া সামনে থেকে শত্রুকে ব্যাহত করতে থাকেন।
অবশেষে অধিকাংশ উট ঠিকঠাক উদ্ধার করা যায়।
সাহাবীরা যখন মদিনায় ফিরে আসেন, নবী ﷺ-এর মুখে দেখা যায় সন্তুষ্টির হাসি।
তিনি তাদেরকে দোয়া করেন এবং অভিযানের দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলার প্রশংসা করেন।
এই অভিযানের তাৎপর্য:
১. মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরবদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

২. হুদায়বিয়া চুক্তির সময় মুসলিমরা দুর্বল—এই ভুল ধারণা দূর হয়।
৩. নবী ﷺ-এর বাহিনী যে যেকোনো সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে—এটি শত্রুদের মনে ভয় তৈরি করে।
৪. সালামা ইবন আকওয়া ও আবু কাতাদা-এর সাহসিকতা ইতিহাসে অমর হয়ে যায়।

খাইবার যুদ্ধ :

- উহুদ ও খন্দকের পর মদিনার চারদিকে থাকা শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি ছিল খাইবার। এখানে আশ্রয় নিয়েছিল বনু নাজিরের নির্বাসিত ইহুদি নেতারা, যারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে উসকানি দিয়ে মদিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। নবিজি ﷺ এদের ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটানোর জন্য ৭ হিজরিতে খাইবার অভিযানে রওনা হন।

খাইবার ছিল বহু কেল্লাবেষ্টিত দুর্গ-নগরী। প্রতিটি কেল্লা দখল ছিল কঠিন। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধীরে ধীরে কেল্লাগুলো ঘেরাও করতে থাকে। শুরুতে কিছু প্রতিরোধ দেখা দিলেও আল্লাহর সাহায্যে একের পর এক দুর্গ পতন হতে থাকে। সবচেয়ে শক্ত কেল্লা ছিল কামুস, যার দরজা খুলতেই মুসলিমরা প্রবল বাধার মুখে পড়ে। ঠিক তখন নবিজি ﷺ আলী ইবনু আবি তালিবকে পতাকা দেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আল্লাহ বিজয় দান করেন। আলীর অসীম সাহস, দরজাকে আঘাত করে উপড়ে ফেলার ঘটনা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

খাইবার পুরোপুরি মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে গেলে ইহুদিদের সঙ্গে সমঝোতা হয়—জমি থাকবে মুসলিমদের মালিকানায়, আর ইহুদিরা খাজনার বিনিময়ে তা চাষ করবে। এতে রক্তপাতও থেমে যায়, শান্তিকাঠামোও তৈরি হয়।

এই যুদ্ধে মুসলমানরা শুধু বিজয়ই লাভ করেনি; বরং আর্থিক শক্তিও ফিরে পায়, কারণ খাইবার ছিল উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। নবিজির ﷺ দূরদৃষ্টি ও কৌশলী নেতৃত্ব এ যুদ্ধকে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় মোড় পরিবর্তনের ঘটনায় পরিণত করে।

যুদ্ধযাত্রা শুরু :-

হুদায়বিয়া চুক্তির মাধ্যমে মক্কার সাথে আপাত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই নবীজি (সা.) মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় অন্তরায়—উত্তর দিকের ইহুদি ঘাঁটি খাইবারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। বহুদিন ধরে তারা মদিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল; খন্দকের

যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে উস্কে আক্রমণে নামিয়েছিল; আবার বনু নাজিরের বিতাড়িত নেতারাও সেখানে জমায়েত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছিল।

এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান অব্যাহত রাখা ইসলামের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

হিজরতের সপ্তম বছরে নবীজি (সা.) ঘোষণা করলেন—মুসলিম বাহিনী খাইবারমুখী হবে।

কিন্তু অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপনই রাখা হলো। সাধারণ সাহাবীরা বুঝলেন তারা উত্তরের সীমান্তে শত্রুর এক গুরুত্বপূর্ণ আস্তানায় যাচ্ছেন, তবে সুনির্দিষ্ট স্থান কেবল অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না। নবীজির এই প্রজ্ঞা ছিল, যাতে খবর আগেই শত্রুর কাছে পৌঁছে না যায়।

নবীজি (সা.) প্রায় দ্বাদশশ (১,৪০০–১,৬০০) সাহাবীকে সাথে নিলেন।

শুধু হুদায়বিয়ার অঙ্গীকারে অংশগ্রহণ করা সাহাবীরাই এই অভিযানে অংশ নিলেন—এটি ছিল তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া বিশেষ পুরস্কারের শুরু।

প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব পতাকার নিচে সংগঠিত হলো। সেনাদেরকে হালকা অস্ত্র, বর্ম ও ঢালসহ প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেওয়া হলো। যুদ্ধের সামগ্রিক সরঞ্জাম ছিল সীমিত; কিন্তু ঈমান, আনুগত্য ও শৃঙ্খলাই ছিল মুসলিম বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

যাত্রার সকাল ছিল শান্ত, কিন্তু হৃদয়ে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। নবীজি (সা.) তাঁর প্রিয় শহর মদিনা ছেড়ে উত্তরের দিকে অগ্রসর হলেন। বাহিনীর সারিতে সারিতে সাহাবীরা—মুহাজির, আনসার, বদর ও উহুদের অভিজ্ঞ যোদ্ধারা—দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

নবীজি (সা.) যাত্রার শুরুতে দোয়া করলেন—

যেন এই অভিযান মুসলিমদের জন্য জয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে এবং খাইবারের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের জাল ভেঙে দেয়।

মদিনা থেকে উত্তরে বের হয়ে সৈন্যরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। সাধারণত কোনো বাহিনী চললে শব্দ, কোলাহল, পতাকার উড়াউড়ি—সব মিলিয়ে দূর থেকেই শত্রুরা টের পায়। কিন্তু নবীজি (সা.) নির্দেশ দিলেন—

- শব্দ কম হবে
- চলাচল হবে সুশৃঙ্খল
- আগাম কোনো অবস্থান প্রকাশ করা হবে না

এই নিখুঁত সামরিক নীরবতা ছিল তাঁর যুদ্ধকৌশলের অংশ—যাতে খাইবারের দুর্গবাসীরা আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই মুসলিম বাহিনী তাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে।

অভিযানের পুরো পথজুড়ে সাহাবীরা অনুভব করছিলেন, যেন আল্লাহর সাহায্যের আলো সামনে পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। নবীজি (সা.) বলেছিলেন—

"আগামীকাল খাইবার জয় হবে।"

এই বাক্যটি সৈন্যদের মনে এক অসাধারণ শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল।

দিনের পর দিন অগ্রযাত্রার পর হঠাৎ করেই চারদিকে বিস্তৃত খাইবারের কৃষিখামার, খেজুরবাগান ও পরপর সাজানো বিশাল দুর্গগুলো দেখা দিল।

সাহাবীরা হয়তো ভাবতে পারেননি এত শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত এক শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু নবীজি (সা.) অটল আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে সামনে তাকিয়ে রইলেন—

এখনই সময় বহুদিনের ষড়যন্ত্রের শেষ করার।

আর এভাবেই খাইবার অভিযানের যাত্রা মুখোমুখি হলো ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ের শুরু।

সশস্ত্র লড়াই

:- হিজরির সপ্তম বছরে মুসলিম বাহিনী খাইবারের দুর্গসমূহের দিকে অগ্রসর হলে যুদ্ধের সবচেয়ে উত্তপ্ত ও নির্ণায়ক অংশ ছিল এই সশস্ত্র লড়াই। খাইবার ছিল বহু দুর্গে ঘেরা শক্তিশালী ইহুদি নগর, আর তাদের সৈন্যরা ছিল প্রশিক্ষিত, অস্ত্রে-শস্ত্রে সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তবুও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী একের পর এক বাধা অতিক্রম করে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

মুসলিম বাহিনী খাইবার উপত্যকায় প্রবেশ করলে ইহুদিরা প্রথমে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ভোরে ক্ষেত-খামারে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসে শহরের পাশে মুসলমানদের শিবির দেখে হতবাক হয়ে ফিরে যায়। যুদ্ধের শুরুতেই তারা বুঝে ফেলে যে এবার মুসলমানরা ফসক-ফাসাদকারী খাইবারকেই লক্ষ্য করে এসেছে।

প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয় খাইবারের প্রান্তে। কিছু ইহুদি যোদ্ধা বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামাতে চায়। সাহাবারা দ্রুত তাদের প্রতিহত করেন। এ সময় ছোট ছোট মুখোমুখি সংঘর্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের মনোবল আরও বেড়ে যায়, আর ইহুদিদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ে।

সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিল দুর্গসমূহ। প্রতিটি দুর্গ ছিল পাথরের বিশাল দেয়াল, উঁচু প্রাচীর, দূর থেকে নিক্ষেপযোগ্য বর্শা, তীর, পাথর ও গরম তেলের ব্যবস্থায় সুরক্ষিত। মুসলিম বাহিনী প্রথমে নাআইম দুর্গ অবরোধ করে। কয়েকদিনের টানা চাপ, অবরোধ ও মোকাবিলার পর ইহুদিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে দুর্গের রক্ষীরা বের হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এবং সংঘর্ষে তারা পরাস্ত হয়।

এরপর কিতফাহ দুর্গ অবরোধে মুসলিম বাহিনী আরও জোরালো আক্রমণ শুরু করে। ইহুদিরা সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সাহাবাদের ধৈর্য, সংগ্রাম ও যুদ্ধ-কৌশলের সামনে তা ভেঙে যায়।

খাইবারের যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কামুস দুর্গ, যা ছিল খাইবারের সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। এখানেই ছিল মারহাবসহ নামকরা ইহুদি যোদ্ধারা। মুসলমানরা বহুদিন অবরোধে রাখলেও এর বিশালতা ও শক্ত প্রতিরক্ষা ভেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন যে, "আগামীকাল পতাকা এমন একজনকে দেওয়া হবে যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।"

পরদিন পতাকা দেওয়া হয় হযরত আলী (রাঃ)-কে। তিনি চোখে ব্যথায় আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে নিজের পবিত্র লালা মেখে দোয়া করেন, আর মুহূর্তেই তা সুস্থ হয়ে যায়।

মারহাব ছিল খাইবারের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। সে গর্বভরে ছন্দে ছন্দে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। মারহাব বলে:

"খাইবার জানে আমি মারহাব! অস্ত্রে দক্ষ, সাহসী যোদ্ধা!"

হযরত আলী (রাঃ) জবাব দেন:

"আমি সেই ব্যক্তি, যাকে মা নাম দিয়েছিলেন হায়দার—সিংহ! আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করি।"

দুজনের যুদ্ধ শুরু হয়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আলী (রাঃ) তাঁর শক্তিশালী তরবারির এক আঘাতে মারহাবকে হত্যা করেন। এই ঘটনা খাইবারের যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর একটি।

যুদ্ধের উত্তাপে আলী (রাঃ) একসময় দুর্গের বিশাল লোহার দরজাটি শক্তি প্রয়োগে উপড়ে ফেলেন বলে বর্ণনায় আসে। সাহাবারা এ দরজাকে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে ব্যবহার

করেন। পরে কয়েকজন সাহাবী মিলেও সেই দরজাটি তুলতে পারেননি—এ দৃশ্য আলী (রাঃ)-এর শারীরিক শক্তি ও আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখিত।

মারহাব নিহত হওয়ার পর ইহুদিদের মনোবল ভেঙে যায়। একের পর এক দুর্গ পতন হতে থাকে— ওয়াতিহ, সালালিম, কামুস, নাতাহ, সুবাই—সবগুলোই পরবর্তীতে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

ইহুদিরা শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে; তারা জমিতে কাজ করবে, আর নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন মুসলমানদের দেবে—এটি খাইবারের পরবর্তী শান্তিচুক্তির ভিত্তি হয়।

খাইবারের সশস্ত্র লড়াই ছিল—

শক্তিশালী দুর্গম ইহুদি ঘাঁটির সঙ্গে সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ। আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সবচেয়ে কঠিন দুর্গ ভেদ। মারহাবের সঙ্গে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব, সাহাবাদের ধৈর্য, সাহস ও ঈমানের পরীক্ষা, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ধারাবাহিক সহায়তা। এই লড়াই মুসলমানদের শুধু বিজয়ই দেয়নি—বরং আরব উপত্যকায় মদীনার ইসমামূলক রাষ্ট্রের অবস্থানকে অতুলনীয়ভাবে শক্তিশালী করে।

মর্মান্তিক ঘটনা

:- খাইবারের দুর্গসমূহ একে একে মুসলিমদের হাতে পতনের পর ইহুদিরা পরাজিত হয়। তবে তাদের ভেতরে তখনও ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। তারা চিন্তা করতে লাগল কিভাবে মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করা যায়। ঠিক তখনই তাদের এক নারী—জাইনাব বিনতে হারিস—এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করে।

জাইনাবের বাবা, চাচা ও স্বামী—খাইবার যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যেই সে নবিজি ﷺ-কে হত্যা করতে চাইল। তাই সে একটি মোষতবিহীন মেষ (ভুনা/রোস্ট করা) রান্না করল।

সেই মেষের—

কাঁধের অংশে বিশেষভাবে বেশি বিষ মাখানো হয়েছিল

কারণ সে জানত নবিজি ﷺ কাঁধের মাংস বেশি পছন্দ করেন।

এই বিষ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ধরণের, এমনকি অল্প পরিমাণ খেলেও মৃত্যু নিশ্চিত। মুসলিম বাহিনী যখন বিজয়োৎসবের পরে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন জাইনাব বিষমাখা ভুনা মেষ নবিজি ﷺ-এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠাল।

রাসূল ﷺ এবং কিছু সাহাবি তা সামনে পেলেন। তিনি তার সামনে কাঁধের অংশটি হাতে নিলেন এবং সামান্য কামড় দিলেন।

মহান আল্লাহর কুদরতে, মেষের কাঁধটি আশ্চর্যজনকভাবে নবিজি ﷺ-কে জানিয়ে দিল: "আমি বিষমাখা! আমাকে খেও না।"

নবিজি ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে হাতে নেওয়া অংশটি ফেলে দিলেন।

কিন্তু তাঁর এক সাহাবি— বাশার ইবন বারা রা.—মাংসটি খেয়ে ফেলেছিলেন এবং অল্প সময় পরেই ভীষণ কষ্টে আক্রান্ত হন।

বিষ এতই শক্তিশালী ছিল যে তিনি কয়েকদিন ব্যথায় ভোগে শেষমেশ শাহাদাতবরণ করেন।

এই ঘটনা মুসলিমদের মাঝে গভীর বেদনা সৃষ্টি করে।

নবিজি ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন— "তুমি কেন এ কাজ করেছ?"সে স্বীকার করে বলল:

"আমি ভেবেছি—যদি তুমি সত্যিই আল্লাহর নবী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আর যদি না হও, তবে আমরা তোমাকে মেরে প্রতিশোধ নেব।"

প্রথমে নবিজি ﷺ মুহাম্মদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ক্ষমা করে দেন, কারণ নবিজি ﷺ কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেন না।

কিন্তু যখন বাশার রা. মারা গেলেন, তখন কিসাস (বিচার) হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়।

যদিও আল্লাহ তাঁকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন, তবুও বিষের প্রভাব বহু বছর শরীরে থাকে।

হাদিসে উল্লেখ আছে—বিদায় হজের আগে রাসূল ﷺ বলেন:

"খাইবারের সেই বিষ এখনো আমার শরীরে কষ্ট দেয়। মনে হয় এটি আজ আমার অবলীলায় মৃত্যু ডেকে আনছে।"

অনেকে মনে করেন—এটি ছিল তাঁর শাহাদাতের এক রূপ।

কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ

:- খাইবার অভিযানের মূল যুদ্ধ শেষ হলেও আশপাশের দুর্গ ও উপজাতিগুলো তখনও পুরোপুরি অনুগত ছিল না। নবী ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী যখন ওই অঞ্চলকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল করতে অগ্রসর হলেন, তখন আল-কুরা উপত্যকা (وادي القرى

— ওয়াদি আল-কুরা) ছিল সেই সব জায়গার একটি যেখানে ছোট-খাটো কিন্তু তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নিচে সেই ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হলো—

খাইবার বিজয়ের পর আশপাশের এলাকাকে নিরাপদ করা জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ বহু ইহুদি গোত্র ও তাদের বাকি দুর্গগুলো সরাসরি যুদ্ধে না নামলেও গোপনে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওয়াদি আল-কুরা ছিল উর্বর উপত্যকা—খেজুরবাগান, পানি, জনপদ সব মিলিয়ে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মদিনা থেকে সিরিয়ার বাণিজ্যপথও এখান দিয়ে যেত। তাই নবী ﷺ খাইবারের উত্তরে অগ্রসর হয়ে এই উপত্যকাকে নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় প্রবেশ করতেই সেখানকার ইহুদি বাহিনী হঠাৎ তীরবৃষ্টি শুরু করে। আক্রমণটি ছিল হঠাৎ, পূর্বসম্মতি বা আলোচনার সুযোগ ছাড়াই। তীব্র তীরের আঘাতে মুসলমানদের একজন সাহাবি শহীদ হন।

এই প্রথম আক্রমণই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ওয়াদি আল-কুরার লোকেরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল এবং তারা মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে সহজভাবে নিতে রাজি নয়।

নবী ﷺ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন এবং শৃঙ্খলাভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। শত্রু পাহাড়ি বাগান ও খেজুরবাগানের আড়ালে অবস্থান নিলেও মুসলমানরা দ্রুত তাদের ঘাঁটিগুলো চিহ্নিত করে ফেলে। তীর-ধনুকের পাল্টাপাল্টি চলতে থাকে, পরে হাতাহাতি ও কাছাকাছি যুদ্ধ শুরু হয়।

অল্প সময়ের মধ্যেই ইহুদিরা বুঝে যায় যে তারা টিকতে পারবে না, ফলে তারা পশ্চাদপসরণ করে দুর্গসদৃশ ঘাঁটির ভেতর গুটিয়ে যায়।

সংঘাত কয়েক ধাপ চলার পর উপত্যকার নেতারা বুঝলেন—খাইবারের মতোই এখানে যুদ্ধ টিকবে না। ফলে তারা আলোচনার জন্য লোক পাঠায় এবং নবী ﷺ-এর নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে।

নবী ﷺ শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তবে খাইবারের মতোই শর্ত ছিল—

উপত্যকার জমি, বাগান, খেজুরবাগান মুসলমানদের অধিকারে থাকবে, আর স্থানীয়রা সেগুলো চাষ করবে। উৎপাদন থেকে নির্ধারিত অংশ মুসলমানদের খাজনা হিসেবে দেবে। উপত্যকার জনগণ এ শর্তে সম্মত হয়।

আত্মসমর্পণকারী লোকদের প্রতি কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেউ জোরপূর্বক উৎখাত বা বাসচ্যুতও হয়নি। বরং যে যেভাবে শান্তিতে বসবাস করছিল, সেভাবেই থাকতে দেওয়া হয়—শুধু শাসন ও নিরাপত্তা মুসলমানদের হাতে যায়।

এই ব্যবস্থার ফলে ওয়াদি আল-কুরা হয়ে ওঠে মুসলমানদের জন্য স্থিতিশীল ও নিরাপদ অঞ্চল, আর সেখানে বসবাসকারী ইহুদি ও অন্যান্য গোত্র শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কাজে লেগে যায়।

খাইবারের আশপাশের অঞ্চল পুরোপুরি স্থিতিশীল হলো। সিরিয়া–মদিনা বাণিজ্যপথ নিরাপদ হয়ে গেল। মুসলিম রাষ্ট্রের উত্তরের সীমানা কোনো স্থায়ী হুমকির মধ্যে রইল না। ভবিষ্যতের তাবুক বা সিরিয়া অভিযানের ভৌগোলিক ভিত্তি তৈরি হলো।

ফিরতি সফর :

- খাইবারে মূল দুর্গসমূহ পতনের পরও আশপাশের আল-কুরা ও ফাদাক এলাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ ছিল। মুসলিম বাহিনী এসব ক্ষুদ্র প্রতিরোধকে সামলিয়ে নিলে পুরো অঞ্চল কার্যত শান্ত হয়ে যায়। আশপাশের গোত্রগুলো বুঝে নেয় যে মুসলিম বাহিনী শুধু শক্তিতে নয়, ন্যায়বিচার, সামরিক শৃঙ্খলা এবং অঙ্গীকার রক্ষায়ও অনন্য। এতে তাদের মধ্যে ভীতির সঙ্গে শ্রদ্ধারও সৃষ্টি হয়।

এই পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর সামনে নতুন কোনো বড় সংঘর্ষ ছিল না। নবীজি ﷺ যুদ্ধ শেষ হওয়া নিশ্চিত করে বাহিনীকে ফিরতি সফরের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন।

ফিরতি অভিযানে মুসলিম বাহিনী তাড়াহুড়ো করেনি। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সামলে নেয়া, আহতদের পরিচর্যা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা — এসবই আগে সম্পন্ন করা হয়। খাইবারের ইহুদিরা যেহেতু কৃষিকাজ চালানোর বিনিময়ে তাদের জমিতে থাকতে পারবে, তাই তাদের সঙ্গে চুক্তি স্থিতিশীল করার কাজটিও সম্পন্ন হয়। নবীজি ﷺ নিশ্চিত করলেন যে তারা মুসলিম বাহিনীকে পিছন থেকে আঘাত করবে না এবং সামরিক ক্ষতি করার কোনো সুযোগও পাচ্ছে না। সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পর মদিনার পথে সফর শুরু হয়।

ফিরতি সফর ছিল শান্তিপূর্ণ। যাত্রাপথে প্রতিটি বিরতিতে নবীজি ﷺ বাহিনীকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, স্থানীয়দের কষ্ট না দিতে এবং কোনো গোত্রের আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিতেন।

খাইবার অভিযান ছিল দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। তাই অনেক সাহাবী ক্লান্ত হলেও বিজয়ের আনন্দ তাদের প্রাণবন্ত করে রাখে। তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়।

যদিও বড় কোনো শত্রু ছিল না, তবুও নবীজি ﷺ সতর্কতা বজায় রেখেছিলেন। কারণ খাইবার ছিল শক্তিশালী দুর্গসমূহের এলাকা, আর আশপাশের গোত্রগুলো কখনো কখনো বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিত। তাই অগ্রবর্তী, পশ্চাৎবর্তী ও পাশের দিকগুলোতে দায়িত্ব বণ্টন করে মুসলিম বাহিনী চলছিল।

যাত্রাপথের কয়েকটি স্থানে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা থাকলেও কোনো আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি — কারণ খাইবারের পতন আরব উপত্যকার রাজনৈতিক ভারসাম্য বদলে দিয়েছিল।

যাতুর রিকার যুদ্ধ

:- একদিকে বালুকাময় প্রান্তর, অপরদিকে অনুর্বর জমি। তেমন বসতিও ছিল না এখানে। যেসব বেদুইন এই মরুতে বাস করত, তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বেশ পারদর্শী ছিল। ভাড়াটে সেনা হিসেবেও কাজ করতো যুদ্ধের ময়দানে। লুটেরা হিসেবে তো তাদের জুড়ি মেলা ভার। বলছিলাম নজদ এলাকার কথা। খন্দকের যুদ্ধে এরা মুশরিকদের সাথে জোট বেঁধেছিল। গাফতানি এদের মূল গোত্র। এর কিছু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে। নিকট শত্রুদের মধ্যে এরাই শায়েস্তার বাকি ছিল। এবার তাদের পালা।

নাজেদ কোনো স্থায়ী শহর বা কেল্লা ছিল না। তাই গাফতানিরা জীবনযাপন করত যাযাবরের মতো। আক্রমণ করলে এরা বিশৃঙ্খল হয়ে এদিক ওদিক চলে যেত। সহজে ওদের সাথে পেরে ওঠা যেত না। তাই এইবার কায়া দিয়ে কাটা তুলতে হবে।

পট্টিওয়ালাদের যুদ্ধ :

- খন্দক যুদ্ধের পর আরবের প্রান্তরে মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তেমনি বিভিন্ন গোত্রের ভিতরে অসন্তোষও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে নাজদের কিছু শক্তিশালী গোত্র—ঘাতফান, মহারিব ও বানু সুলাইম—দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম কাফেলা ও মদিনা সীমান্তে হানা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের এই অস্থিরতা ও আক্রমণের

গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লে নবী করীম ﷺ প্রতিরক্ষামূলক অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। এই অভিযানের নামই হয় যাতু রিকা, বাংলায় যাকে বলা হয় পট্টিওয়ালাদের যুদ্ধ—কারণ কঠিন পাথুরে পাহাড়ে ওঠানামার কারণে সাহাবীদের অনেকেই তাদের পায়ের আঘাতস্থানে কাপড় বা পট্টি বেঁধেছিলেন।

নবী ﷺ প্রায় ছয় শ' বা সাত শ' সহচরকে সঙ্গে নেন। পথটি ছিল দীর্ঘ, শুষ্ক ও ভয়ংকর পাথুরে প্রান্তরসমৃদ্ধ। সূর্যদগ্ধ মরুভূমি পেরিয়ে তারা ধীরে ধীরে নাজদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে কোনো কোলাহল ছিল না, ছিল শুধু অব্যাহত সাবধানতা—হঠাৎ কোনো আক্রমণ নেমে আসতে পারে এই আশঙ্কায় সবাই সজাগ।

অভিযানটি ছিল পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক। উদ্দেশ্য ছিল—যে সব গোত্র মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা যেন প্রথমেই নিরস্ত হয় এবং মদিনাকে অস্থিরতায় না ফেলে।

মুসলিম সেনাদল নাজদের সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই ঐসব গোত্র তথ্য পায় যে নবী মুহাম্মদ ﷺ বড় বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাদের সাহস ভেঙে পড়ে। কেউ সরাসরি মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা পাহাড়ের চূড়া ও গভীর গিরিখাতে আশ্রয় নেয় কিংবা দূরবর্তী এলাকায় সরে যায়।

মুসলিম সেনাদল কয়েক দিন ঐ প্রান্তরে অবস্থান করে তল্লাশি চালায়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে পরিবেশ ছিল এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ ও বিপজ্জনক যে প্রতিটি মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। তাই এই অভিযানের গুরুত্ব অভিযানশাস্ত্রে অত্যন্ত বেশি।

অবস্থানকালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে যা বইটিতে আবেগঘনভাবে উল্লেখ রয়েছে। নবী ﷺ এক সাহাবীর সঙ্গে ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দু'জনে মাথার উপর একটি ডালের সাথে নবীজির তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখা ছিল। এমন সময় এক শত্রু নীরবে এগিয়ে এসে তলোয়ারটি হাতে নেয় এবং নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলে—

"হে মুহাম্মদ! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?"

নবী ﷺ অত্যন্ত শান্তভাবে বলেন—

"আল্লাহ।"

এ উত্তর শুনে লোকটির হাত কেঁপে ওঠে। তলোয়ারটি পড়ে যায়। নবী ﷺ তলোয়ার তুলে নেন, কিন্তু তাকে শাস্তি দেননি; বরং ক্ষমা করে দেন।

এই মহৎ আচরণ দেখে সে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ফিরে গিয়ে বলে—

“আমি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে ফিরে আসছি যাকে হত্যা করার মতো সাহস কোনো মানুষের নেই; আল্লাহ তাঁর রক্ষাকারী।”

এই অভিযানে নবী ﷺ সাহাবীদের ভয়ের নামাজ (সালাতুল খাওফ) পড়ান। কারণ শত্রুর আকস্মিক হামলার সম্ভাবনা ছিল বেশি। বাহিনীকে দু’দলে ভাগ করে পালাক্রমে নামাজ পড়ানো হয়—এক দল নামাজে অংশ নেয়, অন্য দল পাহারায় দাঁড়ায়।

এই নামাজ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামী বিধির এক অসাধারণ বাস্তব প্রয়োগ, যা মুসলিমদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন অবস্থান শেষে নবী ﷺ নিশ্চিত হন যে শত্রুরা আক্রমণের সাহস হারিয়েছে এবং তাদের ঐ জোট ভেঙে গেছে। ফলে অভিযান সফল হয় কোনো বড় যুদ্ধ ছাড়াই। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে।

এই অভিযান মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি, সংগঠন এবং নবী ﷺ–এর কৌশলগত নেতৃত্বকে আবারও প্রমাণ করে। শুধু আক্রমণ ঠেকানো নয়, বরং শত্রুর মনে এমন এক মর্যাদা ও ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে তারা দীর্ঘ সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি হামলার সাহস করেনি।

অপূর্ব সালাত

:- যাতু রিকা‘ অভিযানের দীর্ঘ পথযাত্রায় মুসলিম বাহিনী যখন এক দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন চারদিকে শত্রু গোত্রের তৎপরতা বেড়ে যায়। মরুপ্রান্তরে হঠাৎ আক্রমণই ছিল তাদের কৌশল। নবীজি ﷺ তাঁর সৈন্যদের অবস্থান নির্ধারণ করলেন এমনভাবে, যেখানে প্রাকৃতিক উঁচু-নিচু ভূমি কিছুটা আড়াল দেবে। কিন্তু শত্রুরা আশপাশেই ওঁত পেতে আছে—এমন খবর আসতে থাকে বারবার। সবাই প্রস্তুত, সতর্ক, তবে নামাজের সময় এসে গেছে। আর তখনই দেখা গেল ইসলামের সেই অপূর্ব বিধান—সালাতুল খাওফ, যা পরে “অপূর্ব সালাত” নামেই পরিচিত হয়ে যায়।

নবীজি ﷺ প্রথমে দুই দল বানালেন। একদল তাঁর সাথে নামাজে দাঁড়াল, আরেকদল পাহারায় রইল। চারদিকে নীরবতা, বাতাসে শুধু মরুর ধুলোর গন্ধ। পাহারাদার দল দূর থেকে সতর্ক চোখে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করছে, যাতে শত্রু আক্রমণ করতে সাহস না পায়। এদিকে নবীজি ﷺ প্রথম দলকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ শুরু করলেন। তারা তাঁর পেছনে এক রাকাত আদায় করল। রুকু-সিজদার প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ঈমানদার কাফেলার হৃদয়ে এক অদৃশ্য শান্তি নেমে আসছে—আশঙ্কার মাঝেও গভীর প্রশান্তি।

প্রথম দলের এক রাকাত শেষ হলে নবীজি ﷺ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তারাই নিঃশব্দে সরে গিয়ে পাহারার দায়িত্ব নিল। এরপর দ্বিতীয় দল তাঁর সামনে এল। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন শান্ত ও শৃঙ্খল বিনিময় হয়তো ইতিহাসে বিরল। দ্বিতীয় দল তার সাথে দাঁড়িয়ে আবার নতুনভাবে নামাজে অংশ নেয়। তারাও এক রাকাত আদায় করল তাঁর পেছনে। তারপর নবীজি ﷺ তাঁর সালাত সম্পন্ন করলেন; দ্বিতীয় দল নিজেদের বাকি রাকাত সম্পন্ন করল।

এই অপূর্ব বিন্যাস দেখে মনে হচ্ছিল—যেন মুসলিম সৈনিকরা নামাজের প্রতিটি রুকু-সিজদায় যুদ্ধের চেয়েও বড় শক্তির দিকে ফিরে গেছে। যেন আল্লাহর স্মরণ তাদেরকে এমন নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিল, যে শত্রুরা নিকটেই থাকলেও আক্রমণের সাহস পেল না। আর এ দৃশ্য শত্রুর মাঝেও ভীতি ছড়িয়ে দিল—তারা বুঝল, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, আল্লাহভীরু এবং নিঃস্বার্থ বাহিনীকে পরাজিত করা সহজ নয়।

নামাজ শেষে সবাই অনুভব করছিল, এটি শুধু ইবাদত নয়; এটি তাওয়াক্কুল ও আনুগত্যের মহা প্রকাশ। যুদ্ধের উত্তেজনা, সম্ভাব্য আক্রমণের চাপ, সব কিছুর মাঝেও মুসলিম বাহিনী এমন শান্তভাবে নামাজ আদায় করছে—এ ছবিই যাতু রিকা' অভিযানের স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে ওঠেছিল।

এই ঘটনাই পরবর্তীতে সালাতুল খাওফ-এর সুন্নাহর ভিত্তি হয়ে থাকে—যেখানে আল্লাহর পথের মুজাহিদরা যুদ্ধক্ষেত্রেও ত্যাগ করে না নামাজের নিয়ম, ত্যাগ করে না শৃঙ্খলা ও ইমানের দৃঢ়তা।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল

:- যাতুর রিকার যুদ্ধটি ইসলামি ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ একটি বড় মুসলিম বাহিনী দিয়ে মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে যাত্রা করছিলেন। এই যুদ্ধে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং নবীর দৃঢ় ঈমানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

যাত্রা শুরু থেকেই নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণকে সতর্ক করতেন যে, মানুষের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও শেষ নির্ভরতা আল্লাহর ওপরই। যাতুর রিকার পথ ছিল জঙ্গলে ঘেরা, যেখানে প্রতিপক্ষের গোপন কৌশল ও হামলার আশঙ্কা ছিল। মুসলিম

বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে কম হলেও, নবী (সাঃ) আল্লাহর সাহায্যের উপর স্থির বিশ্বাস রাখতেন।

যুদ্ধে প্রবেশের আগে নবী (সাঃ) মুমিনদের মনে করিয়ে দেন যে, যুদ্ধজয় শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি সাহাবাদের সঙ্গে দোয়া এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। যুদ্ধে মুসলিমরা দৃঢ়তা ও কৌশলের সঙ্গে লড়াই করলেও, যে ভয় ও অনিশ্চয়তা ছিল, তা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে জয়ী হয়।

নবী (সাঃ) নিজেও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকলেও নির্ভীক ছিলেন, কারণ তার হৃদয় আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণভাবে স্থির ছিল। মুসলিম বাহিনী যখন প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহর সাহায্য ও নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্যই তাদের জন্য সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হয়। মুসলিমরা বুঝতে পারে যে, বাহ্যিক শক্তি বা সংখ্যা বড় হলেও, যদি আল্লাহর সাহায্য এবং তাওয়াক্কুল থাকে, জয় অনিবার্য।

এই যুদ্ধে নবী (সাঃ) শুধু সামরিক নেতৃত্ব দেখাননি, বরং মুমিনদের মধ্যে তাওয়াক্কুল এবং বিশ্বাসের চেতনাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহাবারা যুদ্ধে প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, যার কারণে তাদের মনোবল অটুট থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় আসে।

যাতুর রিকার যুদ্ধ আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুলের একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবারা মানুষের সীমাবদ্ধতা ও আল্লাহর অসীম সাহায্যকে স্বীকৃতি দিয়ে যুদ্ধ জয় করেছিলেন।

রাজা-বাদশাদের কাছে পত্র:

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্যে পত্র

:- সম্রাট হিরাক্লিয়াস এখন জেরুসালেমে আছেন। কিছুদিন আগেই সিরিয়া জয় করেছেন তিনি। জাতশত্রু পারস্যের কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন পবিত্র ভূমি। নবী মুহাম্মদ (সা.) হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যা ছিল ইসলামের দাওয়াতের অংশ। এই পত্রটি সেই সময়ের প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে লেখা হয়েছিল। হিরাক্লিয়াস ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের শাসক, যিনি সম্রাট হিসেবে সম্রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং তিনি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

পত্রে নবী (সা.) মূলত এক ধরনের আমন্ত্রণ এবং দাওয়াত পৌঁছে দেন। তিনি হিরাক্লিয়াসকে প্রথমে তাঁর খোদার প্রতি ঈমান আনতে ও মুসলিম ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পত্রে তিনি সরাসরি বলেন যে, আল্লাহই একমাত্র সত্যের অধিকারী, এবং মানুষকে তার ইচ্ছামাফিক জীবনযাপন করা উচিত। নবী (সা.) হিরাক্লিয়াসকে সতর্ক করেন যে, তিনি যদি আল্লাহর আহ্বান গ্রহণ না করেন, তবে তাঁর জন্য আল্লাহর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

পত্রের ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ও শক্তিশালী। নবী (সা.) তাঁর প্রেরিত বার্তায় রাজনীতি ও ক্ষমতার দিক থেকে প্রভাবিত না হয়ে, সরাসরি ঈমান এবং সৎ পথে চলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি হিরাক্লিয়াসকে স্মরণ করান যে, মানব ইতিহাসে সমস্ত শক্তি অস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহর শক্তি চিরস্থায়ী। পত্রের শেষে নবী (সা.) সম্রাটকে এক শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ উপায়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
পত্রের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রাজনৈতিক শাসককে নয়, পুরো সমাজকে ইসলামের মূলনীতি ও আল্লাহর একত্বের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটি ছিল ইসলামের প্রসারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ, যা প্রমাণ করে যে নবী (সা.) ধর্মীয় বার্তা ছড়ানোর ক্ষেত্রে কেবল যুদ্ধ নয়, কূটনীতি, বুদ্ধিমত্তা এবং কথার শক্তিও ব্যবহার কর।

পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে পত্র :

- নবী মুহাম্মদ (সা.) পারস্যের সম্রাট কিসরার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন, যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর প্রজ্ঞা সম্বলিত। এই পত্রের মাধ্যমে নবীজির উদ্দেশ্য ছিল কেবল কিসরাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর একত্ব ও তার আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পত্রের ভাষা সংক্ষিপ্ত হলেও গভীর এবং মর্যাদাপূর্ণ ছিল।
পত্রে নবীজির মূল বক্তব্য ছিল আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান এবং ন্যায় ও সত্যের পথে চলার পরামর্শ। তিনি কিসরাকে সরাসরি সতর্ক করেছিলেন যে, আল্লাহর প্রতি অমান্য করলে এবং তাঁর আদেশ উপেক্ষা করলে তা সম্রাটের জন্য ক্ষতিকর হবে। পত্রে তিনি কিসরার আত্মার কল্যাণের জন্য ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন।

নবীজির পত্রের ভাষা ছিল বিনয়ী কিন্তু তীক্ষ্ণ, যা কিসরার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য যথাযথ ছিল। পত্রে নবীজি সরাসরি হুমকি দেননি, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সম্রাটকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি আল্লাহর দয়া এবং উত্তম প্রতিফলনের কথা উল্লেখ করে কিসরাকে ইসলামের মূল বার্তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই পত্র কেবল কিসরার জন্য ছিল না, বরং এটি পরবর্তী সময়ে ইসলামের মিশন এবং নবীজির কূটনৈতিক নীতি ও আধ্যাত্মিক বাণীর দৃষ্টান্ত হিসাবেও ইতিহাসে সংরক্ষিত। এটি দেখায় যে নবীজি শুধুমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং বিশ্বের শক্তিশালী রাজা ও সম্রাটদের মধ্যেও সত্য প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন।

মিশরের শাসক মুকাওকাসের উদ্দেশ্যে চিঠি :

- নবী মুহাম্মদ (সা.) মিশরের শাসক মুকাওকাস (যিনি তখন কায়রোর খ্রিস্টান পারস্যবংশীয় গভর্নর ছিলেন) কে পাঠানো চিঠি ইসলামের দার্শনিক ও নীতি প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। চিঠিতে নবীজি মূলত ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দাবি করেছেন। এর বিস্তারিত হলো:

নবীজি মুকাওকাসকে পাঠানো চিঠিতে প্রথমেই তিনি নিজেকে আল্লাহর রসূল হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, তিনি কেবল আল্লাহর আদেশ প্রচার করছেন এবং তার মেসেজ হলো শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। চিঠিতে তিনি মুকাওকাসকে সরাসরি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

চিঠির ভাষায় তিনি মুকাওকাসকে বলেন, যে আল্লাহর একত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করবে, সে নিরাপদে থাকবে; আর যারা অবিশ্বাসী থাকবে, তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি অপেক্ষা করছে। তিনি মুকাওকাসকে সতর্ক করে বলেন, এ পৃথিবীর ক্ষমতা অস্থায়ী, আল্লাহর পথে চলাই স্থায়ী শান্তি দেবে।

নবীজি চিঠিতে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে এটি কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়, বরং নৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। চিঠির মাধ্যমে তিনি মিশরের শাসককে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ এবং কায়রোর জনগণকে হিংসা-প্ররোচনা থেকে বিরত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইতিহাস অনুযায়ী, মুকাওকাস এই চিঠি পেয়ে নবীজির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন এবং এক ধরণের শান্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ইসলামে প্রবেশ করেননি, তবে

তিনি নবীজির প্রতি সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেছিলেন।

কাযা উমরাহ

:- হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল—মুসলমানরা সে বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তবে পরের বছর তিন দিনের জন্য নিরস্ত্র অবস্থায় এসে উমরাহ আদায় করবে। এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেন এবং সাহাবিদেরও প্রস্তুত হতে বলেন। মদিনায় তখন সবার মনে এক ধরনের পবিত্র উত্তেজনা—গত বছর যাদের চোখে অশ্রু ছিল, এবার তাদের চোখে দীপ্ত প্রত্যাশা।
নবীজি ﷺ দুই হাজারের মতো সাহাবিকে সঙ্গে নিলেন। তারা সবাই ইহরাম পরল, তালবিয়া পড়তে পড়তে এগোতে লাগল। পথ ছিল শান্ত, কিন্তু আবেগে ভরা। প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব হচ্ছিল—এ এক আল্লাহর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজয়ের সফর। মক্কায় প্রবেশের সময় যেন কারো হৃদয়ে প্রতিহিংসা নেই, নেই অহংকার—শুধু শান্তিপূর্ণ ইবাদতের আকাঙ্ক্ষা।
চুক্তি অনুযায়ী কুরাইশরা তিন দিনের জন্য মক্কা খালি রাখবে। তারা পাহাড়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখছিল—রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা কীভাবে সম্মান ও আনুষঙ্গিক মর্যাদায় কাবাকে কেন্দ্র করে পবিত্র কাজ সম্পন্ন করেন। তাদের চোখে মিশ্র প্রশংসা ও বিস্ময়—এই মানুষগুলোকে তারা যুদ্ধের মানুষ ভাবত, অথচ তারা এত বিনম্র।
রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় পাগড়ি বেঁধে, শান্ত অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে কাবার দিকে এগোলেন। মক্কার সেই পথগুলো, যেগুলো একসময় মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের সাক্ষী ছিল, আজ পূর্ণ সম্মানে তাদের সামনে উন্মুক্ত। নবীজি ﷺ-এর দৃশ্য সেই মুহূর্তে যেন বিজয়ীরও মহিমান্বিত, আবার আল্লাহর বান্দারও পরম বিনয়ী।
মুসলমানরা কাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফ করল অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে। নবীজির ﷺ মুখে তখন গভীর কৃতজ্ঞতা—এ কৃতজ্ঞতা স্থানগুলোতেও আজ শান্তির ছায়া।

সায়ী সম্পন্নের সময় সাহাবিরা মনে মনে বলছিল—এ হলো সেই রাস্তা, যেদিকে তারা প্রতিবার তাকিয়ে ভেবেছিল, কবে তারা মুক্তভাবে ইবাদত করতে পারবে। নবীজি ﷺ

এগিয়ে চললেন শান্ত পদক্ষেপে, যেন প্রতিটি কর্ম আল্লাহর নির্দেশাবলির একেকটি নিখুঁত আনুগত্য।
কুরাইশরা পাহাড় থেকে দেখছিল মুসলমানদের শৃঙ্খলা, ইহরামের মর্যাদা, নবীজির ﷺ নেতৃত্ব। তাদের মনে একধরনের বিস্ময়—এদের শক্তি শুধু তরবারিতে নয়, শৃঙ্খলা ও ঈমানেও। বিশেষ করে নবীজি ﷺ সাহাবিদের রমল করতে বলেছিলেন—তারা তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে দ্রুত চলল, যাতে দেহের শক্তমত্ততা প্রকাশ পায়। কুরাইশদের মনে ভয় ভর করল—এরা সত্যিই অদম্য।

চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানরা তিন দিন মক্কায় ছিল। তৃতীয় দিনের পর কুরাইশরা এসে স্মরণ করিয়ে দিলে নবীজি ﷺ অকুণ্ঠ সম্মতিতে উঠে গেলেন। কারণ চুক্তি ভঙ্গ করা তাঁর চরিত্রে নেই। তাঁর বের হওয়ার ভঙ্গিও ছিল শান্তিপূর্ণ—যেন তিনি জানিয়ে গেলেন, মুসলমানদের মর্যাদা চুক্তি রক্ষা করাতেই।
মুসলমানরা মদিনায় ফেরার পথে অনুভব করছিল—এই উমরাহ শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং নৈতিক বিজয়। হুদায়বিয়ায় যেদিন অনেকেই হতাশ হয়েছিল, আজ সেই চুক্তিই বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করল। নবীজি ﷺ–এর দৃঢ় ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা আবারও সত্য প্রতিপন্ন হলো।

তিন বীরের ইসলাম কবুল :

- মক্কার কঠিন প্রতিপক্ষ, ইসলামের তিন শক্তিমান শত্রু— খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস, এবং উসমান ইবনু তালহা। তারা তিনজনই ছিলেন বংশ, বীরত্ব ও নেতৃত্বে কুরাইশদের অগ্রণী। ইসলামের শুরুর দিক থেকে তারা নবি ﷺ–এর প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ যাদের হিদায়াত দিতে চান, তাদের অন্তরে কখন যে কোন আলো প্রবেশ করে যায়—তা নিজ তারাও বুঝতে পারেন না।
হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আরবের রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টে যায়। মুসলমানদের সুসংগঠিত শক্তি এবং নবি ﷺ–এর অনন্য নৈতিকতা কুরাইশদেরও ভাবনায় ফেলে দেয়। বিজয় যেন মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসছিল, আর কুরাইশরা ক্রমেই কোণঠাসা।
এই পরিবর্তন তিন বীরকেই গভীরভাবে নাড়া দেয়।

১. খালিদ ইবনু ওয়ালিদের অন্তরের টান :

উহুদের সেই মহান যোদ্ধা, যার কৌশলে মুসলমানদের বড় ক্ষতি হয়েছিল—তিনি নিজেই পরে স্বীকার করেন:

"আমার চোখে সত্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ﷺ-এর বিপক্ষে দাঁড়ানো আর কোনোভাবেই যৌক্তিক মনে হচ্ছিল না। আমার হৃদয়ে বারবার ভেসে আসছিল—এই মানুষ সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

অন্তরে দ্বন্দ্ব বাড়তেই থাকে। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন—আর সময় নষ্ট নয়।

২. আমর ইবনুল আসের গভীর চিন্তা :

রাজনৈতিক দূরদর্শী আমর ইবনুল আস খুব দ্রুত বুঝে ফেলেছিলেন যে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। হাবশায় আশ্রয় নেওয়ার সময় তিনি দেখেন, রাজা নাজ্জাশীও নবি ﷺ-কে সম্মান করেন। তখনই তার মন ভেঙে পড়ে। তিনি নিজেকে বলেছিলেন—"আমি কেন এমন এক সত্যের বিরুদ্ধে লড়ছি, যেটা আমি মনেই স্বীকার করে ফেলেছি?"

৩. উসমান ইবনু তালহার অন্তরের পথচলা :

উসমান ছিলেন কাবা শরিফের দরজার দায়িত্বপ্রাপ্ত বংশের একজন। নবিজিকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া দিন তিনি কঠিন কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে তার অন্তর নরম হয়ে যায়। তিনি ইসলামকে দীর্ঘদিনই সত্য মনে করতেন, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস পাননি।

একই পথে যাত্রা – মদিনার উদ্দেশে

অদৃশ্য কোনো শক্তি যেন তাদের তিনজনকে একই দিনে, একই যাত্রাপথে নিয়ে আসে। মদিনার দিকে যেতে যেতে তারা একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কথায় কথায় তারা বুঝতে পারে—সবাই একই লক্ষ্যে যাচ্ছে। তিন বীরের হৃদয় তখন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—রাসূল ﷺ-এর হাতে বায়আত দেওয়া।

মদিনায় আগমন ও হৃদয় উথাল-পাতাল করা দৃশ্য :

নবি ﷺ-এর সামনে এসে তিনজন বীর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেই তাঁর চেহারায় হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। যেন তিনি জানতেন—এই যাত্রীরা আজ ইতিহাস বদলে দিতে এসেছে।

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ সামনে এগিয়ে এসে বলেন—"হে আল্লাহর রাসূল, সত্য আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। দয়া করে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"
নবি ﷺ তাঁর বুকে হাত রাখেন এবং কোমল কণ্ঠে বলেন—"হে খালিদ, ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"
এই কথাটি খালিদের বুক ভেঙে দেয়। চোখভর্তি অশ্রু নিয়ে তিনি ঈমান গ্রহণ করেন—এবং ইতিহাসে পরিচিত হন "সাইফুল্লাহ"—আল্লাহর তলোয়ার হিসেবে।
আমর ইবনুল আসের দ্বিধা :
আমর বললেন—"হে রাসূল ﷺ, আমার শর্ত আছে। আমার আগের সব অপরাধ ক্ষমা হলে তবেই আমি হাত বাড়াবো।"
নবি ﷺ শান্তভাবে বললেন—"হে আমর, ইসলামে প্রবেশ করলে পূর্বের সব মুছে যায়। হিজরত করলে আবার নতুন জীবন শুরু হয়।"
আমরের চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ে। তিনি হাত বাড়িয়ে ঈমান গ্রহণ করেন।

উসমান এগিয়ে এলে নবি ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন—"উসমান, তুমি আজ সত্যের পথে ফিরে এলে। আল্লাহ তোমার বংশের প্রতি সম্মান রেখেছেন।"
উসমান কান্নায় ভেঙে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।
তিন বীরের হৃদয়ের পরিবর্তন—ইসলামের শক্তিতে নতুন অধ্যায়
এই তিনজনের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক বিশাল মোড়। তাদের শক্তি, জ্ঞান, বীরত্ব—সবকিছুই পরে ইসলামের পতাকা উঁচু করতে ব্যবহৃত হয়।

মূতার যুদ্ধ :

ত্যাগের মহিমা :

-নবি কারীম ﷺএর সুযোগ ছিল মূতার যুদ্ধে দূরবর্তী কাউকে সেনাপতি করার। কিন্তু তিনি কাছের লোককেই বেছে নিলেন। বললেন, এই বাহিনীর সেনাপতি হবে যাইদ ইবনু হারিসা।
তার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺবলেছেন, যাইদ আমার ভাই ও আমাদের বন্ধু। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই জাহিদ নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি এবং আমার প্রিয়দের মধ্যে একজন।

প্রায় সব যুদ্ধেই নবী কারিম ﷺএকজন চিফ কমান্ডার নিযুক্ত করে দিতেন। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হলো। বিশ্বনবি ﷺবললেন,যাইদ যদি শহীদ হয়,তাহলে জাফর হবে সেনাপতি। সেও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। আর তারপরে লোকেরা তাদের পছন্দমতো আমির বানিয়ে নেবে।

আল্লাহর নবি ﷺকেন পরপর তিনটি নাম ঘোষণা করলেন?

সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই বুঝে গিয়েছিলেন এর হাকিকত কি। এই তিন সেনাপতির কপালেই বীরের মৃত্যু নসিব হবে। তারা শহীদ হবেন। এখানে খেয়াল করার মত বিষয় আছে। নবী করিম ﷺদ্বিতীয় নম্বরে যার নাম ঘোষণা করেছেন, সেই জাফর রাদিয়াল্লাহ কিন্তু তার আপন চাচাতো ভাই। তার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন, শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণের দিক থেকে জাফর আমার কাছাকাছি। খাইবার যুদ্ধে শেষ দেখে তিনি যখন হাবশা থেকে ফিরে এলেন, তখন নবীজি বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, খাইবার বিজয় আর জাফরের আগমন এই দুটির কোন কারণে আমি আনন্দিত,তা ঠিক জানিনা। নবীজির এই প্রিয় ভাইটির ছিলেন দু'নম্বর সেনাপতি। পরপর দুজন কমান্ডার ওই ছিলেন তার খুব কাছের মানুষ। আল্লাহর নবী সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিলেন,দীনের জন্য কোরবানিটা নিজ প্রিয় লোকদের থেকে শুরু করতে হয়।

যুদ্ধ হবে রোমানদের সাথে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে। সংঘাতের আগুন তারাই জ্বালিয়েছে। দহনজ্বালা তো সইতে হবে। রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনে ভয়ানক অপরাধ। ওরা সেটাই করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺহারিস ইবনু উমায়ির রাঃ কে পত্রসহ বুসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি লেখা হয়েছিল মূলত রোম সম্রাটের নামে। বুসরা তখন রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এর গভর্নর ছিল শুরাহবিল। সে নিজেকে সম্রাটের অতি আস্থাভাজন প্রমাণ করতে গিয়ে নবীজি দূতকে সে হত্যা করেছিল। কোন মুসলিম যদি অন্যায় ভাবে নিহত হয়, তবে তার বদলা নেয়া উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আদায় করতে ৩০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী যাচ্ছে সিরিয়ার দিকে। ৮ম হিজিজ জুমাদাল উলা মাসে শুরু হয় তাদের যাত্রা।

যুদ্ধের জন্য সাদা পতাকা বেঁধে যাইদের হাতে তুলে দিলেন প্রিয় নবী ﷺ। বরাবরের মতোই মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে কিছু জরুরী নসিহত পেশ করলেন :-

*যে জায়গায় হারিসকে শহীদ করা হয়েছে, সেখানে পৌঁছে লোকদের আগে ইসলামে দাওয়াত দেবে।
*যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয়, সেটা হবে চমৎকার সিদ্ধান্ত। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য নিয়ে জিহাদ শুরু করবে।
*সাবধান! কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করবে না।
*আমানতের খেয়ানত করবে না।
*শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং গির্জার পাদ্রীদের হত্যা করবে না।
*খেজুর কিংবা অন্য কোন গাছ কাটবে না।
*বাড়িঘর ও দালানকোঠা বিনষ্ট করবে না।

জাহান্নামের ভয় :

- মূতার যুদ্ধ ছিল এমন এক কঠিন অবস্থা, যেখানে মুসলিম বাহিনী মাত্র তিন হাজার; আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের লক্ষাধিক প্রশিক্ষিত সৈন্য। বাহিনীর সংখ্যাগত বৈষম্য এতটাই প্রবল ছিল যে অনেক সাহাবির অন্তরে স্বভাবতই জীবনের ভয় ও মৃত্যুর আঁধার নেমে এসেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তেই নবীজির (সা.) প্রেরিত সেনাবাহিনীকে যেসব বাণী ও চেতনা শক্ত করে রেখেছিল—তার মাঝে অন্যতম ছিল জাহান্নামের ভয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা।
সাহাবিরা বুঝতে পেরেছিলেন—এই যুদ্ধ শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান নয়; বরং ঈমান ও অবাধ্যতার সীমানায় দাঁড়িয়ে নেয়া কঠিন এক পরীক্ষা। যে মুহূর্তে বাহিনীর তিনজন ধারাবাহিক সেনাপতি শাহাদাতবরণ করলেন—যাফর ইবনু আবি তালিব (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.), ও যায়েদ ইবন হারিসা (রা.)—সেই মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর ওপর চাপ নেমে এল প্রবল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। যোদ্ধাদের মনে মৃত্যুভয় স্বাভাবিকভাবেই উঁকি দিল।
কিন্তু এই ভয় ছিল দুই রকম—
একদিকে ছিল শত্রুর তরবারি ও মৃত্যুর ভয়;
অন্যদিকে ছিল জাহান্নামের ভয়, যা তাদের বুককে আগুনের মতো দগ্ধ করত, আবার একই সঙ্গে সোজা রাস্তার দিকে ঠেলে দিত।
যাফর (রা.) যখন দুই হাত কেটে যাওয়ার পরও পতাকা বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর অন্তরে যে অবিচলতা ছিল—তা ছিল নিজের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতি হলে

আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেননি; কারণ মৃত্যু তো একদিন যেকোনোভাবেই আসবেই। কিন্তু দায়িত্ব ফসকে গেলে যে ঈমানের ক্ষতি হবে—সেই ভয় তাকে শক্ত রেখেছিল।

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)—যুদ্ধে নামার আগে নিজের নফসকে বারবার তিরস্কার করছিলেন। তাঁর জিহ্বায় উচ্চারিত সেই কবিতাগুলো ছিল শুধু আত্মপ্রেরণা নয়—বরং জাহান্নামের আঁধার থেকে আত্মাকে বাঁচানোর তীব্র আকুলতা। তিনি নিজের মনের ভয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন—

"হে নফস, তুমি কি দুনিয়ার সামান্য জীবনের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছ? তোমার সামনে তো জান্নাত রয়েছে, আর পিছিয়ে গেলে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।"

এই ভয়ের শক্তিই তাঁকে মৃত্যুর মুখেও স্থির রাখল।

যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা যখন নিজের জীবনকে হাতে নিয়ে দাঁড়াল, তখন কারও লক্ষ্য ছিল না—বীরত্বের খ্যাতি, দুনিয়ার জয় বা রাজনৈতিক প্রভাব। তাদের অন্তর জুড়ে ছিল এক কঠোর বাস্তবতা—

"এখানে একটু পিছু হটলে আল্লাহর সামনে বড় জবাবদিহি আছে।"

মূতার যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তারা উপলব্ধি করছিল—যদি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, যদি ইসলামকে অপমানিত হতে দেয়, তাহলে মৃত্যু নয়, তারও ভয়ঙ্কর কিছু রয়েছে—জাহান্নামের ভয়াল অগ্নি এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির ফল।

এই ভাবনা তাদের বুককে আগুনের মতো প্রজ্জ্বলিত করেছিল; কিন্তু তা ধ্বংসের আগুন নয়—বরং সাহসের, তাওয়াক্কুলের এবং ঈমানের আগুন।

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রা.) যখন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং কৌশলী সরে দাঁড়ানোর মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করলেন, তখন সাহাবারা বলেছিলেন—

"আমরা যুদ্ধ থেকে পালাইনি; আমরা আল্লাহর কৌশলের কাছে মাথা নত করেছি। কারণ জাহান্নামের ভয় আমাদেরকে দায়িত্ব ফেলে পালাতে দেয়নি।"

এইভাবেই মূতার যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত সাহাবিদের অন্তরে জাহান্নামের ভয়কে জাগিয়ে তুলেছিল—যা তাদেরকে মৃত্যুর মাঠেও আল্লাহর পথে অটল রাখার প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের দৃঢ়তার উৎস ছিল—দুনিয়ার ক্ষতি নয়, বরং আখিরাতের ভয় এবং জান্নাতের আশা।

:- মূতার যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনীর তাবুতে যেন এক অদৃশ্য নীরবতা নেমে এসেছিল। হাজারো মাইল দূরের বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ—একে কেউ হেলাফেলা করার কথা ভাবেনি। কিন্তু আল্লাহর পথে দাঁড়ানো এই ছোট বাহিনী ভয়কে তাদের অন্তরে জায়গা দিতে রাজি হয়নি। সেই কঠিন মুহূর্তে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবীজির প্রথম মনোনীত সেনাপতি—জায়েদ ইবন হারিসা রা. তিনি দাঁড়িয়ে যখন সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ শুরু করলেন, তখন তাঁর কণ্ঠে ছিল দৃঢ়তা, অন্তরে ছিল ঈমানের অগ্নিশিখা।

জায়েদ বললেন—"হে আল্লাহর সৈনিকগণ! আমরা মুহাম্মদের উম্মত, সত্যের আহ্বানকারী। আজ আমরা কোনো রাষ্ট্রের সম্পদের লোভে বের হইনি। আমাদের সামনে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য, কিন্তু আমাদের অন্তরে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি—আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল। আমরা এখানে এসেছি একটি নিহত দূতের রক্তের প্রতিশোধে, অপমানের জবাবে নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। জান্নাতের ডাক আমাদের সামনে, আর দুনিয়ার ভয় আমাদের পেছনে।"

ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদের চোখে অদ্ভুত দৃঢ়তা ফিরে আসে। তাঁরা যেন দৃশ্যমান করে ফেলছিলেন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও নবীজির ওহির নির্দেশ। জায়েদ স্মরণ করিয়ে দিলেন, নবীজি তাঁদেরকে তিনজন সেনাপতি মনোনীত করেছেন—জায়েদ শহীদ হলে শাসন যাবেন জাফর ইবন আবি তালিব রা.-এর হাতে, আর জাফরও যদি পতিত হন তবে নেতৃত্ব নেবেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা.। এই মনোনয়নই ছিল প্রমাণ যে যুদ্ধ কত কঠিন হবে, আর রসূলুল্লাহ ﷺ কত দূরদৃষ্টি রেখে তাঁদের প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। এরপর ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন জাফর ইবন আবি তালিব রা. তাঁর কণ্ঠে ছিল অগ্নির মতো দীপ্তি। তিনি বললেন—"হে মুসলিম বাহিনী! তোমরা কি জানো আমরা কোন ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি? এই ময়দান শুধু রোমের বাহিনীর সামনে নয়; এই ময়দান ফেরেশতাদের সাক্ষী হওয়ার ময়দান। আজ আমাদের তলোয়ার চলবে সেই ঈমানের শক্তি দিয়ে, যা বদরের দিনে প্রবল কালো মেঘ হয়ে নেমে এসেছিল। আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে দিলে তার বিনিময় আল্লাহই দেবেন—যে প্রতিদান দুনিয়ার কোনো রাজ্য সমান নয়।" তাঁর ভাষণ যোদ্ধাদের বুকে এমন আগুন জ্বালিয়ে দিল, যেন সামনে দশগুণ সৈন্যশক্তিও তাদের আন্দোলিত করতে পারবে না।

সবশেষে উঠে দাঁড়ালেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা. তাঁর কথায় ছিল কবিতার সৌরভ, মুজাহিদের হৃদয়ের গভীর স্পন্দন। তিনি বললেন—"হে আমার ভাইয়েরা, জানো তোমাদের সামনে যা আছে তা মৃত্যু নয়—বরং আল্লাহর দরবারে সম্মানের দরজা। ভয় করো না; লড়াই করো সেই সত্যের জন্য যা নিয়ে তোমরা ঘর ছেড়েছ। আল্লাহর কসম, এ মাটিতে আমার মৃত্যু হলে তা হবে আমার জন্য সাফল্য। কারণ দুনিয়ার জীবন ক্ষণিক, কিন্তু আল্লাহর কাছে পৌঁছানো জীবন অনন্ত।"

রাওয়াহার কথায় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এমন তেজ ছড়িয়ে পড়ল, যেন রোমান বাহিনীর ভয়ংকর সংখ্যা আর যুদ্ধসাজ তাদের দৃষ্টির সামনে ছোট হয়ে গেল। শিবিরের চারদিকে তখন শুধু এক সুর—"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক।"

এই ভাষণগুলোর পর মুসলিম বাহিনী শুধু সৈনিক ছিল না; তারা হয়ে উঠেছিল ঈমানের প্রজ্জ্বলিত মশাল—যারা জানত মারা গেলে জান্নাত, আর বেঁচে গেলে ইসলামের বিজয়। তাদের হৃদয়ে নবীজির ভালোবাসা, আল্লাহর সাহায্যের আশা এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মিলেমিশে এমন সাহস গড়ে তুলেছিল যা সংখ্যায় অপ্রতুল হলেও শক্তিতে ছিল অপরাজেয়।

দুর্দান্ত লড়াই, অসাধারণ বিজয় :

- মদিনায় কুসাইব গোত্রের দূতের হত্যার খবর পৌঁছালে নবী ﷺ–এর হৃদয়ে গভীর ব্যথা জাগে। আল্লাহর বার্তা বহনকারী একজন শান্তিপ্রিয় দূতকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা—এ ছিল আন্তর্জাতিক রেওয়াজ ভাঙার সামিল। তাই তিনি এক হাজারেরও বেশি সাহাবিকে নিয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তিন বীর—জায়েদ ইবন হারিসা, জাফর ইবন আবি তালিব, এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা—কে ধারাবাহিকভাবে সেনাপতি নিযুক্ত করে মূতার উদ্দেশ্যে পাঠান।

মূতায় পৌঁছে মুসলিম বাহিনী যখন সত্যিকার অবস্থা দেখল, তারা হতবাক হয়ে যায়। কয়েক হাজার নয়—বরং দশ হাজার থেকে এক লক্ষ রোমান ও আরব খ্রিস্টান বাহিনী সাদা পোশাকে ঢাল-তলোয়ার ঝলকাতে ঝলকাতে ময়দান ভরিয়ে রেখেছে।

ধূলিধূসর আকাশের নিচে মুসলিমদের ছোট্ট বাহিনী যেন সমুদ্রের কিনারে দাঁড়ানো এক হাতভর্তি বালুকণা।

কিন্তু ভয় নয়—তাদের বুকে লুকিয়ে ছিল আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, নবীর ﷺ প্রতি আনুগত্য এবং শাহাদাতের মধুর আকাঙ্ক্ষা।

* জায়েদ ইবন হারিসা-র দুর্দান্ত নেতৃত্ব :

ময়দান গরম হতে না হতেই সাহাবিরা দেখল—জায়েদ রা. হাতে কালো পতাকা উড়িয়ে শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

রোমান বাহিনীর ভারী অস্ত্রের সামনে এক সাহসী সিংহের মতো লড়ে গেলেন তিনি, মুসলিম সারিকে ভেঙে যেতে দেননি।

অবশেষে অসংখ্য তীর তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে তাকে শাহাদাতের কোলে নিয়ে গেল, কিন্তু তার পতাকা নিচে পড়ল না।

পতাকা হাতে নিলেন দ্বিতীয় সেনাপতি—জাফর ইবন আবি তালিব রা.।

* জাফর রা.-র বীরত্ব: দুই হাতে পতাকা ধরে শাহাদাত :

জাফর রা. ছিলেন ত্রিশের কোঠা পেরোনো এক অনন্য সাহসী যোদ্ধা। পতাকা হাতে নিয়ে তিনি এমন বীরত্ব দেখাতে লাগলেন যে বরং শত্রুর বুক কাঁপতে লাগল।

এক পর্যায়ে রোমান সেনারা তার ডান হাত কেটে ফেলল।

তিনি পতাকাটি বাঁ হাতে তুলে নিলেন।

বাঁ হাতও কেটে গেল।

তখন তিনি রক্তমাখা বাহুর অবশ অংশে পতাকা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন—

"এই পতাকা পড়বে না—যতক্ষণ জাফরের দেহে প্রাণ আছে"—এই দৃঢ়তায়।

অবশেষে ৭০টিরও বেশি আঘাত তার শরীরে বিদ্ধ ছিল—তিনি শহীদ হলেন, কিন্তু পতাকা মাটিতে পড়ল না।

* আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা-র আত্মোৎসর্গ :

তৃতীয় সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রা. এক মুহূর্ত থামলেন না। কুরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

নিজেকে আরামে ফেরানোর সুযোগ না দিয়ে তিনি হৃদয়ের কম্পনকে দৃঢ়তায় পরিণত করলেন—

"হে আমার নফস, আজ রবের জন্য প্রাণ দাও, পিছিয়ে যেয়ো না।"

অবশেষে তিনিও শহীদ হলেন।

মুসলিম বাহিনীর হৃদয় ভারী হয়ে গেল। তিন বীর একে একে পতন করায় মুহূর্তটি খুব সংকটময় হয়ে ওঠে।

* খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ – আল্লাহর তরোয়াল:

এবার মুসলিমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়—যুদ্ধের মাঝে খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা.-কে প্রধান করা হয়।

তিনি নবাগত মুসলিম, কিন্তু অতুলনীয় সামরিক মেধা ও সাহস ছিল তার মধ্যে।

তিনটি কৌশলে যুদ্ধ ঘুরে গেল :

১. সৈন্যদের ডান-বাম নামিয়ে নতুন বিন্যাস করা। রোমানরা মনে করল মুসলিমদের নতুন সহায়তা এসে পৌঁছেছে।

২. রাতের আঁধারে অবস্থান পরিবর্তন

রোমান বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩. অপ্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণ

খালিদ রা. অত্যন্ত হিসাব করে আঘাত করলেন, যার ফলে রোমান বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করে।

একদিনে তার তলোয়ার ভেঙে গেল নয়বার—এতবার তিনি লড়ে গেছেন।

শেষতক রোমানরা পিছিয়ে গেল, মুসলিমরা নিরাপদে ফিরে এল—এটাই ছিল অসাধারণ বিজয়।

মদিনার শিশুরা আনন্দে রাস্তায় দৌড়াতে লাগল। নবী ﷺ নিজে দাঁড়িয়ে সাহাবিদের অভ্যর্থনা করেন।

তিনি বিজয় ঘোষণা করেন এই বলে—

“তোমরা বিজয়ীদের মতো ফিরে এসেছ।”

কারণ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল প্রতিশোধ নয়-বরং ইসলামের সম্মান রক্ষা, দূতের রক্তের জবাব এবং রোমানদের আগ্রাসন ঠেকানো।

এ লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছিল বীরত্ব, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর সাহায্যে।

মূতার যুদ্ধের অসাধারণ বিজয়ের সংখ্যায় কম হলেও ঈমানের শক্তিতে শত্রুকে পরাভূত করা। তিন বীরের নজিরবিহীন শাহাদাত। খালিদ রা.-র কৌশলী নেতৃত্ব যুদ্ধে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। মুসলিম বাহিনীর প্রাণ বাঁচিয়ে কূটনৈতিক বিজয় অর্জন। রোমান সাম্রাজ্যের মনে মুসলিমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভয় সৃষ্টি।

মক্কা বিজয় :

মক্কায় প্রবেশ :-

রামাদান মাসের স্নিগ্ধ ভোর। দশ হাজার সুশৃঙ্খল সাহাবির বাহিনী যেন মরুপ্রান্তরকে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু সেই বিশাল শক্তির মাঝেও আগুন নেই, অহংকার নেই; আছে শান্তি ও সালামতের আভাস। বাহিনীর অগ্রভাগে নবীজি ﷺ—কিন্তু বিজেতার অহংকারে মাথা উঁচু করে নয়; বরং মাথা নত, আল্লাহর অনুগ্রহের ভারে নম্র হয়ে। উটের পিঠে বসা অবস্থায় চিবুক প্রায় কাঁধে লেগে আছে। ঠোঁটে তাসবীহ—"আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশুল-আখিরাহ।"

নবীজি ﷺ মক্কার উপত্যকায় প্রবেশ করার মুহূর্তটি ছিল ইতিহাসের এক মোহময় দৃশ্য। যে নগর তাঁকে একদিন নির্যাতন করেছিল, যে নগর তাঁকে সন্ধ্যার আঁধারে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল—আজ সেই মক্কাই তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে শান্তির দূত হিসেবে। শহরের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুলার আস্তরণ, মানুষের চোখে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার মিশ্র প্রতিচ্ছবি—আজ কি প্রতিশোধ আসবে? কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর ভরা ক্ষমাশীলতায়।

মুখে যুদ্ধের ধ্বনি নয়—বরং ঘোষণা, "আজ কারও ওপর আক্রমণ নয়। আজ আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন। আজ মক্কা নিরাপদ।"

সাহাবারা চারদিক ঘিরে এগোতে লাগলেন, কিন্তু তলোয়ার খোলা নয়; খাপেই। নবীজি ﷺ-এর আদেশ ছিল স্পষ্ট—মক্কাকে রক্তের গন্ধে নয়, শান্তির সুবাসে মুক্ত করতে হবে। রাসুল ﷺ স্বপ্নের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে কাবাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। শহরের প্রতিটি বাঁকে তিনি যেন পুরোনো স্মৃতি অনুভব করছিলেন—শু'বে আবি তালিবের ক্ষুধার্ত দিন, কাবার সামনে কুরাইশদের উপহাস, রাস্তার ধুলায় নিক্ষিপ্ত অপমান। তবু তাঁর চোখে নেই কোনো ক্রোধ; আছে শুধু আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

কাবার সামনে পৌঁছে উট থামল। রাসুল ﷺ নেমে সিজদার ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন—আল্লাহর এই মহা বিজয়ের বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। তারপর তিনি হাতে ধরা খোঁটা দিয়ে কাবার চারপাশের মূর্তিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। কুরাইশের শতবর্ষের কুফরি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো—"জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল। ইন্নাল বাতিলা কান্যা যাহুকা।"

সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলীন হয়েছে।

এই আয়াতের শব্দে শহরের বাতাস যেন পাল্টে গেল—মক্কায় নতুন যুগের সূচনা ঘটলো।

চারদিকে জড়ো হওয়া মক্কাবাসীরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রাসুল ﷺ-এর চূড়ান্ত ঘোষণার প্রতীক্ষা করছিল। দুনিয়ার ইতিহাস এখানেই অন্যদিকে মোড় নেয়। নবীজি ﷺ বলেন—"আজ তোমরা মুক্ত। যাও, তোমাদের জন্য কোনো ভর্ৎসনা নেই।"

যাদের হাতে ছিল তাঁর রক্তের স্মৃতি, যাদের কারণে ঘর হারিয়েছিলেন—তাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। মক্কা বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এভাবেই রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন—তলোয়ারের ঝনঝনিতে নয়, ক্ষমার আলোয়। জয়কে তিনি করলেন দয়া, শত্রুকে করলেন ভাই, আর মক্কাকে করলেন শান্তির নগরী।

অনুপম ক্ষমার দৃষ্টান্ত

:- মক্কার আকাশে তখন নতুন সকালের আলো। দীর্ঘ আট বছর আগে যে শহর তাঁকে নির্যাতন করে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, সে শহর আজ তাঁর সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে। হাজার হাজার সাহাবি নিরবে তাকিয়ে আছে—আজ কি প্রতিশোধের দিন? আজ কি রক্তের হিসাব রক্তে মিটবে? কিন্তু যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি ছিলেন প্রতিশোধ নয়—রহমত ও ক্ষমার মূর্তি, মুহাম্মদ ﷺ।

১. বিজয়ীর মস্তক নত — প্রতিহিংসার নয়, করুণার ঘোষণা

রাসুলুল্লাহ ﷺ শহরে প্রবেশ করলেন মাথা এতটাই নত করে যে তাঁর পবিত্র দাড়ি উটের কাঁধ ছুঁইছুঁই। বিজয়ের মুহূর্তে যেখানে মানুষ অহংকারে বুক ফুলিয়ে হাঁটে, সেখানে নবিজি ﷺ নত হয়ে বললেন,

"আজ রহমতের দিন।"

এ দিন কুরাইশের বহু নেতা ভাবতে পারেনি যে আজ তারা জীবিত থাকবে। যারা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, বর্জন করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে—তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিশোধের একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

২. শত্রুরা জমায়েত—সন্ত্রস্ত চোখ,থরথর কাঁপা হৃদয়

কাবার পাশে কুরাইশের নেতারা একত্র হলো। কেউ মাথা নিচু করে, কেউ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষা করছে।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন:

“হে কুরাইশ! তোমরা ধারণা কর, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করবো?”
তারা কাঁপা কণ্ঠে বলল:
“আপনি সদাশয় ভাই, সদাশয় ভাইয়ের সন্তান।”
নবিজি ﷺ সেই মুহূর্তে ইতিহাসের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার ঘোষণা দিলেন।
৩. ইতিহাসের অমর ঘোষণা
“আজ তোমাদের ওপর কোনো দোষারোপ নেই। তোমরা মুক্ত। তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সর্বজনীন ক্ষমা।”
এ যেন ইউসুফ আঃ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন সেই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি। নবিজির ﷺ হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রতিশোধের তৃষ্ণা জাগেনি।
৪. যারা সবচেয়ে বড় অপরাধী, তারাও নিরাপদ
মক্কার অনেক কঠিন শত্রু ছিল—
যারা তাকে পাথর ছুঁড়ে রক্তাক্ত করেছে,
যারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, যারা তাঁর সাহাবিদের নির্মমভাবে নির্যাতন করেছিল।
তাদের অনেকেই লুকিয়ে ছিল—
স্বপ্নেও ভাবেনি ক্ষমার ঘোষণা আসবে।
কিন্তু নবিজি ﷺ ঘোষণা দিলেন:
“যে কেউ আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে—সে নিরাপদ।
যে কেউ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে—সে নিরাপদ।
যে কেউ কাবায় আশ্রয় নেবে—সে নিরাপদ।”
এই ঘোষণার পর গৃহে গৃহে শান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের চোখে অশ্রু, হৃদয়ে স্বস্তি—এমন বীরত্ব আর ক্ষমার মিশ্রণ আর কোথায় দেখা যায়!
৫. ব্যক্তিগত প্রতিশোধও বাতিল — বিলাল রা. এর আযান
যারা বিলাল রা.কে নির্যাতন করেছিলেন, যাদের হাতের অমানবিক অত্যাচারে ‘আহাদ, আহাদ’ ধ্বনিতে আকাশ ফেটে গিয়েছিল—আজ তাদের সামনে বিলাল রা.কে নবিজি ﷺ কাবার ছাদে উঠিয়ে আযান দিতে বললেন।
প্রতিশোধ নয়—এ ছিল সত্যের বিজয়, মানবতার উদারতা।
৬. হিন্দা ও অন্যান্য শত্রুরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত

হিন্দা—যিনি উহুদের প্রান্তরে হামযা রা.-এর দেহ বিদ্ধ করেছিলেন—তিনিও পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি ﷺ তাঁকে চিনেও কোনো কঠিন বাক্য বলেননি।

ইকরিমা—যিনি বহু আক্রমণের নেতা—তিনিও ক্ষমা পেলেন।

সুফওয়ান ইবন উমাইয়ার মতো ভয়ংকর শত্রুর জন্যও নবিজি ﷺ নিরাপত্তার অঙ্গীকার পাঠালেন।

৭. বিজয় নয়—মানবতার জয় ইতিহাসে এমন উদারতা কেউ দেখেনি।

যে নগরী তাঁকে বের করে দিয়েছিল—সেই নগরীর জন্য তিনি বয়ে আনলেন করুণা, শান্তি ও আলো।

মক্কার মানুষ বুঝল—

এ বিজয় তরবারির নয়, চরিত্রের; রক্তের নয়, ক্ষমার।

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ :

- মক্কার বিজয়ের মুহূর্ত ছিল ইসলামের ইতিহাসে অনন্য শান্তি, প্রজ্ঞা ও মানবিকতার দৃশ্য। নবিজি ﷺ মাথা নত করে বিনয়ভরে কাবায় প্রবেশ করেন এবং সেদিন ঘোষণা করেন:

"আজ তোমরা মুক্ত — কোনো প্রতিশোধ নেই।"

কিন্তু এর মধ্যেও কিছু ব্যক্তির অপরাধ ছিল এমন ভয়াবহ, এমন হিংসাত্মক ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতায় ঠাসা, যে তাঁদেরকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সকল অপরাধ ছিল সরাসরি বৈশ্বিক মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, নবিজির হত্যার ষড়যন্ত্র, মুসলিম নারীদের ওপর নির্মম নির্যাতন, এবং কুরআন-নবুয়তের বিরুদ্ধে পৈশাচিক বিদ্রূপের মতো সীমালঙ্ঘন।

১. মারাত্মক রক্তপাত ঘটানো ও নির্যাতনের অপরাধ মক্কার কিছু লোক ছিলেন যারা: নবিজিকে ﷺ হত্যার জন্য বারবার চেষ্টা করেছে। মুসলিমদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। নির্যাতনে বহু সাহাবির মৃত্যু ঘটিয়েছে। মুসলিম নারীদের ওপর অসহ্যতম শারীরিক নির্যাতন করেছে। এই অপরাধগুলো এতই জঘন্য ছিল যে শুধু যুদ্ধ নয়—মানবতার সাথেও সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. কুরআন ও নবুজ্জীবনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রূপ কিছু ব্যক্তির অপরাধ ছিল—

কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করা। নবুয়তকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করা। ইসলামের অবমাননায় জনসমক্ষে প্রচার চালানো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে যুদ্ধ

প্ররোচনা দেওয়া। এদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু রসিকতা নয় — মুসলিমদের মনোবল ভেঙে দেওয়া, দ্বীনকে কলুষিত করা এবং বিদ্রোহ উস্কে দেওয়া।

৩. বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গের অপরাধ মক্কার কিছু নেতা:

হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙে প্রতারণামূলক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। রাতে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। গোপনে মুসলিমদের শত্রুদের অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দেয়। এই কাজগুলো ছিল শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং যুদ্ধ-আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

৪. যেসব নারী নির্দয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচনার নেতৃত্ব দেয় কিছু নারী:

ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারমূলক কবিতা রচনা করতো। মুসলিমদের হত্যায় পুরুষদের উসকে দিতো। নবিজির পরিবারকে অপমান করত। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলত। তাঁদের অপরাধও সাধারণ উস্কানি নয়—হত্যা, রক্তপাত এবং বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার সমান।

৫. ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করা ও হত্যার নির্দেশ দেওয়া

মক্কার কয়েকজন ছিল যারা—

কাবার কাছেই মুসলিমদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। নবিজিকে ﷺ হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। আগত মদিনায় নবী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠন করেছিল। এ সব অপরাধ ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো—যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল অপরাধের কারণে ক্ষমার অযোগ্য, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীতে এসে:

ইসলাম গ্রহণ করে,নিজেদের ভুল স্বীকার করে, নবিজির সামনে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চায়। আর নবিজি ﷺ—যিনি রহমতের নবী—তাঁদের অনেকে ক্ষমা করে দেন।

যার ফলে, যাদের অপরাধের পরিমাণ পাহাড়সম ছিল, তাঁদের কিছুজনও নতুন জীবন ফিরে পান।

বিজয়ের পর ভাষণ ও ইসলাম কবুল

:- মক্কা বিজয়ের সেই দিন আল্লাহর রাসূল (সা.) কাবার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এমন এক ভাষণ দিলেন, যা শুধু বিজয়ীর ঘোষণা ছিল না—বরং মানবতার মুক্তির ঘোষণা। মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ। দীর্ঘ ২১ বছরের নির্যাতন, দেশছাড়া, হত্যাচেষ্টা, যুদ্ধ—সবকিছুর পর আজ মক্কা শান্তির ছায়াতলে দাঁড়ানো।

কাবার চাবি হাতে নিয়ে, দরজা উন্মুক্ত রেখেই রাসূল (সা.) মানুষের সামনে দাঁড়ালেন। মানুষের মুখে আতঙ্ক—তারা ভাবছিল, আজ হয়তো প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে। কিন্তু নবিজির (সা.) মুখে ফুটল উপমারহিত দয়া।

তিনি বললেন—"হে কুরাইশ! আজ তোমাদের অবস্থা কী মনে কর?"

তারা মাথা নিচু করে বলল—"আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র। আমরা আপনার নিকট শুধু ভালোই আশা করি।"

তখন রসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করলেন সেই কালজয়ী বাক্য—

"আজ তোমাদের প্রতি কোনো তিরস্কার নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।

যাও—আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।"

এই ঘোষণা শুধু ক্ষমাই ছিল না—বরং প্রতিশোধের ইতিহাসকে শেষ করে মানবতার নতুন যুগের সূচনা।

এরপর নবিজি (সা.) মক্কার জমিনে সগৌরবে বললেন—"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই।

আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন এবং একাই সব দলকে পরাস্ত করলেন।"

তিনি ঘোষণা করলেন—

জাহেলিয়াতের সব গর্ব ধূলায় লুটিয়ে গেছে। রক্তের বদলার নিষ্ঠুর রীতি বাতিল। মক্কা শান্তির শহর। মুসলমানের রক্ত, সম্মান, সম্পদ—সবই নিষিদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ। কাবার পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। মানুষের জীবন ও ধর্ম নিরাপদ।

এই ভাষণ ছিল সত্যিকার অর্থে ন্যায়, দয়া ও ইসলামের শান্তির ঘোষণা।

মক্কাবাসীর ইসলাম কবুল – হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য :

এই ভাষণ শেষ হওয়ার পর দৃশ্য বদলে গেল। যারা একটু আগে ভয়ে কাঁপছিল, তারা এখন অনুভব করল—যে মানুষ এত অত্যাচারের পরও প্রতিশোধ নিলেন না, তিনি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত রসূল।

মক্কাবাসীরা দলে দলে এগিয়ে এল।

১. বহু বছরের শত্রুরা চোখের জল নিয়ে এগিয়ে এল

যারা নবিজিকে একসময় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, যারা তাঁর অনুসারীদের হত্যা করেছিল, যারা বদর ও উহুদের মাঠে যুদ্ধ করেছিল—আজ তারাই কেঁদে কেঁদে বলল—

“আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি আল্লাহর রাসূল।”তাদের মুখে ছিল লজ্জা, নবিজির (সা.) মুখে ছিল মহারহমত।

২. নবিজির (সা.) অমায়িক আচরণ হৃদয় পরিবর্তন করল

তিনি কারও পিছু নিলেন না, কারও অতীত তুলে ধরলেন না।

বরং বললেন—“যে কাবার ভেতরে আশ্রয় নেবে, নিরাপদ।

যে নিজ ঘরে থাকবে, নিরাপদ।

যে আবু সুফিয়ানের ঘরে যাবে, সেও নিরাপদ।” এই উদারতা শুনে শত্রুরাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

৩. সাধারণ মানুষ আনন্দে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল

রাস্তায় রাস্তায় উচ্চারিত হতে লাগল শাহাদাত— “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।”

পুরো মক্কায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেল।

৪. প্রধান নেতাদের ইসলাম গ্রহণ

মক্কার বহু নেতা—আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবন হিজাম, ইক্রিমা (আবু জাহলের ছেলে), সুফওয়ান ইবন উমাইয়া, এরা প্রথমে লজ্জায় আড়ালে ছিল; পরে নবিজির (সা.) দয়ার ছায়ায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল।

ইক্রিমা তো নবিজির সামনে এসে চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। নবিজি বললেন—“ইক্রিমা, ইসলামে প্রবেশ করো। তোমার অতীতের শত্রুতা আমি ভুলে গেলাম।”

এতটাই দয়া—যার প্রভাবে কঠিন হৃদয়ও নরম হয়ে গেল।

৫. পুরো মক্কা ইসলামের আলোয় আলোকিত। দিনের শেষে মক্কা শহর ছিল নতুন এক দৃশ্য—যেখানে রক্তপাত নেই, প্রতিশোধ নেই, বরং ক্ষমা, শান্তি ও ঈমানের আলোক। মক্কা কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি।

মক্কা বিজয়ের পর নবিজির (সা.) ভাষণ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ বিজয়ের ঘোষণা। আর মক্কার মানুষের ইসলাম গ্রহণ ছিল তাঁর চরিত্রের জ্যোতি ও আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

হুনাইনের যুদ্ধ :

হুনাইনের প্রান্তরে :

- মক্কা বিজয়ের পর নবিজি ﷺ–এর প্রতি আরব উপত্যাকা সমগ্রই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু হাওয়াজ ও সাকিফ গোত্রের নেতারা মনে করল—এ শক্তি যদি আরও কয়েক মাস বাড়তে থাকে, তবে পুরো আরবই মুসলমানদের অধীনে চলে যাবে। তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল যুদ্ধ করতে হবে, আর করতে হবে মুহাম্মদ ﷺ–এর শক্তির মূলকেন্দ্র ভেঙে। তাই তারা সংগঠিত করল এক বিশাল বাহিনী—স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ, পশু—সব নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল: পিছু হটবে না, মরবে বা মারবে।

এই বিশাল বাহিনী এসে শিবির করল হুনাইনের প্রান্তরে—এক দীর্ঘ উপত্যাকা, দুই পাশ উঁচু পাহাড়ি ঢাল, মাঝখানে সংকীর্ণ পথ। রাত্রির আঁধারে তারা উপত্যকার ঢালে ঢালে লুকিয়ে রাখল তীরন্দাজ, তরবারিধারী আর বর্শাবাহকদের। পরিকল্পনা ছিল: মুসলমানরা উপত্যকায় নেমে এলে উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তীর বর্ষণ করবে, নীচে থাকা দল হঠাৎ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

নবিজি ﷺ–এর নেতৃত্বে প্রায় বারো হাজারের বাহিনী ভোরের আলোয় হুনাইনের দিকে এগিয়ে এল। মক্কার নতুন মুসলমানেরাও ছিল, সংখ্যা বেশি হলেও যুদ্ধশিক্ষা ছিল কম। উপত্যকার মুখে এসে যখন অগ্রবর্তী দল ঢুকল, তখনও কেউ বুঝতে পারল না কী অপেক্ষা করছে। ভোরের প্রথম আলো উপত্যকার দিক থেকে কুয়াশার সঙ্গে মিশে এক রহস্যময় নীরবতা ছড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে মুহূর্তেই আকাশ যেন তীরের ঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। উপরের গিরিচূড়া থেকে একযোগে হামলা—চিৎকার, তীরের সোঁ সোঁ শব্দ, আর নিচে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের ধেয়ে আসার ধাক্কা। অগ্রবর্তী মুসলমানরা মুহূর্তেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। নতুন মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল, কেউ কেউ সামনের চাপে পিছনে সরে গেল, আর যারা পিছনে ছিল তারা সামনে ছুটে আসা ভীতসন্ত্রস্ত লোক দেখে আরও বিচলিত হয়ে গেল। বিশাল মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় বড় হলেও প্রথম মুহূর্তে তারা যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

কিন্তু সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তেও নবিজি ﷺ–এর দৃঢ়তা ছিল অটল। তাঁর খচ্চরটি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনি ডাক দিচ্ছিলেন—"হে আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে ফিরে আসো!"—কিন্তু শত্রুর তীব্র আক্রমণে বাতাসে তাঁর কণ্ঠ ছড়িয়ে গেলেও অনেকেই শুনতে পাচ্ছিল না। নবিজি ﷺ–এর দিক থেকে সাহসের আলো যেন চারদিকে ছড়িয়ে

পড়ছিল। সঙ্গে থাকা সাহাবারা—আল-আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবন হারিস—উচ্চস্বরে ডাক দিত লাগলেন, নবির আশপাশের চেনা চেহারা আর কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এলেন প্রকৃত যোদ্ধারা।

যখন সাহসী মুসলমান যোদ্ধারা নবিজি ﷺ-এর চারপাশে জমা হতে শুরু করল, তখন প্রান্তরের পরিবেশ বদলে গেল। আতঙ্কে ছুটে যাওয়া মানুষের ধারায় স্থিরতা ফিরে এল, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলে উঠল তাকবিরের ধ্বনি, তলোয়ার উঁচিয়ে শত্রুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃঢ়তা ফিরে এল। আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এসে দাঁড়াল মুহূর্তটিকে বদলে দিতে—হাওয়াজের দল যেই পরিকল্পনা করেছিল, সেই পাহাড়ি ঢাল থেকেই পরক্ষণে তারা বিশৃঙ্খলায় পড়ে গেল।

মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণ ছিল শক্ত, সুসংহত, অদম্য।

হুনাইনের সেই বিপজ্জনক প্রান্তর, যা প্রথম মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, পরক্ষণেই পরিণত হল আল্লাহর সাহায্য আর নবিজির সাহসিক নেতৃত্বের সাক্ষীতে। উপত্যকার ঢালগুলোতে যেখানে আগে ছিল শত্রুর গর্জন, সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল পরাজয়ের ক্রন্দন। মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে শত্রুকে পিছু হটাতে লাগল, আর উপত্যকার ভেতরে গুঞ্জরিত হল বিজয়ের তাকবির।

এই ছিল হুনাইনের প্রান্তর—যেখানে প্রথমে সংখ্যার অহংকার ভেঙে গেল, পরে আল্লাহর সাহায্যে শক্ত হলো ঈমানের সৈন্যদল; যেখানে বিপর্যয়ের মুখে রাসূল ﷺ-এর অটল নেতৃত্ব ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

অতর্কিত হামলা,যুদ্ধের বহ্নিশিখা

:- মক্কার বিজয়ের পর ইসলামের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আরব উপত্যকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কয়েকটি গোত্র—বিশেষ করে হাওয়াজিন ও সাকীফ—মনে করেছিল, এখনই যদি মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত না করা যায়, তবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই তারা হুনাইনের আঁকাবাঁকা উপত্যকার ঢালে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, রাতের আঁধারে অলক্ষ্যে অবস্থান নিয়ে বসেছিল। উদ্দেশ্য—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক আকস্মিক হামলা চালানো, যাতে মুসলিম বাহিনী দিকভ্রান্ত হয়ে যায়।

রাত্রির নীরবতা ভেঙে যখন আকাশ ফিকে আলোয় রঙ নিতে শুরু করল, মুসলিম বাহিনী হুনাইনের উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছিল। নবিজি (সা.)-এর সান্নিধ্যে সাহাবিরা

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর; মক্কা বিজয়ের পর তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, দশ হাজারেরও বেশি। কিন্তু সংখ্যা যেন কখনও কখনও মানুষকে অসতর্ক করে তোলে। শত্রুপক্ষ ঠিক এ সুযোগটিই নিতে চেয়েছিল।

উপত্যকার ভেতর প্রবেশমাত্র হাওয়াজিনের লুকিয়ে থাকা তীরন্দাজরা হঠাৎ করেই বর্ষণ শুরু করল। যেন আকাশের বুক ফুঁড়ে বজ্রপাত নেমে এলো—অপর পক্ষের যোদ্ধারা পাহাড়ের চূড়া থেকে, গহিন ঝোপ থেকে, সংকীর্ণ গিরিখাত থেকে একযোগে তীরের বৃষ্টি নামিয়ে দিল। মুহূর্তেই পর্বতপ্রান্তর জেগে উঠল যুদ্ধে আগুনে। তরবারির ঝনঝন, ঘোড়ার ডাকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অশেষ তাণ্ডব। ধুলোর ঝড়ে দিগ্‌দিগন্ত ঢেকে যেতে লাগল।

এই আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর সামনের সারির কিছু অংশ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যারা প্রথম ঢালে ছিল, তারা শত্রুর অবস্থান বুঝে ওঠার আগেই তীরের আঘাতে আতঙ্কিত হয়ে পিছনের দিকে ছুটে আসে। উপত্যকার সরু পথ দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে বহুজনের মনে মুহূর্তিক শঙ্কা জন্ম নিল—এ যেন জীবনে প্রথম তারা এমন অতর্কিত হামলার মুখে পড়ল।

কিন্তু এই দিগ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তের মধ্যেও হুনাইনের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক অবিচল আলোর স্তম্ভ—মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর খচ্চরের লাগাম ছিল মাত্র একজন সাহাবির হাতে; তিনি সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হয়ে উচ্চ কণ্ঠে তার সাহাবিদের দিকে ডাকলেন,— "হে আনসার! হে মুহাজির! আমার কাছে চলে আসো! আমি আল্লাহর বান্দা, আমি আব্দুল মুত্তালিবের নাতি!"

নবিজির কণ্ঠ যেন ভোরের নিস্তব্ধতায় বজ্রধ্বনি হয়ে ওঠে। ছত্রভঙ্গ সাহাবিদের হৃদয়ে সাহস ফিরে আসে।

অতর্কিত হামলার যে অগ্নিশিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, নবিজির সেই আহ্বান তাতে ধারা বদলে দিতে শুরু করল। একে একে সাহসী সাহাবিরা ফিরে আসতে লাগলেন—আব্বাস (রা.) তাঁর প্রখর কণ্ঠে আহ্বান পৌঁছে দিচ্ছিলেন উপত্যকার দূরতম প্রান্তেও। মুহূর্তে ছোট ছোট দলে দলে সাহাবিরা নবিজির চারপাশে সমবেত হতে লাগলেন। যুদ্ধের আগুন, তীরের বৃষ্টি, ধুলোর ঝড়—সবকিছুকে উপেক্ষা করে তাঁরা ফিরে আসছিলেন সেই এক ডাকের প্রতি সাড়া দিয়ে।

শত্রুর অতর্কিত ফাঁদ ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। মুসলিম বাহিনী আবার সুশৃঙ্খলভাবে রুখে দাঁড়াল। হুনাইনের উপত্যকায় তখন যুদ্ধের আগুন আরেক রূপ নিল—প্রথমে ছিল

আঘাতপ্রাপ্ত সংহতির অগ্নিবিক্ষেপ, আর এখন তা পরিণত হলো আল্লাহর উপর ভরসার, নবিজির প্রতি আনুগত্যের, আর অপরাজেয় সাহসের বহ্নিশিখায়।

এইভাবে হাওয়াজিনের আকস্মিক আক্রমণের সেই ভোর মুহূর্ত, যা প্রথমে যেন মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল, নবিজির অবিচল নেতৃত্বে ধীরে ধীরে পাল্টে গেল বিজয়ের আগুনে। অতর্কিত হামলার যে শিখা মুসলিমদের শঙ্কিত করেছিল, সেই শিখাই শেষ পর্যন্ত তাদের ঈমানি তেজকে আরও তীব্র করে তোলার প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল।

তায়েফের যুদ্ধ ও গনিমত বন্টন :

- হুনাইনের প্রান্তরে কঠিন মুহূর্ত কাটিয়ে মুসলিম বাহিনী যখন পুনরায় সংগঠিত হলো এবং আল্লাহর সাহায্যে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল—তখন দেখা গেল, হাওয়াজিন–সাকিফের প্রধান অংশ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের দুর্গ–সুরক্ষিত নগর তাইফে। তাইফ ছিল আরবে সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গনগরগুলোর একটি—উঁচু প্রাচীর, লোহার দরজা, পাহাড়ঘেরা প্রতিরক্ষা এবং অসংখ্য প্রশিক্ষিত ধনুর্বিদ।

রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন—হাওয়াজিনের মুখ্য শক্তি এখানেই। যদি তাদের দুর্বল না করা যায়, আরবের নিরাপত্তা কখনোই নিশ্চিত হবে না। তাই হুনাইনের যুদ্ধ শেষে মুহূর্তেই মুসলিম বাহিনী তাইফের দিকে অগ্রসর হয়।

তাইফের দুর্গ অবরোধ :

১. অদম্য প্রাচীর ও বর্ষণধারার তীর :

তাইফ দুর্গে পৌঁছাতেই শুরু হলো ওপর থেকে তীরের ঝড়। সাকিফরা প্রাচীরের ওপর থেকে অন্ধকারের মতো তীর ছুড়তে থাকে, যেন আকাশ মুছে যায়। মুসলিম যোদ্ধারা কাছেও যেতে পারছিল না—এক ইঞ্চি এগোলেই তীরবৃষ্টি।

২. নবীজির ﷺ কৌশল ও প্রজ্ঞা :

রাসূল ﷺ বুঝলেন—এটি শুধু শক্তির যুদ্ধ নয়, ধৈর্য ও পরিকল্পনার লড়াই। তাই তিনি প্রথমে মানজানিক ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। এটিই ছিল আরবের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত অবরোধযন্ত্র ব্যবহার। প্রাচীরে পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো।

৩. সুরক্ষিত চামড়ার টং বা ঢালঘর :

মুসলিমরা একটি বড় চামড়া-ঢাকা ঢালঘর বানালো, যার আড়ালে থেকে তারা প্রাচীরের কাছে যেতে পারবে। তবে সাকিফরা ওপরে গরম লোহার টুকরা নিক্ষেপ করতে লাগল—ঢালঘর ছিদ্র হয়ে ফেরত আসতে হলো।

৪. বন্দীদের ইসলাম গ্রহণ :

অবরোধ চলাকালে কিছু দাস-বিদেশি শ্রমিক যারা দুর্গ থেকে নেমে আসে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে যোগ দেয়—এবং তারা তাইফের ভেতরের বহু খবর জানায়।

৫. তাইফের অনমনীয়তা ও নবীজির ﷺ প্রত্যাবর্তন :

বিশদিনের মতো দীর্ঘ অবরোধেও যখন তাইফ নরম হলো না—রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন, অযথা মুসলিমদের প্রাণহানি নয়। তিনি বললেন,

"আল্লাহ চাইলে তাদের খোলনলচে বদলে দেবেন।"

এরপর মুসলিম বাহিনী মক্কার দিকে ফিরে আসে।

হাওয়াজিন প্রতিনিধিদলের আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণ :

তাইফ থেকে ফেরার পর হাওয়াজিন গোত্রের নেতারা—যারা হুনাইনের গনিমত থেকে নারী-শিশু ও সম্পদ বন্দী অবস্থায় ছিল—মুসলিম শিবিরে এসে মিলিত হলো। তারা বলল—

"হে আল্লাহর রসূল, আমরা বিপদে পড়েছি। আমাদের পরিবার-পরিজন, শিশু-স্ত্রীর ওপর আপনি অনুগ্রহ করুন।"

তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ও বিনম্রতার প্রতি নবীজি ﷺ গভীর দয়া দেখালেন।

হুনাইনের গনিমত—অভূতপূর্ব পরিমাণ :

গনিমত ছিল আরবের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গনিমতের একটি—

২৪,০০০ উট, অসংখ্য ছাগল-ভেড়া, বিপুল স্বর্ণ-রৌপ্য, এবং প্রায় ছয় হাজার বন্দী নারী-পুরুষ। মুসলিমরা প্রথমে এই সম্পদ জিরানা (জিআরানা) নামক স্থানে একত্র করে রাখল।

গনিমত ফেরত দেওয়ার অভূতপূর্ব ঘোষণা :

হাওয়াজিন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর নবীজি ﷺ মদিনার মুসলিম-মহরিবসহ সকল বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"তোমাদের ভাইরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিতে তোমরা কি রাজি?"

এই ঘোষণায় পুরো মাঠ নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর খাদ্যি-আনসার উঠে দাঁড়াল—"হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টিই চাই। আমরা যা আছে সব আপনাকে ফেরত দিলাম।"

এরপর মুহাজির ও মক্কায় নতুন মুসলিমরাও রাজি হয়ে গেল।

ফলে ছয় হাজার বন্দীকে মুক্ত করে তাদের গোত্রে ফিরিয়ে দেওয়া হয়—এটি ছিল আরবের ইতিহাসে সবচেয়ে দয়াময় ক্ষমাশীলতা।

গনিমতের বণ্টন :

তবে সম্পদের কিছু অংশ—উট-ছাগল এবং ধন-সম্পদ—বণ্টন করা হয় দুই প্রধান উদ্দেশ্যে:

১. হৃদয় জয় করা :

মক্কার নতুন মুসলিম নেতাদের মধ্যে যেমন—আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবন হিজাম, হারিস ইবন হিশাম—এদের প্রত্যেককে নবীজি ﷺ ১০০ করে উট দেন।

কিছুজনকে ৫০, ৪০—এভাবে দান করেন।

এর উদ্দেশ্য ছিল—ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করা—যারা দীর্ঘদিন ছিলেন ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এটি দেখে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন—"হে আল্লাহর রসূল, আপনি এত দিচ্ছেন কেন?"

রাসূল ﷺ জবাব দিলেন—"আমি এমন লোককে দেই যার হৃদয়কে দৃঢ় করতে চাই।"

২. পুরস্কার ও অবদান অনুযায়ী বণ্টন :

শতকরা হিসেবে চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে—এক ভাগ রাষ্ট্রের খাজানায়।

প্রত্যেক অশ্বারোহীকে তিন ভাগ, পায়ে চলা যোদ্ধাকে এক ভাগ করে দেওয়া হয়।

আনসারদের অভিমান ও নবীজির ﷺ-এর হৃদয়স্পর্শী ভাষণ :

গনিমতের বড় অংশ নতুন মুসলিমদের যাওয়ায় আনসারদের মনে সামান্য কষ্ট জন্মেছিল।

কিন্তু তারা মুখে কিছু বলেনি—তবে খবর নবীজির ﷺ কানে গেল।

তিনি পুরো আনসারকে একটি তাঁবুর ভেতর একত্র ডাকলেন এবং বললেন—

"তোমরা কি খুশি নও যে মানুষ উট-ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা নিয়ে যাচ্ছো আল্লাহর রসূলকে?"

আনসাররা কান্নায় ভেঙে পড়ল—

“রাসূলুল্লাহ আমাদেরই জন্য যথেষ্ট!”
এটি ছিল তাদের ঈমান ও প্রেমের চরম প্রকাশ।
তাইফের পরিণতি :
কয়েক মাস পর সাকিফ নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করতে মদিনায় আসে।
তাইফের সেই অদম্য দুর্গ, সেই কড়া হৃদয়ের যোদ্ধারা— অবশেষে নরম হয়ে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।
এভাবেই হুনাইনের যুদ্ধের পর তাইফ অভিযান, গনিমত মুক্তি ও বণ্টনের মধ্য দিয়ে আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রভাব অটল ও মজবুত হয়ে ওঠে।

উমরাহ পালন ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন :-

হুনাইনের প্রান্তরে বিজয়ের ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর, নবিজি ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আরেকটি দায়িত্ব—আল্লাহর ঘরের প্রতি সেই শ্রদ্ধা, যা তাঁর হৃদয়ে কখনো ক্ষীণ হয়নি। মক্কা বিজয়ের পরপরই হুনাইন ও তাইফে ধারাবাহিক যুদ্ধ মুমিন বাহিনীকে ক্লান্ত করে তুলেছিল; কিন্তু নবিজি ﷺ-এর মনে ছিল পবিত্র কাবাঘরকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সেই মহান অনুভূতি।
উমরাহর প্রস্তুতি :
হাওয়াজিনদের প্রতিনিধি দল যখন মদিনায় এসে ঈমান গ্রহণ করল এবং তাদের বন্দীরা মুক্ত হল, তাঁর কিছুদিন পর নবিজি ﷺ মক্কার দিকে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্দেশ্য—উমরাহ পালন। যারা হুদায়বিয়ার বছরে বাধা পেয়ে উমরাহ করতে পারেননি, তাদের জন্য এটি এক পূর্ণতার মুহূর্ত ছিল। নবিজি ﷺ মক্কায় আরেকবার প্রবেশ করবেন, এবার সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে।
সাথীরা উচ্ছ্বসিত, তবু নীরব। যুদ্ধশেষে ভেঙে পড়া দেহে আবার সফরের প্রস্তুতি—কিন্তু রসুল ﷺ-এর একবার উচ্চারিত নির্দেশই যথেষ্ট ছিল সবার প্রাণে শক্তি ফিরিয়ে দিতে।
মক্কায় আগমন ও উমরাহ পালন :
মদিনা থেকে যাত্রা করে দলটি মক্কায় পৌঁছায় প্রশান্ত এক সময়ে। শহর তখনো নব বিজয়ের সৌরভে ভরা। নবিজি ﷺ কাবার দিকে অগ্রসর হলেন সেই বিনয় ও মহিমা নিয়ে, যা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপকে আলাদা করে তুলতো।
কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করলেন। হৃদয় যেন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভিজে উঠল। এরপর তিনি উমরাহর তাওয়াফ শুরু করলেন—শান্ত,

ধীর, পূর্ণ মনোযোগে। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর তাওয়াফকে দেখে সাহাবিরা অনুভব করলেন, যেন পৃথিবীর ভিড় থেকে উঠে তাঁরা অন্য জগতে চলে এসেছেন।

সফল যুদ্ধের পর এই উমরাহ ছিল শুধু একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়; এটি ছিল বিজয়ের অহংকার মুছে দিয়ে আল্লাহর প্রতি নতুন করে নিজেকে অর্পণ করার ঘোষণা।

মক্কায় কয়েকদিন অবস্থান :

উমরাহ শেষে নবিজি ﷺ মক্কায় কয়েকদিন অবস্থান করলেন। মানুষ তাঁর কাছে এসে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। কুরাইশদের অনেকেই নবিজি ﷺ-এর চরিত্র দেখে তখন উপলব্ধি করলো—শত্রুতার সমস্ত দেয়াল ভেঙে গেছে, মক্কা এখন শান্তির কেন্দ্র। এই কয়েকদিনে তিনি মক্কাবাসীর সমস্যা শুনতেন, হাওয়াজিন ও তাইফের পরবর্তী বন্দোবস্ত দেখতেন, এবং নবীন মুসলমানদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর উপস্থিতিই যেন মক্কায় নতুন জীবনের সূচনা করে দিল।

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের যাত্রা :

মক্কা সফর শেষ হলে নবিজি ﷺ আবার তাঁর প্রিয় শহর মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিল শান্তির বার্তা, বিজয়ের নয়; ছিল ইলাহি আনুগত্যের পরম স্বস্তি। মদিনার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। যখন তিনি শহরের কাছে পৌঁছালেন, বাচ্চারা আনন্দে দৌড়ে এল, বড়রা ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাগত জানাতে। চারদিকে ঈমানের আলোর মতো বিস্তৃত হয়ে গেল আনন্দধ্বনি—রসুলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসেছেন!

মদিনায় প্রবেশ করে নবিজি ﷺ সোজা মসজিদে নববীতে গেলেন। দুই রাকাআত সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, যে তিনি একের পর এক বিজয় দিলেন, আর তাঁর রসুলকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিলেন।

হুনাইন ও তাইফের উত্তাল দিনগুলোর পর এই প্রত্যাবর্তন ছিল শান্তির নতুন অধ্যায়। এতে বিজয়ের অহংকার ছিল না, ছিল বিনয় ও দয়া—যা ছিল নবিজি মুহাম্মদ ﷺ-এর সীরাহর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আদি ইবনু হাতিমের ইসলাম গ্রহণ :-

তাইয়ের প্রভাবশালী নেতা, দানশীলতার প্রতীক হাতিম আত-তাইয়ের পুত্র আদি—আরব সমাজে ছিলেন সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাবের অধিকারী। নিজের গোত্রের প্রধান হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন খ্রিষ্টান ধর্মে ছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে কুরাইশের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু নবী করিম ﷺ–এর উদীয়মান দাওয়াত, ইসলামের দ্রুত বিস্তার এবং আরবের একতার নতুন সম্ভাবনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

তাই গোত্রের একটি অভিযান যখন মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়, তখন অনেক নারী-পুরুষ বন্দী হয়ে মদিনায় আসে। তাদের মধ্যে আদি ইবনু হাতিমের বোনও ছিলেন। নবিজির সামনে আনা হলে তিনি তার চরিত্রে যে অদ্ভুত মমতা, ন্যায়বিচার ও করুণার আলো দেখেন—তা তার হৃদয়কে পরিবর্তন করে দেয়। নবিজি ﷺ তাঁর সম্মান রক্ষার্থে মুক্তি দেন, আর বলেন, "আমরা অত্যাচারী নই; আমরা সাহায্যকারী।"

বোন ফিরে গিয়ে আদিকে বললেন,

"মুহাম্মদ কোনো রাজা নন, তিনি আল্লাহর রাসুল। তাঁর চরিত্রে রাজাধিরাজের ঔদ্ধত্য নেই—আছে নবুওতের স্নিগ্ধতা।"

এই কথা আদির হৃদয়ে আলোড়ন তোলে।

মদিনার পথে এক নেতার দ্বিধা :

শেষমেশ আদি সিদ্ধান্ত নিলেন সত্যকে যাচাই করবেন। তিনি গোপনে মদিনার পথে রওনা হলেন। মনে ভয়, লজ্জা—তবু সত্যের সন্ধান তাকে চালনা করছিল। মদিনায় পৌঁছেই যখন তিনি নবিজির ﷺ সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন, তখনই দেখলেন—রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো রাজসিক দরবারে নন, সাধারণ মানুষের মতো সাদামাটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

নবিজি ﷺ আদিকে দেখে মৃদু হাসলেন এবং তাঁকে পথ চলতে ইচ্ছুক এক বৃদ্ধাকে সমস্যার কথা শুনে সাহায্য করলেন। আদি বিস্ময়ে দেখলেন—এ যে সেই মানুষ, যিনি আরবকে নিজের দাপে শাসন করতে পারতেন, অথচ মানুষের সেবা করাকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা মনে করেন।

নবিজির কথা—হৃদয়কে ছুঁয়ে যাওয়া সত্য :

নবিজি ﷺ তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের একমাত্র চামড়ার বিছানা তিনি নিজে সরিয়ে আদিকে বসালেন এবং নিজে মাটিতে বসলেন। এক শাসকের সামনে এ ছিল অকল্পনীয়।

নবিজি ﷺ বললেন,

"হে আদি, সম্ভবত তুমি ইসলাম গ্রহণে দ্বিধা করছো কারণ তোমার মনে ধারণা—এ জাতি দরিদ্র, বিধ্বস্ত, ভবিষ্যত অনিশ্চিত।"

আদি মাথা নত করে চুপ করে রইলেন।

নবিজি ﷺ বললেন,

"হে আদি, তিনটি ঘটনা তোমাকে দেখার সুযোগ হবে—

১. একদিন এক নারী হিরা থেকে একা বের হয়ে কাবা পর্যন্ত নিরাপদে আসবে।

২. পারস্যের ধনভান্ডার মুসলিমদের হাতে আসবে।

৩. আরব ভূমিতে এত ধন-সম্পদ হবে যে মানুষের কাছে যাকাত দেওয়ার কেউ থাকবে না।"

আদি বিস্ময়ে বললেন, "পারস্যের ধনভান্ডার? কিসরার ধনভান্ডার?"

নবিজি ﷺ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, কিসরার ধনভান্ডার।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আদির হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি বুঝলেন—এ কথা কোনো মানুষ নিজের জ্ঞান থেকে বলতে পারে না। তাঁর অন্তর নরম হয়ে এল।

ইসলামের আলো গ্রহণ :

অবশেষে আদি উচ্চারণ করলেন:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।"

মদিনার আকাশে যেন আরেকটি হৃদয়ের জাগরণ ঘটল। আদি ইবনু হাতিম ইসলাম গ্রহণ করলেন—জ্ঞান, যুক্তি ও হৃদয়ের মিলনে।

আদির সাক্ষ্য—রাসুলুল্লাহর সত্যনিষ্ঠতার প্রমাণ :

বহু বছর পরে আদি বলতেন,

"আল্লাহর কসম! আমি রাসুলের তিন ভবিষ্যদ্বাণীর দুটি নিজের চোখে দেখেছি। তৃতীয়টিও অবশ্যই পূরণ হবে।"

তিনি পরে মুসলিম সমাজে সম্মানিত আলিম, সাহাবী ও দাঈ হিসেবে পরিচিত হন; তার গোত্রও একে একে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাবুকের যুদ্ধ :

সাহাবিদের দান-সদাকা :

- তাবুকের কঠিন অভিযানের ডাক যখন মদিনায় পৌঁছাল, তখন তা ছিল পরীক্ষার সময়—দীর্ঘ পথ, তপ্ত মরু, তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর শত্রুপক্ষের ভয়াল শক্তি। এর ওপর ছিল অভাব-অনটনের দিন। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘোষণা দিলেন—

"আসন্ন তাবুক অভিযানের জন্য যে যতটুকু পারে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর।"—পুরো মদিনা যেন ঈমানের স্রোতে জেগে উঠল।

ওসমান ইবনু আফফান (রা.)—দানশীলতার সমুদ্র

এই আহ্বানে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন উসমান (রা.)। তাঁর দান ও উদারতা ছিল মদিনার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

তিনি তিনশ উট সম্পূর্ণ সাজ-সরঞ্জামসহ দান করলেন। পরে আরো দুইশ উট যোগ করলেন। শেষে হাজার দিনার স্বর্ণ নিয়ে এসে নবিজির ﷺ কোলের ওপর ঢেলে দিলেন।

নবিজি ﷺ আনন্দে দীপ্ত মুখে বললেন—

"উসমানের আজকের দান তাকে আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

অর্থাৎ তার এই দান তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

উমর (রা.) এই দিন নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন—

"আজ আমি আবু বকর (রা.)-কে ছাড়িয়ে যাব।"

নিজের সমস্ত মাল অর্ধেক করে নবিজির ﷺ সামনে নিয়ে এলেন।

নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—"উমর, তুমি পরিবারকে কী রেখে এসেছ?"

তিনি বললেন—

"যা দিয়েছি তার সমপরিমাণ রেখে এসেছি।"

ওদিকে আবু বকর (রা.) ভাবলেন না তিনি কত দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকে ছিল কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভরতার দীপ্তি।

নবিজি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—

"আবু বকর, তুমি পরিবারকে কী রেখে এসেছো?"

তিনি বললেন—"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"

নবিজি ﷺ আবেগে তার দানে বরকতের দোয়া করেন।

ধনী–গরিব সবাই একসাথে

এই আহ্বান শুধু ধনীদের নয়—মদিনার সাধারণ, দরিদ্র, শ্রমজীবী সবাইকে নাড়িয়ে দিল।

কেউ তার এক মুঠো খেজুর নিয়ে আসল,

কেউ অর্ধেক সা' যব জমা করল,

কেউ নিজের এক জোড়া কাপড়ের একটি এনে দিল।

তারা লজ্জা পেলেও নবিজি ﷺ তাদের দানকে মূল্যবান মনে করলেন। কারণ আল্লাহর কাছে মূল্য দানের পরিমাণে নয়—নিয়তে।

আবু আকীল (রা.)—অল্প দান, বিশাল মূল্য

একজন দরিদ্র সাহাবি আবু আকীল (রা.) সারারাত মজুরি করে মাত্র দুই সা' খেজুর পেলেন।

এক সা' পরিবারের জন্য রেখে অন্য সা'টি নবিজির ﷺ হাতে দিলেন।

মুনাফিকরা হাসাহাসি করে বলল—

"এতে কি সেনাবাহিনী চলবে?"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই দানকেই কুরআনে প্রশংসা করলেন—

যারা স্বল্প আয়েও আন্তরিকভাবে দান করে।

নারী সাহাবিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। মুমিন নারীরাও তাদের সোনা-রূপার অলংকার খুলে এনে জমা করলেন।

কারো বালা, কারো নূপুর, কারো হার—সবকিছু জমা হয়ে গেল ইসলামের তহবিলে।

নবিজি ﷺ-এর সামনে তখন জমা হচ্ছিল— উট, ঘোড়া, ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, শুকনো খাবার, পানির পাত্র, এমনকি বাড়ির অতিরিক্ত দরজা পর্যন্ত!

মদিনা নগরী যেন ঈমানের উৎসবে জেগে উঠল। প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল—

"আমি কি দিয়েছি আল্লাহর রাস্তায়?"

লোকচক্ষু এড়াতে মুনাফিকরা নানা।

অজুহাত দাঁড় করাল—"তীব্র গরমে বের হও?""রোমানদের মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব?""ধনী সাহাবিরা দেখানোর জন্য দান করছে।""গরিবরা তো সামান্য জিনিস দিচ্ছে, এতে কী হবে?"

কিন্তু আল্লাহ তাদের মনোভাব কুরআনে উন্মোচন করলেন—

কেউ দানের ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করত, কেউ বিদ্রূপ করত।

এমন ঈমানময় দানের স্রোতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত হলো—

এই বাহিনীই ইতিহাসের বিখ্যাত জাইশুল উসরাহ—কঠিন পরিস্থিতির সেনাদল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, আর পেছনে রয়ে গেল এক অবিনশ্বর দানের ইতিহাস।

মুনাফিকদের অবস্থা :-

তাবুকের কঠিন অভিযানের ঘোষণা মদিনাজুড়ে ছড়িয়ে পড়তেই মুমিনদের হৃদয়ে দায়িত্ববোধের আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু মুনাফিকদের অন্তরে তখনই কাঁপন ধরল। রোমান সাম্রাজ্যের মোকাবিলা, দীর্ঘ পথ, প্রচণ্ড গরম, অতি স্বল্প খাদ্য—এসবকে তারা অজুহাত বানিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভাঙতে উঠেপড়ে লাগল। তাদের নষ্টচরিত্র তাবুক অভিযানের সময় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সেসব ছিল মদিনার ইতিহাসে এক অদ্ভুত অধ্যায়।

প্রথমেই তারা গোপনে সভা করল। এই সভাগুলোতে তারা নবিজির (সা.) সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছড়াত। কেউ বলত—এতো গরমে মরুভূমি পাড়ি দেওয়া কী দরকার? কেউ বলত—রোমান বাহিনী তো অপ্রতিরোধ্য, নবী (সা.) তাদের মোকাবিলা করতে গেলে মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা নিজেদের কাপুরুষতা এবং অবিশ্বাসকে 'দূরদর্শী পরামর্শ' হিসেবে তুলে ধরে মুমিনদের ভিত নড়াতে চাইত। কিন্তু মুমিনরা ছিল দৃঢ়; তাই মুনাফিকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এরপর শুরু হলো 'অজুহাত তৈরির' নাটক। কেউ বলল, তার বাগান পেকে এসেছে—এ মুহূর্তে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ বলল, শরীর খারাপ; কেউ বলল, ঘরে কেউ নেই, সন্তানদের দেখবে কে? এভাবে একেকজন একেক বাহানায় নবিজির কাছে এসে অনুমতি চাইত। নবী করুণাময়, তিনি তাদের কথায় প্রতিবারই দয়া দেখাতেন; কিন্তু আল্লাহর আয়াত নাজিল হয়ে তাদের মিথ্যার মুখোশ খুলে দিতে লাগল। কুরআনে তাদের এই অবস্থাকে কড়া ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজটি ছিল—"মসজিদে দিরার" নামে একটি ভণ্ড মসজিদ নির্মাণ। বাইরের দৃষ্টিতে ইবাদতগৃহ, কিন্তু ভেতরে ছিল মুমিনদের ঐক্য ভাঙার ষড়যন্ত্র। তারা নবীকে বলল—আপনি তাবুক সফরে বের হওয়ার আগে এসে এখানে নামাজ পড়ুন। কিন্তু ওহি নাজিল হয়ে জানিয়ে দিল—এটি কোনো মসজিদ নয়; এটি মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি। নবী (সা.) ফিরে এসে নির্দেশ দিলেন—এ ভণ্ডামির ঘরকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক।

মুনাফিকরা শুধু অজুহাত গঠনেই থামেনি—তারা পথচলতি মুসলমানদের মনোবল ভাঙতে লাগল। বলত—এই পথ ছাড়া সম্ভব নয়, রোমান ক্ষমতা দুনিয়া কাঁপিয়ে বেড়ায়; মুসলমানদের এখানে যাওয়া মানে আত্মহত্যা। তাদের কণ্ঠ ছিল ভয় ছড়ানোর অস্ত্র। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে এবং নবিজির দৃঢ় নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী নির্ভীকভাবে তাবুকের পথে রওনা হলো।

এদিকে মুনাফিকরা মদিনায় রয়ে গিয়ে ছিল ভয়ে, সন্দেহে ও গোপন আনন্দে—যেন মুসলিম বাহিনী ফিরে না আসে! তারা বসে বসে সম্ভাব্য পরাজয়ের হিসাব কষত। কিন্তু যখন খবর এলো—অভিযানে কোনো যুদ্ধ হয়নি; বরং আরবের বিভিন্ন গোত্র মুসলমানদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে—তখন মুনাফিকদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা একে বিস্ময়ের চোখে দেখল, এবং আরও বেশি ঘৃণার পাত্র হলো।

যখন নবী মদিনায় ফিরে এলেন, তখন তারা দ্রুত নবিজির দরজায় ভিড় করল—যেন তাদের অনুপস্থিতি ঢাকতে পারে। একের পর এক অজুহাত, মিথ্যা শপথ, কৃত্রিম অনুশোচনা—কিন্তু আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন ছিল না। কুরআনে তাদের সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয়ে জানিয়ে দিল—তাদের মিথ্যা আল্লাহর নিকট ধরা আছে।

তাবুক অভিযান তাদের অন্তরের অন্ধকারকে আলোকিত দিনের মতো পরিষ্কার করে দিল। মুমিনদের ঈমান, ত্যাগ, আনুগত্য একদিকে যেমন উজ্জ্বল হলো—তেমনি মুনাফিকদের ভণ্ডামি, কাপুরুষতা, দ্বিমুখিতা তেমনি স্পষ্ট হয়ে গেল। ইতিহাসের এই অধ্যায়েই বোঝা যায়—বড় সংকট মানুষকে চেনে না, বরং মানুষকেই চিনিয়ে দেয়।

তাবুক প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী

:- তাবুক অভিযানের পথে মুসলিম বাহিনীর যে দীর্ঘ যাত্রা ও সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে, তা সিরাহর অন্যতম হৃদয়গ্রাহী পর্ব। সে সময় আরবের প্রচণ্ড গরম, দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, খাদ্যের স্বল্পতা—সব মিলিয়ে এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি অভিযান। তবুও রোমান সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আগ্রাসন ঠেকাতে নবিজি ﷺ মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহর ভরসায় তাবুকের দিকে রওনা করালেন।

মুসলিম বাহিনীর এই যাত্রায় দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। মদিনা থেকে বের হওয়ার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল, এটি আর সাধারণ যুদ্ধ প্রস্তুতি নয়; বরং ঈমানের পরীক্ষা। উটের সংখ্যা ছিল কম, খাদ্য ও পানি আরও কম। কখনো চার-পাঁচজন সাহাবি এক উট ভাগাভাগি

করে চলতেন। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি প্রায় শেষ হয়ে আসত, তখন নবিজি ﷺ তাঁর বরকতময় হাত পানির পাত্রে রেখে দোয়া করতেন, আর সেই পানি আশ্চর্যভাবে বেড়ে যেত—সব সাহাবি তৃপ্তির সঙ্গে পান করতেন।

প্রান্তরের কঠিন বালুময় পথ, সূর্যের জ্বলন্ত তাপ আর দীর্ঘ দিনের অনাহার—এসবই যেন মুসলিম বাহিনীর ধৈর্যকে পরীক্ষা করছিল। পথের কষ্টে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, কিন্তু নবিজি ﷺ-এর সঙ্গ ও আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ের আশা তাদের আবার শক্ত করে তুলত। তাঁরা জানতেন, এই অদর্শন শক্তিধর রোমান বাহিনীকে ভয় দেখানোর জন্যই মুসলিমদের দৃঢ় উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ঈমানী সাহসের প্রতীক।

যাত্রাপথে কিছু কিছু স্থানে খাদ্য আরো কমে যেত। কখনো সামান্য খেজুর কয়েকজন মিলে ভাগ করে খেতেন। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, সৈন্যদের হাঁটার শক্তি ফুরিয়ে আসছিল—তবু নবিজি ﷺ-এর দোয়ার বরকতে তাঁরা আবার শক্তি ফিরে পেতেন। পথের শুকনো উপত্যকা, জনশূন্য পাহাড়ি এলাকা আর দীর্ঘ বৈরী ভূমি অতিক্রম করে যখন তাঁরা তাবুকের নিকটবর্তী হন, তখন পুরো বাহিনী মানসিকভাবে আরও শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ তারা বুঝেছিল—রোমান বাহিনী অগ্রসর না হলেও এই অভিযান মুসলিমদের মর্যাদা ও শক্তির জাহির ছিল।

নবিজি ﷺ তাবুকে অবস্থান নেন প্রায় বিশ রাত। সেখানে তিনি বাহিনীকে সুসংগঠিত করেন, আশেপাশের গোত্রগুলোর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন করেন এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করেন। রোমানরা মুসলিমদের শক্ত প্রতিরোধ সক্ষমতা বুঝে পিছিয়ে যায়, ফলে যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় অর্জিত হয়।

এভাবে তাবুক প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এই দীর্ঘ সফর হয়ে ওঠে সাহস, ত্যাগ, তাওয়াক্কুল ও নেতৃত্বের এক অনন্য দলিল।

মসজিদে জিরার

:- নবী করীম ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে আসার পর দ্রুত আল-হিজর অঞ্চলের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। যাত্রাপথে তিনি জানতে পারেন যে ‘যু-আওয়ান’ নামক স্থানে কিছু লোক একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে। এটি দেখতে সাধারণভাবে একটি মসজিদের মতো হলেও ভেতরে গোপন উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এসব কূটচাল

সম্পর্কে নবী ﷺ পূর্বেই আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছিলেন—এটি ছিল কুখ্যাত মসজিদে জিরার

এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল মুনাফিকরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি—

১. মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা,

২. মুমিনদের জন্য ক্ষতি সাধন করা,

৩. রোমান খ্রিস্টান আগ্রাসনের সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানো।

ওহীর আয়াতে (সূরা তাওবা: ১০৭-১০৮) বর্ণিত হয়েছে—মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে বলেছিল যে তারা মসজিদটি বানিয়েছে দুর্বল ও অসুস্থ মানুষদের সুবিধার জন্য, যাতে তাদের নামাজ আদায় করা সহজ হয়। কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা করেন—তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং নবী ﷺ কখনো ওই মসজিদে নামাজ পড়বেন না।

আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন—

যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ মসজিদে কুবা), সেখানে নামাজ পড়া অনেক উত্তম।

কারণ সেখানে এমন মানুষ রয়েছে যারা পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে এবং আল্লাহ পরিচ্ছন্ন মানুষদের ভালোবাসেন।

মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য :

মুনাফিকরা চেয়েছিল— মুসলিম সমাজে নতুন একটি কেন্দ্র তৈরি করে বিভেদ সৃষ্টি করতে, নিজেদের রাজনৈতিক আস্তানা বানাতে, রোমান বাহিনী আক্রমণ করলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য একটি স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করতে।

তারা দাঁত-খিঁচুনি হাসি দিয়ে নবী ﷺ-কে অনুরোধ করছিলেন যেন তিনি সেখানে নামাজ পড়েন, যাতে মসজিদটির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট ওহী এল—ওই স্থানে কখনোই নামাজ পড়া যাবে না।

নবী ﷺ-এর নির্দেশ: মসজিদ ধ্বংস করা

এখন সত্য পুরোপুরি প্রকাশিত হওয়ার পর নবী ﷺ সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন—

মসজিদে জিরার ভেঙে ফেলতে এবং তার জায়গা সমতল করে দিতে।

সাহাবিরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে—মসজিদটি ভেঙে ফেললেন, দেয়ালগুলো ধ্বংস করলেন, স্থানটি মসজিদের উপযোগিতাহীন করে ফেললেন। এর মাধ্যমে মুনাফিকদের দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

মসজিদ নামের পবিত্র প্রতিষ্ঠানের আড়ালে লুকিয়েও যে অপকার করা যেতে পারে—এটি তারই প্রতীকী উদাহরণ।

নবী ﷺ-এর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করল—নামাজের ঘর হলেও যদি তার ভিত্তি হয় ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের ওপর, তবে সেটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৃত মসজিদ হলো যেটি নির্মিত হয় তাকওয়া, ঐক্য, সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্র উদ্দেশ্যের ওপর।

তাবুক অভিযানের প্রেক্ষাপট :

এ ঘটনার সঙ্গে তাবুক যুদ্ধের সূক্ষ্ম যোগ রয়েছে। রোমান সাম্রাজ্য থেকে সম্ভাব্য হামলার পূর্বাভাসে মদিনার মুনাফিক গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা চাইছিল—মুসলিমদের শক্তি কমাতে, নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে, এবং যুদ্ধ হলে মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নিতে।

মসজিদে জিরার তাদের এই পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র, যা আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে গেল।

তাবুক-পরবর্তী কিছু ঘটনা :

ইসলামি জীবনব্যবস্থার সৌন্দর্য :

- এক নারী জঘন্য পাপের কারণে নিজেকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য মনে করে নবিজি صلى الله عليه وسلم-এর আদালতে হাজির হলেন। তিনি এসে বললেন—

"হে আল্লাহর রাসুল, আমি ব্যভিচার করেছি—আমার ওপর হদ প্রয়োগ করুন।"

নবিজি তাকে ফিরিয়ে দিলেন, যেন তিনি ফিরে গিয়ে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু ওই নারী সত্যিই নিজের অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না। কিছুদিন পর আবার এসে উপস্থিত হলেন এবং দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—

"ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সেই অপরাধই করেছি। এবার আমাকে শাস্তি দিন।"

নবিজি আবারও জানতে চাইলেন—তিনি কি গর্ভবতী?

নারীটি স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তাঁর গর্ভে একটি সন্তান রয়েছে। নবিজি তখন বললেন—"তুমি তোমার সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত ফিরে যাও। এখন তোমার ওপর শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।"

নারীটি ফিরে গেলেন। সন্তানের জন্ম হওয়ার পর তিনি আবার এলেন—এবার তাঁর কোলে ছোট্ট শিশু। তিনি নবিজির সামনে এসে বললেন—

"হে আল্লাহর রাসুল, সন্তানের জন্ম হয়েছে। এখন আমার ওপর হদ প্রয়োগ করুন।"

কিন্তু নবিজি এবারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—

"তুমি তাকে দুধপান করাও। তার যত্ন নাও। যতদিন সে দুধ না ছাড়ে, ততদিন শাস্তি কার্যকর হবে না।"

এভাবে দুই বছর সময় কেটে গেল। অবশেষে শিশুটি দুধ ছেড়ে বড় হলো। নারীটি আবার উপস্থিত হলেন—কিন্তু এবার তাঁর সঙ্গে কোনো অভিযোগ নয়, বরং সন্তানকে নিজের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য একটি রুটির টুকরা (খাবার) হাতে দিলেন। যেন বোঝা যায়, শিশু আর দুধপান করে না।

এ দৃশ্য দেখে নবিজির চোখে জল চলে এল। তাঁর হৃদয়ে মানুষিকতা, করুণা, মমতা—এসব দুলে উঠল। এই নারী নিজের অপরাধবোধে পুড়েছে, কিন্তু তার সন্তানের জন্য তিনি অবিশ্বাস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই নবিজি সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন শিশুটিকে ভালোভাবে দেখাশোনা করতে এবং তারপর নারীর ওপর হদ প্রয়োগ করলেন।

এই ঘটনার মূল শিক্ষা

১. ইসলামি আইন কঠোর হলেও এর ভেতর অসীম দয়া ও মানবিকতা রয়েছে।

২. গর্ভবতী নারী বা ছোট শিশুর মা—এদের ওপর শাস্তি প্রয়োগে ইসলাম বিশেষ সতর্কতা ও সময় দেয়।

৩. নবিজির দয়া শুধু মানুষ নয়—নিরপরাধ শিশুর অধিকার রক্ষাতেও তিনি সংবেদনশীল ছিলেন।

৪. নারীটি অপরাধ স্বীকার করে বারবার ফিরে আসা—তার আন্তরিক তওবা ও ঈমানের গভীরতার পরিচয় দেয়।

৫. ইসলাম অপরাধীর সন্তানকে কখনও শাস্তির অংশ হতে দেয় না।

পশ্চিমের বর্বরতা

:- তাবুক অভিযানের বিশাল প্রতিধ্বনি তখনও আরব উপত্যকায় প্রবাহিত। মুসলিম বাহিনী দূর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ায় রোমান সামরিক নেতৃত্ব ও তাদের মিত্র আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলো গভীর অস্থিরতায় পড়ে। নিজেদের হারানো প্রভাব ফিরে

পেতে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে গোপনে এবং প্রকাশ্যে নানা ধরনের কঠোরতা, অত্যাচার ও রাজনৈতিক বর্বরতার পথ বেছে নেয়।

১. সীমান্ত অঞ্চলে রোমানদের সন্ত্রস্ত প্রতিক্রিয়া :

তাবুক পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর আগমন রোমানদের গর্বে ছুরি চালানোর মতো হয়েছিল। তারা বুঝে যায়—মদিনার নবীজি (সা.) নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীকে আর হালকা করে দেখা যাবে না। তাই রোমানরা সীমান্তবর্তী আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে একত্র করে পুনরায় সামরিক হুমকি তৈরি করতে থাকে।

তাদের পরিকল্পনা ছিল—আরব উপত্যকার ওপর নিজেদের পুরনো কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিম শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা। এ উদ্দেশ্যে তারা গোত্রপ্রধানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে পুনরায় মুসলিম অঞ্চলের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে বাধ্য করে।

২. আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলোর ওপর নিপীড়ন :

যে সব গোত্র তাবুক অভিযানের সময় মুসলিমদের পক্ষে নমনীয় অবস্থান নিয়েছিল অথবা নিরপেক্ষ ছিল—রোমানরা তাদের ওপর কঠোর চাপ দিতে শুরু করে। তাদের সামনে দুটি বিকল্প রাখা হতো—রোমান সামরিক জোটে যোগ দাও, অথবা অর্থনৈতিক অবরোধ ও শাস্তির মুখে পড়ো।

তাদের বাণিজ্যপথ, চারণভূমি, এমনকি নিরাপত্তার অধিকারও রোমান গভর্নরদের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। রোমানরা স্পষ্ট করে দেয়—মুসলমানদের সাথে চুক্তির শাস্তি খুব কঠোর হবে।

৩. রোমানদের চরম দমননীতি: জোরপূর্বক কর ও বঞ্চনা :

রোমানরা সীমান্ত অঞ্চলে তাদের প্রভাব ধরে রাখতে বাড়িয়ে দেয় কর, জুলুম ও সামরিক শাসন।

যে সব গোত্র মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ করেছে বলে সন্দেহ করা হতো, তাদের ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হতো।

চাষাবাদের জমি কেড়ে নেওয়া, চারণভূমি বন্ধ করে দেওয়া, প্রহরীদের দিয়ে জোরপূর্বক সম্পদ আদায়—এসব ছিল তাদের নিয়মিত অত্যাচার।

তাবুকের পর মুসলিম শক্তির উত্থান ঠেকাতে তারা যেন প্রতিটি প্রান্তিকে আগুন জ্বালানোর নীতি গ্রহণ করে।

৪. গুপ্তচরবৃত্তি ও হত্যাচেষ্টা :

তাবুকের পর রোমানরা নিজেদের সামরিক প্রস্তুতি গোপন রাখতে চাইছিল। একই সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে তারা বিভিন্ন গোত্রে গুপ্তচর পাঠায়।

কিছু গোত্রপ্রধানের ওপর চাপ দেওয়া হয় যাতে তারা মদিনার বার্তা ও দূতদের হত্যা বা বন্দি করার চেষ্টা করে।

তাদের ধারণা ছিল—মুসলমানদের কূটনৈতিক যোগাযোগ ভেঙে দিলে উত্তরের সীমান্ত অস্থির থাকবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তার ব্যাহত হবে।

৫. কূটনীতিতে ছলচাতুরি :

তাবুক অভিযানে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত না হলেও রোমানরা দ্রুত নতুনভাবে কূটনৈতিক খেলা শুরু করে।

কখনো মুসলমানদের সাথে শান্তির বার্তা পাঠায়, আবার পিছন থেকে নিজেদের আরব সহযোগীদের দিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

তারা জানত—মুসলমানরা সরাসরি সংঘর্ষ চান না; সেই সুযোগে রোমানরা নানা প্রস্তাব দিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে বিভেদ ছড়াতে থাকে।

এ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর—মানসিক ভীতি সৃষ্টি ও মুসলিম রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার কৌশল।

৬. দমনপীড়নের সবচেয়ে ভয়ানক রূপ: ধর্মীয় বৈরিতা:

রোমানরা আরব অঞ্চলে খ্রিস্টান গোত্রগুলোর ধর্মীয় নেতৃত্বকে ব্যবহার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে।

তারা ইসলামকে "সাম্রাজ্যের শত্রু" হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে, মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে রোমান সাম্রাজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ বিপদ বলে ঘোষণা করে।

এই ধর্মীয় উগ্রতা ছিল তাদের বর্বরতার এক ভিন্ন রূপ—অন্য জাতির স্বাধীন বিশ্বাসের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ, আতঙ্ক সৃষ্টি, এবং ধর্মের নামে রাজনৈতিক দমন চালানো।

সমগ্র চিত্রটি—মুসলিম শক্তির উত্থানে পশ্চিমা সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া

তাবুক অভিযান ছিল মুসলমানদের প্রথম বড় আন্তর্জাতিক উপস্থিতি।

যুদ্ধ না হলেও রোমান সামরিক প্রস্তুতি ও তৎপরতা প্রকাশ করে দেয়—

একটি নবীন রাষ্ট্রকে দমিয়ে রাখতে বৃহৎ পশ্চিমা সাম্রাজ্য কতভাবে বর্বরতা, নিপীড়ন ও চক্রান্তের পথ নেয়।

সীমান্তের আরব গোত্রদের ওপর তাদের চাপ, কর, জুলুম, ভয় দেখানো, ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরি—এসবই ছিল এই বর্বরতার প্রকাশ।

দলে দলে ইসলাম কবুল :-

মক্কার দরজা যখন মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হলো, তখন আরবের বহু জাতি, বহু গোত্রের মানুষ বুঝতে পারল—মুহাম্মদ ﷺ সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। দশকের পর দশক ধরে কুরাইশরা তাঁকে যে মিথ্যাচারীর তকমা দিয়েছিল, সেই সমস্ত অভিযোগের অবসান ঘটল এক মহিমান্বিত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বিজয় হলেও কোনো রক্তপাত নেই, কোনো প্রতিশোধ নেই; বরং অপরাধীদের জন্যও অবারিত ক্ষমা—এমন দৃশ্য আরববাসী আগে কখনো দেখেনি।

এমন দয়া, এমন চরিত্র মানুষের হৃদয়কে কোমল করে দিল। যারা এতদিন দূর থেকে ইসলামকে পর্যবেক্ষণ করছিল, তারা বুঝল—এই ধর্ম হৃদয়ের ধর্ম, সত্যের ধর্ম।

১. মক্কাবাসীদের ব্যাপক ইসলাম গ্রহণ :

মক্কা ছিল আরবের কেন্দ্র। মক্কা পরিবর্তিত হলে গোটা আরব জেগে ওঠে। বিজয়ের দিন হাজার হাজার মানুষ নবীজীর কাছে এসে শাহাদাত স্বীকার করল। কুরাইশরা যাদের মধ্যে একসময় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তারাই প্রথমে নিজেরা নবীজীর হাতে বায়াত করল, পরে তাদের অনুসারীরাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল।

২. হুনাইন-তাইফের পর গোত্রগুলো একে একে আত্মসমর্পণ :

হুনাইনের যুদ্ধে অতর্কিত হামলার পর আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দিলেন। এরপর তাইফের শক্তিশালী দুর্গও পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। ঘাতক ছিদ্র দিয়ে তীর ছুড়তে থাকা এত শক্তিশালী গোত্র যখন অবশেষে দাওয়াতের সামনে নত হল, তখন দূরবর্তী মরুপ্রান্তের গোত্রগুলোও বুঝে গেল—সত্যের সামনে কোনো অহংকার টিকে না।

যে গোত্রগুলো আগে শত্রুতা করেছিল, তারাও দূত পাঠিয়ে জানাতে শুরু করল যে তারা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত।

৩. আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি দলে দলে আগমন :

হিজরতের নবম বছরকে আরবের ইতিহাসে বলা হয়—

"আমুল উফূদ"—অর্থাৎ দল-দল প্রতিনিধি আগমনের বছর।

হাজার মাইল দূরের মরুগ্রামের নেতা, উপত্যকার প্রধান, গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ—সবাই দল গঠন করে মদিনায় আসতে লাগল। তারা নিজেরাই নবীজীর কাছে এসে বলত—
"আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিন।""আমাদের গ্রামে দাওয়াত পৌঁছে দিন।"
"আমাদের মাঝে কোরআনের একজন শিক্ষক পাঠিয়ে দিন।"
এই সময় নবীজীর মসজিদ এক মহিমান্বিত কেন্দ্রে পরিণত হয়—যেখানে প্রতিদিনই নতুন নতুন গোত্র এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যেত।
৪. ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণসমূহ :
নবীজীর চরিত্র: ক্ষমা, ন্যায় ও দয়ার অতুলনীয় উদাহরণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল।
ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা: সাম্য, ন্যায়, ভাইচারা, এক আল্লাহর ইবাদত—আরব সমাজে নতুন আলো এনে দেয়।
মুসলমানদের ঐক্য ও শক্তি: দীর্ঘদিন প্রকাশ্য শত্রুতার পর যখন মুসলমানদের বিজয় অব্যাহত হতে শুরু করল, অনেকেই সত্যকে গ্রহণ করে।
কুরআনের প্রভাব: প্রতিনিধিদলগুলো কোরআন শুনে কেঁদে ফেলত, সত্যকে উপলব্ধি করত।
৫. ঘর-প্রান্তরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়া :
প্রতিনিধিদলগুলো মদিনা থেকে ফিরে তাদের বাড়িতে গিয়ে নিজেদের গোত্রে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিত। একদিন যেসব গোত্র ইসলামবিরোধী ছিল, সেই গোত্রের ঘরঘরেও আযান ধ্বনিত হতে থাকল। ধীরে ধীরে গোটা আরবে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। নামাজ, দান-সদকা, ন্যায়বিচারের জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।
৬. আরব উপদ্বীপের পূর্ণ রূপান্তর স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই:
পূর্ব উপকূলের বাদিয়া গ্রাম
ইয়ামামার মরুপথ
ইয়েমেনের উর্বর উপত্যকা
নাজদের দুর্গবেষ্টিত বসতি
—সব জায়গা থেকে মানুষ দলে দলে মুসলিম হতে লাগল।
কোরআনের বাণী বাস্তবে প্রতিফলিত হলো—"যখন তুমি দেখবে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীন ইসলাম গ্রহণ করছে..."
—সূরা নাসর

এ আয়াতের প্রতিধ্বনি আরবের প্রতিটি প্রান্তে শোনা যেতে লাগল। নবীজীর দাওয়াতের ২৩ বছরের প্রচেষ্টার সুফল এক বিশাল স্রোতের মতো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করল।

ইয়েমেনে মুআজ

:- হিজরতের নবম বছর। ইসলামের দাওয়াত তখন আরবের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক এমন সময় ইয়েমেন—হিমিয়ার রাজা এবং ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রধান ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিরা মদিনায় এসে নবিজি ﷺ–এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন সম্মানিত প্রধান পুরোহিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। নবিজি ﷺ তাদের আগমনে গভীর সন্তুষ্ট হন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান শিক্ষা দেন। এরপর তারা আনন্দ ও প্রশান্তি নিয়ে নিজ ভূমি ইয়েমেনে ফিরে যান।

ইয়েমেনে মানুষের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তখনও সুসংগঠিতভাবে শুরু হয়নি। নতুন মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া, তাদের মাঝে শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা করা—এসব জরুরি হয়ে উঠল। তাই নবিজি ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একজন যোগ্য, বিজ্ঞ, বিচার বিবেচনায় প্রখর, আলেম, দাওয়াত ও প্রশাসনে সক্ষম সাহাবিকে ইয়েমেনে পাঠাতে হবে।

এই দায়িত্বের জন্য মনোনীত হলেন মহান সাহাবি মুআয ইবনু জাবাল (রা.)। তিনি ছিলেন নবিজির প্রিয়, জ্ঞানী এবং ফিকহে (ইসলামি বিধিবিধানে) অত্যন্ত সক্ষম। নবিজি ﷺ তাকে ইয়েমেন প্রেরণের আগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দিলেন—কিভাবে লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে, কোন বিষয় আগে শিক্ষা দিতে হবে, কাকে কিভাবে হুকুম দিতে হবে—এসব বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেন।

নবিজির ﷺ উপদেশ ও মুআয (রা.)–এর সঙ্গে সংলাপ :

নবিজি ﷺ তাকে বললেন—"তুমি এমন একটি জাতির কাছে যাচ্ছ, যারা আসমানিকে কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান) সম্পর্কে জানে। তাই প্রথমে তাদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে, তবে তাদেরকে সালাত সম্পর্কে শিক্ষা দেবে।"

এরপর নবিজি ﷺ জানতে চাইলে, মুআয (রা.)-এর মনে একটি প্রশ্ন জাগল। তিনি ভাবলেন—এই দায়িত্ব অত্যন্ত বড়। তিনি হয়তো ভয় পেলেন, কোন ভুল সিদ্ধান্ত না হয়। তাই বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন—

"হে আল্লাহর রাসূল, যদি এমন কোনো বিষয় আসে যার ব্যাপারে আমি সরাসরি আপনার নির্দেশ না পাই, তখন আমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেব?"

নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি তখন কী করবে, হে মুআয?"

মুআয (রা.) বললেন—"আমি আল্লাহর কিতাব—কোরআন অনুযায়ী বিচার করব।"

নবিজি ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন—

"যদি কোরআনে তার স্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?"

তিনি বললেন—"তখন আমি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ থেকে অনুসন্ধান করব।"

নবিজি ﷺ পুনরায় প্রশ্ন করলেন—

"আর যদি কোরআন এবং সুন্নাহ—কোনোটিতেই স্পষ্ট নির্দেশ না পাও?"

মুআয (রা.) দৃঢ়ভাবে বললেন—

"তাহলে আমি নিজের সর্বোচ্চ বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করব। নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেওয়ার চেষ্টা করব।"

মুআযের এই শক্ত ও সঠিক উত্তরে নবিজি ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রশান্ত হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে শোকর প্রকাশ করলেন যে তাঁর উম্মত থেকে এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে যারা দায়িত্বের ক্ষেত্রে এভাবে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করবে। এরপর তিনি মুআযকে রওনা হওয়ার অনুমতি দিলেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে নবিজির ﷺ নিকট থেকে বিচারব্যবস্থার একটি মহান নীতি সারা বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়—

কোরআন → সুন্নাহ → ইজতিহাদ।

ইয়েমেনে প্রেরণ — দাওয়াত, শিক্ষা, ও ন্যায়বিচারের মিশন :

মুআয (রা.)-কে শুধু দাওয়াত দানের জন্য পাঠানো হয়নি; বরং তিনি যাচ্ছিলেন—

ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে, ইসলামের শিক্ষাদাতা হিসেবে, অভিনব প্রশাসনিক নেতা হিসেবে।

তিনি গিয়ে দেখলেন—ইয়েমেনের নতুন মুসলমানদের মাঝে প্রচুর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রশ্ন। মানুষ দল বেঁধে ইসলাম গ্রহণ করছে। তারা চাইছিল—সঠিক নিয়মে কিভাবে ইসলাম পালন করতে হবে। মুআয (রা.) তাদেরকে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ব্যক্তিগত ইবাদত থেকে শুরু করে জনজীবনের ন্যায়বিচার—সবই তিনি সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন।
তিনি মানুষকে বলতেন—"দাওয়াতকে সহজ করো, কঠিন করো না। মানুষকে সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না। নিজেদের আচরণ দিয়ে ইসলামকে পরিচিত করো।"

বিদায় হজ :

- বিদায় হজে প্রিয় নবীজি (সা.) উপস্থিত সোয়া লাখ সাহাবির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত। এটি ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক ভাষণ, যা তিনি দশম হিজরি সনের নবম জিলহজ আরাফার দিনে মসজিদে নামিরাতে ও জাবালে রহমতের ওপরে এবং পরদিন দশম জিলহজ ঈদ ও কোরবানির দিন মিনাতে প্রদান করেছিলেন।

নবীজি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন: হে লোক সকল! আল্লাহু তাআলা বলেছেন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার।' (সুরা ৪৯, হুজুরাত, আয়াত ১৩)। কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের; কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, এমনিভাবে শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। সব মানুষ আদম (আ.)-এর সন্তান আর আদম (আ.) মাটি দ্বারা সৃষ্ট। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; তোমাদের অধীনদের (দাস-দাসীদের) প্রতি খেয়াল রাখবে, তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরাবে। সাবধান! ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না; কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পদের জাকাত প্রদান করবে, স্বীয় প্রভুর ঘরে এসে হজ পালন করবে; তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

মানবতার ঐতিহাসিক দলিল বিদায় হজের ভাষণ

হয়তো আমি এ বছরের পর এখানে আর কখনো তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব না। অচিরেই তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর সাক্ষাতে উপনীত হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তোমাদের কারও কাছে যদি কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে, তা তার প্রাপকের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই সকল প্রকার সুদ রহিত করা হলো। তবে তোমাদের মূলধন বহাল থাকবে। মহান আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন যে আর কোনো সুদ নয়। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সব সুদ রহিত করা হলো। তোমরা কোনো জুলুম করবে না, বরং তোমাদের প্রতিও কোনো জুলুম করা হবে না। জাহিলি যুগের যত রক্তের দাবি, তা সব রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি রবিয়া ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি রহিত করলাম।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপকের জন্য তার অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা ছাড়া অন্যের সঙ্গে নিজের বংশসূত্র স্থাপন করে এবং যে নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে স্বীকার করে, তার ওপর আল্লাহর লানত। সব ঋণ পরিশোধের যোগ্য ও অধিকার, ধারকৃত বস্তু ফেরতযোগ্য, উপঢৌকনেরও বিনিময় প্রদান করা উচিত, জামিনদার জরিমানা আদায় করতে বাধ্য থাকবে। কারও জন্য তার অপর ভাইয়ের কোনো কিছু বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে নিজে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান না করে। কোনো মহিলার জন্য তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর অর্থসম্পদ থেকে কাউকে কিছু দেওয়া বৈধ নয়। তোমরা কখনো একে অন্যের ওপর জুলুম কোরো না। নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে।

অতএব হে মানবজাতি! তোমরা আমার কথা অনুধাবন করো। আমি তো পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে এমন সুস্পষ্ট দুটি বিষয় (বিধান) রেখে গেলাম, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ। আমি তোমাদের মাঝে জিনিস রেখে গেলাম, আল্লাহর কিতাব এবং আমার (নবী স. এর) ইতরাত (আহলে বাইত)।

ভাষণের মূল বিষয়বস্তু

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন, যা আজও মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, ইসলামের সুমহান আদর্শে অটল থাকার শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন হাদিস থেকে নবীজির বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

মানবিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ

নবীজি (স.) বলেন- হে মানুষ! তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পিতা একজন। আরবের ওপর কোনো অনারবের এবং অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গেরও নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ

নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে নির্দেশ দেন, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

নারীর অধিকার

বিদায় হজের ভাষণে নারীর অধিকার সুরক্ষায় মহানবী (স.) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নারীদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করতে।

প্রাণ ও সম্পদের সুরক্ষা

মহানবী (স.) উল্লেখ করেন, মানুষের জান-মাল ও সম্মান অপরাধ ছাড়া হরণ করা যাবে না। তিনি বলেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান একে অপরের জন্য হারাম, যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান থাকে।

অধীনস্থদের প্রতি সদাচরণ

মহানবী (স.) অধীনস্থদের সাথে সদাচরণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তাদের প্রতি সদাচরণ করলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আরও বলেন, তাদের

ওপর অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে তাদেরও তা-ই খাওয়াবে; যা পরবে তা-ই পরাবে। ভুলো না, তারাও তোমাদের মতো মানুষ।

ঋণ ও আমানত রক্ষা

তিনি (স.) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আমানতের খেয়ানত না করতে নির্দেশ দেন।

সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার

নবীজি (স.) সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং বলেন, কেউই জন্মগতভাবে শ্রেষ্ঠ বা নিম্নমানের নয়; বরং তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ করে।

কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

নবীজি বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। 'আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে তখন তোমরা কি বলবে?' তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দেব যে আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।' তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।' তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

শিরক বিদআত, চুরি-ডাকাতি, জিনা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশনা

নবীজি বলেন, সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। শিরক করো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা কথা বেলো না, জেনা-ব্যভিচার করো না। সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করো। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হয়ো। নবীজি বলেন, জাহিলী যুগের যত রসম রেওয়াজ, শোন, (আজ থেকে) সব আমার পায়ের নিচে পদদলিত।

সুদ নিষিদ্ধ

নবীজি বলেন, জাহিলিয়াতের সকল সুদ আজ বিলুপ্ত করা হল। সর্বপ্রথম আমি যে সুদ বিলুপ্ত করছি তা আমারই বংশের আববাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।

অহংকার করো না

নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর এক বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর নেমে আসে।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ কাউকে দেওয়া যাবে না

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) উল্লেখ করেন যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ কাউকে দিতে পারবেন না। এটি পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

একজনের অপরাধের দায় অন্যজনের নয়

নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, কোনো অপরাধীর অপরাধের দায় তার পিতা বা সন্তান বহন করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী।

নেতার আনুগত্যের নির্দেশ

নবীজি (স.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলমানদেরকে তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। এমনকি সেই নেতা যদি ক্রীতদাসও হন।

মুসলমানরা ভাই ভাই হয়ে থাকবে

বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) মুসলমানদের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকতে বলেন, আরও বলেন, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না।

নবীজির এই বিদায়ী বর্তা সবার কাছে পৌঁছানোর নির্দেশনা

নবীজি বলেন, যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত সব মুসলমানের কাছে আমার এই সব বাণী পৌঁছে দিয়ো। হয়তো অনেক অনুপস্থিত লোক উপস্থিত শ্রোতা অপেক্ষা অধিক হেফাজতকারী হবে।'

কোরআনের আয়াত নাজিল

ভাষণশেষে ভাবের আতিশয্যে নবী (স.) নীরব হন। জান্নাতি নূরে তাঁর চেহারা আলোকদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে নাজিল হয়—'আজকের এই দিনে তোমাদের দ্বিনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ওপর দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সুরা মায়েদা: ৩)

বিশাল জনতা নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলে করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'বিদায়!' একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবার হৃদয়ে ছায়াপাত করল।

বিদায় হজের ভাষণ মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন আদর্শ। এতে যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি মহান শিক্ষণীয় দলিল।

বিদায় হে প্রিয়তম!

আয়েশার ঘরে :

- মদিনার বাতাস যেন সেদিন থেকেই ভারী হয়ে উঠেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ–এর শারীরিক দুর্বলতা দিন দিন বাড়ছিল। গত কয়েক দিন ধরে তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান থাকত, মাঝে মাঝে আবার অচেতন হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ সব সময় ছিল জাগ্রত। যখন বুঝলেন চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তখন জিজ্ঞেস করলেন— "আজ আমি কোথায় থাকব?" সাহাবারা তাঁর ইশারা বুঝতে পারলেন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, মুমিনদের মাতা আয়েশা رضي الله عنها–

এর ঘরেই তিনি থাকতে চান। সবার সম্মতিতে তাঁকে ধীরে ধীরে আয়েশার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেই ছোট্ট, সাদামাটা ঘরটিই ছিল নবিজির শেষ আশ্রয়। মাটির দেয়াল, সাধারণ পালঙ্ক, কিছু সরল আসবাব—কিন্তু তার সাথে ছিল অপার ভালোবাসা ও প্রশান্তি। আয়েশা رضي الله عنها সর্বক্ষণ তাঁর পাশে থাকলেন। কখনো পানি এনে দিলেন, কখনো তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, কখনো দোয়া পড়লেন। রাসুল ﷺ-এর শারীরিক কষ্ট বাড়ছিল, কিন্তু তাঁর মুখের প্রশান্তি কমছিল না।

শেষ রোগের দিনগুলোতে তিনি মাঝে মাঝে মসজিদে বের হওয়ার চেষ্টা করতেন। সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু দুর্বলতা এতটাই বাড়ল যে আর বের হওয়া সম্ভব হলো না। তখন তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবি আবু বকর رضي الله عنه-কে ইমামতের দায়িত্ব দিতে নির্দেশ দিলেন। এ সিদ্ধান্তে অনেক বড় শিক্ষা লুকিয়ে ছিল—উম্মাহর নেতৃত্বের ইঙ্গিত যেন তিনি নিজেই দিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর রোগশয্যার দিনগুলোয় আয়েশার ঘরেই ছিল সবচেয়ে বেশি নীরব।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচদিন পূর্বে :

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জীবনের দিনগুলো ছিল অদ্ভুত শান্তিতে ভরা, আবার গভীর বেদনায় মাখা। যেন আকাশ—ধরণী এক অদৃশ্য অপেক্ষায় নীরব হয়ে আছে। প্রিয়তম নবী ﷺ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর দুনিয়ার সফর শেষের দিকে এগিয়ে এসেছে। আর তাই ওফাতের আগের পাঁচ দিন তিনি উম্মতের প্রতি গভীর মায়ায়, উদ্বেগে ও ভালোবাসায় কিছু বিশেষ নির্দেশ রেখে যান।

১. দুঃসহ ব্যথা, তবু উম্মতের দিকে চিন্তা :

ওফাতের পাঁচ দিন আগে নবীজি ﷺ-এর জ্বর ছিল অত্যন্ত তীব্র। মাথা যেন আগুনের মতো জ্বলছিল। মাঝে মাঝে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে দেওয়া হতো, স্বচ্ছ ঘাম ঝরতে থাকত। ব্যথায় তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত, তবু তিনি ধৈর্য ধরে বলতেন—

"এ রোগ আরও কঠিন হতো যদি আল্লাহ চাইতেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"

ব্যথার মাঝেও তিনি কোনো অভিযোগ করেননি। বরং চিন্তা করছিলেন—উম্মতের ভবিষ্যত, তাদের ঈমান, তাদের পথচলা।

২. সাহাবাদের প্রতি শেষ উপদেশসমূহ :

এই পাঁচ দিনে নবীজি ﷺ কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ وصية (শেষ উপদেশ) দিয়েছেন।

১. সালাতের ব্যাপারে কঠোর আদেশ :

একদিন অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তিনি বললেন—"সালাত, সালাত! আর তোমাদের অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।"

সালাতকে তিনি উম্মতের সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে রেখে যেতে চাইলেন। মৃত্যুশয্যায় থেকেও তাঁর জবান প্রথমে নামাজের কথাই বলেছে।

২. মুসলমানদের ঐক্য রক্ষার নির্দেশ :

তিনি সাহাবিদের একত্রিত করে অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বলেন—

"তোমাদের মাঝে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করো না।"

নবীজি ﷺ জানতেন তাঁর চলে যাওয়ার পর শয়তান উম্মতের মাঝে বিভেদ ঢোকাতে চাইবে। তাই তিনি ঐক্যের ওপর জোর দিলেন।

৩. দাস-খেদমদের প্রতি অনুগ্রহ :

নবীজি ﷺ দাস ও কর্মচারীদের অধিকার নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বারবার বললেন—

"যাদের আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করেছে, তাদের প্রতি দয়া করো।"

এই কথা তিনি মৃত্যুর অল্পদিন আগেও না বলে থাকতে পারেননি। এ ছিল তাঁর অন্তরের মানবিক উজ্জ্বলতা।

৪. ঋণ ও আমানত সম্পর্কে ঘোষণা :

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কাউকে যদি আমি কোনো ধরনের ক্ষতি করে থাকি, সে আজই এসে নিয়ে যাক। আমি আল্লাহর কাছে পবিত্র অবস্থায় যেতে চাই।"

সাহাবিদের বুক কেঁপে উঠল। সমস্ত আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, দয়ালু, কোমল মানুষ! কিন্তু তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে ভয় করলেন—এ ছিল তাঁর ঈমানের পরিপূর্ণতা।

৫. ইন্তেকালের পূর্বেই দান করে দেওয়া জিনিসপত্র :

ওফাতের পাঁচ দিন আগে তিনি নিজের সম্পদ গুনে গুনে বললেন—

"এগুলো আল্লাহর পথে বিলিয়ে দাও।"

তাঁর ঘরে মৃত্যুর মুহূর্তে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, শুধু একটি সাদা চাদর। দুনিয়ার সমস্ত লোভ—বিলাসিতা থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি।

৬. আয়শা (রা.)–এর ঘরে শান্তির কোল :

ব্যথা বাড়তে থাকায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"আজ আমি কোথায় থাকব?"

সাহাবিরা বুঝলেন, নবীজি ﷺ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী, প্রিয়তমা আয়শা রা.–এর ঘরে থাকতে চান। সেদিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকলেন। আয়শা রা. তাঁর মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতেন, প্রিয় কপাল স্পর্শ করতেন, দোয়া পড়তেন। নবীজি ﷺ কখনো আয়শার কাঁধে, কখনো তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে থাকতেন।

৭. মসজিদে গিয়ে সাহাবিদের দেখা :

একদিন ব্যথা কিছুটা কমলে সাহাবিরা তাঁকে বাহুতে ভর দিয়ে মসজিদে নিয়ে গেলেন। পা টেনে টেনে হাঁটছিলেন। মসজিদে ঢুকে তিনি দেখলেন, তাঁর প্রিয় উম্মাহ সালাত পড়ছে। কাজটি দেখে তাঁর চোখে শান্তি নেমে এল।

সাহাবিরা বললেন, সেদিন তাঁর হাসি ছিল সেই পূর্ণিমার চাঁদের মতো—

এ যেন ছিল তাঁর শেষ বিদায়-হাসি।

৮. সেনাবাহিনী পাঠানোর কথা – উসামা বাহিনী :

ওফাতের পাঁচ দিন আগেও নবীজি ﷺ বললেন—"উসামার বাহিনী পাঠিয়ে দাও। যাদের নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম, তারা এখন নিরাপদ।"

উম্মতের ভবিষ্যৎ রক্ষায় শেষ সময়ে গিয়েও তিনি কাজ করছিলেন।

৯. শেষ রহমতের জোয়ার :

এই পাঁচদিনে তিনি উম্মতের জন্য বারবার দোয়া করতেন-

"হে আল্লাহ, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন... তাদের প্রতি দয়া করুন..."

তাঁর ব্যথায় কাতর শরীর থেকেও দোয়ার ঝর্ণা থেমে থাকেনি। তাঁর হৃদয় উম্মতের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

চারদিন পূর্বে :

- রবিউল আউয়ালের সেই মৃদুমন্দ সকালগুলো যেন এক অদৃশ্য বিষাদের আবরণে মোড়া ছিল। নবিজি (সা.)-এর অসুস্থতা দিন দিন বাড়ছিল, শরীর ছিল ক্লান্ত, কিন্তু হৃদয় তখনো উম্মাহর জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ। ওফাতের মাত্র চার দিন পূর্বে, তাঁর দৃষ্টিতে

ছিল গভীর বার্তা, কথায় ছিল মমতার কোমল স্পর্শ—যেন শেষবারের মতো তিনি তাঁর উম্মাহকে সাজিয়ে দিচ্ছেন, পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, বলে যাচ্ছেন চিরন্তন কিছু কথা।

১. নবিজির (সা.) ঘোরতর অসুস্থতার মধ্যেও দীন-চিন্তা :

অসুস্থতার ব্যথা তীব্র হয়েছিল। মাঝে মাঝে জ্ঞানও হারিয়ে যাচ্ছিল। তবু চেতনা ফিরলেই তিনি প্রথমে খোঁজ নিতেন সালাতের। বারবার বলছিলেন—

"সালাত! সালাত! আর তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে খেয়াল রেখ।"

এই কথাগুলো কয়েকদিন থেকেই তিনি বলছিলেন, কিন্তু চার দিন পূর্বের কথাগুলোতে ছিল শেষ অনুভবের ভার। যেন তিনি উম্মাহকে তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, আর বলছেন—

"তোমরা যেন আমার পর এই দায়িত্ব ভুলে না যাও।"

২. আয়েশা (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে কোমলতম মুহূর্ত :

এই সময়ে তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.)-এর ঘরেই। তাঁর মাথা বিশ্রাম নিত আয়েশার বুকে কিংবা কোলে। আয়েশা (রা.) তাঁকে পানি দিতেন, হাত বুলাতেন, যত্ন করতেন সন্তর্পণে।

চার দিন পূর্বে নবিজি (সা.) আয়েশার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন—

"আয়েশা, আমি এখনো সেই ব্যথা অনুভব করি, যে ব্যথা আমাকে খাইবারের বিষমাখা মাংস দিয়েছিল।"

যেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—এই পৃথিবীর কষ্টগুলো একত্র হয়েছে, আর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

৩. সাহাবিদের প্রতি শেষ নির্দেশনা :

সেই দিন নবিজি (সা.)-এর কণ্ঠ দুর্বল ছিল, তবু তিনি সাহাবিদের ডেকে কিছু জরুরি কথা বললেন—উসামার বাহিনী যেন বিলম্ব না করে রওনা হয়।

অন্যায়, জুলুম, বিভেদ যেন উম্মাহকে গ্রাস না করে।

আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরার وصية (ওসিয়ত)।

তাঁর ভাষা তখনো দৃঢ়, উদ্দেশ্য পরিষ্কার—

উম্মাহকে তিনি অগোছালো রেখে যেতে চাননি।

৪. মানুষের সাথে হক আদায় করার ঘোষণা :

চার দিন পূর্বে তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। শরীর ধরে দুই সাহাবি তাঁকে নিয়ে এলেন। মসজিদ ছিল নীরব, সবাই জানত প্রিয়নবির শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তিনি মিম্বারে উঠে বললেন—"হে মানুষ! যদি কারো ওপর আমার কোনো হক থাকে, এসে আদায় করে নিক। আমি কাউকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে চাই না।"

এক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন যে একবার

নবিজি (সা.) তাকে হালকা আঘাত করেছিলেন। নবিজি (সা.) নিজে সামনে এগিয়ে এসে বললেন—

"এসো, প্রতিশোধ নাও।"

লোকটি বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি শুধু আপনার দয়া কামনা করি।"

মসজিদ কান্নায় ভরে গেল।

৫. মানুষের জন্য দোয়ার শেষ মুহূর্তগুলো :

নবিজি (সা.)-এর চোখে তখনো উম্মাহ। তিনি বললেন—

"আল্লাহ! আমার উম্মাহকে ক্ষমা করো, আমার উম্মাহকে দয়া করো।"

এই দোয়া তিনি বারবার করছিলেন।

আয়েশা (রা.) বলেন—

"আমি দেখেছি, মৃত্যুর চার দিন আগে পর্যন্ত তাঁর ঠোঁট এভাবেই উম্মাহর জন্য দোয়া করছিল।"

৬. মৃত্যু-সংকটের প্রথম আভাস :

চার দিন পূর্বে তাঁর জ্বর অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। ঘেমে উঠতেন বারবার। তিনি পানিতে হাত ডুবিয়ে মুখমণ্ডলে বুলাতেন এবং বলতেন—

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যু-সংকট বড় কঠিন।"

তবু এই কষ্টেও তিনি কারও ওপর ভার চাপাতে চাননি। বারবার বললেন—

"আমার ঘরে থেকে আমাকে চিকিৎসা দাও। আমি আমার পরিবারেই থাকতে চাই।"

৭. শান্ত, কিন্তু গভীর বিদায়ের অনুভূতি :

ওই দিনগুলোয় তাঁর দৃষ্টিতে ছিল এক অদ্ভুত শান্তি—যেন পৃথিবীর সকল দায়িত্ব শেষ করে তিনি 'রফীকুল আলা'-এর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সাহাবিরা বুঝে গেলেন—নবিজি (সা.) আর বেশিদিন আমাদের মাঝে থাকবেন না।

কিন্তু তাঁর স্নিগ্ধ চেহারা যেন বলছিল—

"আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি কুরআন আর সুন্নাহ—যা আঁকড়ে ধরলে কখনো বিপথে যাবে না।"

একদিন আগে :-

মদিনার বাতাসে তখন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। নবিজি ﷺ এর অসুস্থতা কয়েকদিন ধরেই বেড়ে চলছিল, কিন্তু ঐ শেষ দিনের আগের দিনটা ছিল যেন বিশেষভাবে অনুভূতিপূর্ণ। তাঁর চেহারায় ছিল অসুস্থতার গভীর রেখা, তবুও মাঝে মাঝে দেখা যেত কোমল এক উজ্জ্বলতা—যেন পৃথিবীর বিদায় মুহূর্তে আসমানী নূর তাঁর মুখমণ্ডলকে ছুঁয়ে আছে।

আয়িশার ঘরে নবিজি ﷺ :

সেই দিন যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষটি ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা (রাঃ)-এর কোলে হেলান দিয়ে। আয়িশা রাঃ বর্ণনা করেন—তাঁর মাথা আমার বুকে ছিল, আর আমি তাঁর দুর্বল শরীরের উষ্ণতা টের পাচ্ছিলাম। তিনি বারবার বলছিলেন,

"ইয়া আয়িশা... আমার মাথা খুবই ব্যথা করছে..."

আয়িশা রাঃ তাঁর মাথায় মালিশ করছিলেন, পানি দিয়ে ঠান্ডা করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখে পানি দিতেও সাহায্য করছিলেন। নবিজি ﷺ এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, মাথা তুলতেও কষ্ট হচ্ছিল।

সাহাবিদের জন্য গভীর চিন্তা :

সেই দিন নবিজির ﷺ মাথায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল উম্মাহর কথা। তিনি দুর্বল কণ্ঠে বলছিলেন:"ইয়া আয়িশা, মানুষদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়... যেন তারা কোনো ভুলে না পড়ে..."

এই কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল—অসীম বেদনার ভেতর থেকেও তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যথা ছিল উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে। নিজের রোগব্যাধি নিয়ে তিনি নয়, বরং মানুষের ঈমান ও ঈমানের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছিলেন।

মসজিদের দিকে তাকানো এবং উদ্বেগ :

একদিন আগে তিনি আয়িশা রাঃ-কে বলেছিলেন—

"আস-সালাত, সালাত... নামাজের ব্যাপারে সচেতন থাকো।"

তারপর মসজিদের দরজার পর্দা সামান্য তুলে তিনি তাকালেন সাহাবিদের দিকে। যদিও দাঁড়াবার শক্তি তাঁর ছিল না, তবুও চোখে ছিল তীব্র টান—উম্মাহর প্রতি ভালোবাসার টান।

সাহাবিরা সেই দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন—এ দৃশ্য তাঁর বিদায়ের ইঙ্গিত।

দুঃখ-বেদনার অনুভূতি :

সেদিন নবিজি ﷺ মাঝে মাঝে খুব শান্ত হতেন, আবার হঠাৎ কষ্টে কাতর হতেন। কখনো বলতেন—"আল্লাহ্! মৃত্যুর যন্ত্রণা কত কঠিন!"

এ কথা শুনে আয়িশা রাঃ–এর চোখে অশ্রু জমে যেত। তিনি নবিজির ﷺ মাথা বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দিতেন, অথচ নিজের বুকও কাঁপছিল গভীর বেদনায়।

মিসওয়াক চাওয়ার ঘটনা :

সেই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ছিল, আরেকটি কোমল ঘটনার জন্য।

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর হাতে একটি মিসওয়াক। নবিজি ﷺ তা দেখে ইশারায় চাইলেন। কিন্তু তাঁর দাঁতের কাছে মিসওয়াক নিয়ে যেতে শক্তি ছিল না। তখন আয়িশা রাঃ তাঁর হাত ধরে মিসওয়াক কেটে নরম করে দিলেন এবং নবিজির হাতে ধরিয়ে দিলেন।

নবিজি ﷺ মিসওয়াক করলেন—এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ সম্পূর্ণ ইবাদতের কাজগুলোর একটি।

দুয়া ও শেষ রাত্রির পরিবেশ :

রাত গভীর হওয়ার দিকে নবিজি ﷺ বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর ঠোঁট নরম স্বরে দোয়া বলছিল—

"আল্লাহুম্মা ফির রফীকিল আ'লা..."

(হে আল্লাহ্! আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও)

এ দোয়া তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল—রহমত ও শান্তির আলিঙ্গনে ফিরে যাওয়া।

সেই রাতের অন্ধকারে আয়িশা রাঃ তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে বলছিলেন—

"হে আল্লাহ্! আপনার প্রিয় বান্দাকে সহজ করুন, কষ্ট দূর করুন।"

কক্ষে তখন একদিকে অশ্রু, অন্যদিকে আসমানী প্রশান্তির ধারাপাত যেন একসঙ্গে অনুভূত হচ্ছিল।

জীবনের শেষদিন :

- মদিনার সেই শান্ত প্রভাতটি ছিল অদ্ভুত নীরব। যেন বাতাসও স্থির হয়ে গিয়েছিল। নবিজির ﷺ অসুস্থতা কয়েকদিন ধরে বাড়ছিল, কিন্তু সেই সকালে তাঁর চেহারায় এক

অপার্থিব প্রশান্তি দেখা যাচ্ছিল। যেন তিনি পৃথিবীর দায়িত্বসমূহ সমাপ্ত করেছেন, এখন কেবল ফেরার ক্ষণটির অপেক্ষা।

তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। মাথা ছিল তাঁর ﷺ বুকে, আর শরীর ছিল জ্বরের তাপে পরিশ্রান্ত। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন, আবার জাগ্রত হলে চোখ উঠিয়ে ছাদের দিকে তাকাতেন। আয়েশা (রা.) তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে দিতেন, পানির ছিটা দিতেন, যেন ব্যথাটা কিছুটা লাঘব হয়।

এমন অবস্থায়ও নবিজির ﷺ জবান থেকে বের হচ্ছিল শুধু একটি দোয়া—

"আল্লাহুম্মা রফীকিল আ'লা...

হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গী দান করুন..."

এই দোয়া শুনে আয়েশা (রা.) বুঝে ফেললেন—নবিজির ﷺ ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

নবিজি ﷺ তাঁর চারপাশে থাকা সাহাবিদের দেখতে চাইছিলেন। আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান-হুসাইন (রা.)—সবাই তাঁর পাশে আসলো। ফাতিমা (রা.) এসেই বাবাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। নবিজি ﷺ তাঁকে কাছে টেনে নিলেন, কানে কিছু কথা বললেন। যা শুনে ফাতিমা (রা.) প্রথমে কাঁদলেন, পরে হেসে উঠলেন। পরে জানা গেল—নবিজি ﷺ তাঁকে জানিয়েছিলেন তিনি শিগগিরই ইন্তেকাল করবেন, আর পরে বলেছিলেন—"তুমি আমার পরিবারের মধ্যে সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে।"

ছোট্ট হাসান ও হুসাইন (রা.) নবিজির ﷺ বুকে মাথা রাখলো। তিনি তাদের আঁকড়ে ধরে রাখলেন, যেন স্নেহের শেষ স্পর্শটুকু দিয়ে যেতে চান।

সাহাবারা বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের কান্না চাপা রাখার চেষ্টা ভেঙে যাচ্ছিল। নবিজি ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তাঁদের উদ্দেশে বললেন—

"তোমাদের ওপর আমার উপদেশ—নামাজ, নামাজ, আর তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

এ ছিল তাঁর ﷺ জীবনের শেষ উপদেশ।

শেষ মুহূর্তগুলোতে নবিজি ﷺ বারবার বলছিলেন—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... মৃত্যুতে রয়েছে তীব্র কষ্ট..."

আয়েশা (রা.) নবিজির ﷺ মাথা কোলে নিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ আমাকে সেই সম্মান দিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে, আমার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন।”

মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো। নবিজির ﷺ দৃষ্টি উপরে উঠলো—মুখে শান্তির ছায়া, ঠোঁটে মৃদু হাসি। যেন ফেরেশতারা উপস্থিত হয়েছেন।
তারপর সবচেয়ে মধুর সেই বাক্য তিনবার উচ্চারিত হলো—
“রফীকিল আ’লা... রফীকিল আ’লা... রফীকিল আ’লা...”
(সর্বোচ্চ সঙ্গী... সর্বোচ্চ সঙ্গী... সর্বোচ্চ সঙ্গী)
এ কথার পরই তাঁর শরীর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
বারো রবিউল আউয়াল, সোমবার—মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের পৃথিবীর মিশন শেষ হলো।
মদিনার আকাশ কাঁদলো। সাহাবারা ভেঙে পড়লেন। যেন চারদিক আলোহীন হয়ে গেল। কিন্তু নবিজি ﷺ রেখে গেলেন দীপ্ত আলোর রেখা—ইমান, কুরআন, সুন্নাহ, আর চিরন্তন দয়াময় শিক্ষা।